

চল্লিশজন
মেঝে বিজ্ঞানীর
দৃষ্টিতে



আল্লামা
আব্দুল

চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব

সম্পাদনা : জন ক্রোভার মোনজুমা
অনুবাদ : সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান

মদীনা পাবলিকেশন্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, শাখা অফিস : ৫৫বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মাহুত অবস্থিত

প্রকাশনায় :

মদীনা পাবলিকেশন-এর পক্ষে

কম্পিউটার কন্সাল্ট্যান্ট

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৪৭১১১৪৪৬

প্রথম সংস্করণ :

জুলাই ১৯৯৬ ইংরেজী

১৭তম সংস্করণ

ফেব্রুয়ারী-২০১৮ ইংরেজী

জয়ানিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :

কুতুব-উজজামান খান

কম্পিউটার কম্পোজ :

মক্স কমিউ

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৫০.০০ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN : 984-8367-63-2

জন ক্লোভার মোনসমা সম্পাদিত

চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মাহুত অবস্থিত

This is an authorized Bengali translation of

THE EVIDENCE OF GOD IN EXPANDING UNIVERSE

Edited by Jon Clover Monsma

Copyright (c) 1958 by Jon Clover Monsma

Published by G.P. Putnam's Sons, New York

[FRANDAC ON. 140]

আমাদের কথা

জড়বাদী ধারণা মানব সভ্যতার বিকাশকাল থেকেই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে এসেছে। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে উপলব্ধি মন এবং স্থিত ও জাগ্রত চিন্তার নিকট এ ধারণা কখনো আশ্রয় পায়নি। সীমিত বুদ্ধি ও আচ্ছন্ন মানসকেই যুগে যুগে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। প্রাকৃতিক আইনের দৃষ্টিতে এ হচ্ছে, সুসমঞ্জস্য কর্মকারণ- পরস্পরা বর্জিত এক ভাবাত্মক কল্পনাবিলাস মাত্র। কেননা, নাস্তিক্যবাদী এ ধারণা মহাবিশ্বের সমগ্র সৃষ্টিধারাকে এক অকারণ আকস্মিক ঘটনাক্রম বলে অভিহিত করে এবং এর পেছনে এক মহাস্রষ্টার চিন্ময় অস্তিত্ব ও তাঁর অর্থময় উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য আজ এ ধারণাকে সামগ্রিকভাবে ভিত্তিহীন প্রমাণিত করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বহু পূর্বে ইসলামের জীবন-দর্শন মুহাম্মদ আল-কোরআন এবং প্রত্যাদিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থ আল্লাহ'র অস্তিত্ব সম্পর্কে এ নাস্তিক্যবাদী ধারণার মোকাবিলা করেছে। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর কৈশোরের চারদিকের জড়সর্বস্ব পারিপার্শ্বিকতার অন্ধকারে আল্লাহ'র অস্তিত্বের এক বিরাট জিজ্ঞাসায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। কিশোর ইব্রাহীমের যুক্তিবাদী মন প্রতীকবাদী পিতার উপাস্য ভঙ্গুর মন্দির প্রতীমাকে স্রষ্টা বলে মেনে নিতে পারে না। ইব্রাহীম ভাবেন, তাঁর আল্লাহ কিছুতেই এমন ঠুনকো হতে পারেন না। তাঁর অধীর চিন্তা সারা বিশ্বময় সে মহাসত্তাকে খুঁজে বেড়ায়। রাতের আকাশের চাঁদ দেখে তিনি ভাবেন হয়তো তিনি এই। ভোরের আকাশে তার চেয়েও উজ্জ্বল ও বিরাট সূর্যকে দেখে তিনি জ্ঞানেন, তবে কি তিনিই এই? তারপর একসময় সূর্যকেও ডুবে যেতে দেখে তাঁর মন অস্তির হয় ওঠে: স্রষ্টার কি এমন উদয়-অস্ত থাকতে পারে! ধীরে ধীরে যুক্তিময় চেষ্টনা এবং প্রত্যয় জেগে ওঠে তাঁর মনে: এ চাঁদ, সূর্য আর সারা মহাবিশ্বকে যিনি তৈরি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। আর তাঁর নির্দেশই চাঁদ-সূর্যের এমনি উদয়-অস্ত।

আপেক্ষিক জ্ঞান ও সত্যসন্ধানী বাস্তব দৃষ্টি সেই হান্দি কটিলতা থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে মুক্ত করে আর তাঁর চিন্তকে উদ্ভাসিত করে সত্যের অনিবার্ণ আলোয়। কোরাআনের এ ঘটনায় বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কে মানুষের এক সাধারণ জিজ্ঞাসারই উত্তর রয়েছে। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের আবেদন বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবধর্মী আবেদন এবং ইসলাম মানুষের যে কোন সমস্যাকে এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে তাকে সত্যিকার পথের সন্ধান দেয়।

সুনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক আইনের পেছনে এক মহান নিয়ন্ত্রার কল্যাণময় হস্ত ক্রিয়াশীল এবং সমগ্র সৃষ্টি যে একটি উদ্দেশ্যের পথে ধাবমান, কোরাআনের বহু জায়গায় তাঁর এমনি বহু সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। আজ পারমাণবিক ও মহাজাগতিক আলোক-বিজ্ঞানের

সর্বশেষ সাফল্য এ ঘোষণারই দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রকাশ করে। মহাজাগতিক ধূলিরাশি এবং অযুত-কোটি নীহারিকাপুঞ্জ ও ছায়াপথের গাণিতিক পরিমাপে ব্যর্থ হয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক আইনস্টাইন অবাক বিন্ময়ে উচ্চারণ করেছিলেন : নিচয়ই এর পেছনে রয়েছে এক অকল্পনীয় মহাজ্ঞানী সত্তার এক রহস্যময় অভিপ্রের্ত। বিজ্ঞানীর দূরবিসারী জিজ্ঞাসা সেখানে বিমূঢ় হয়ে যায়- বিজ্ঞানের সমাগত চূড়ান্ত অগ্রগতিও সেখান থেকে শুরু হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সেই অনন্ত মহাজাগতিক রহস্যের প্রতিভাস বিজ্ঞানীর মনকে এই নিশ্চিত প্রত্যয়ে উদ্বেল করে তোলেঃ এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্তা রয়েছেন। তিনি অলৌকিক জ্ঞানময়। তাঁর সৃষ্টিকে অনুভব করা যায়-কিন্তু তাঁকে কল্পনা করা যায় না।

এ বইতে পদার্থবিজ্ঞান, পারমাণবিক বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যাসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানী তাঁদের নিখুঁত গবেষণা এবং বিজ্ঞানের সর্বশেষ সাফল্যের নিরিখে যাচাই করে আদ্বাইতের অস্তিত্ব সম্পর্কে এ কথারই সুস্পষ্ট পুনরুক্তি করেছেন। চাঁদ, মংগল ও শুক্র গ্রহে মহাশূন্যায়ানের অভিযাত্রার ফলে যে বিন্ময়কর তথ্য লাভ সম্ভব হয়েছে, তাতে পদার্থ, পরমাণু ও জীবসৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা আরও সংবদ্ধ হয়েছে। সৌরজগৎ ও গ্রহলোক সম্পর্কে কোরআনে যে উক্তি রয়েছে, মহাশূন্য বিজ্ঞানীদের এ সাফল্য তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

কিন্তু জড়বাদীরা মহাশূন্যের এ সাফল্যকে নাস্তিক্যবাদী প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। তারা বলছে, এ হচ্ছে মানুষের অসম্ভব সাধানার সূচনা এবং মানুষের যে কোন নিয়ন্তা নেই, আর মহাবিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য যে মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে-এ থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে। আর একদিন মানুষ প্রাণসৃষ্টির রহস্যও উদ্ঘাটন করতে পারবে। কিন্তু না, তা কোন দিন সম্ভব নয়। পদার্থ ও অণুবিজ্ঞানের নিখুঁত পরীক্ষাও তাকে 'অসম্ভব' বলে রায় দিয়েছে। তবু নাস্তিক্যবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য, উদ্ভট হলেও এ প্রচারণা হতে নিরন্তর হচ্ছে না। কিন্তু বিবেকবান ও সত্যসন্ধানী মানুষ এ প্রচারণায় কিছুতেই বিভ্রান্ত হবে না।

বিজ্ঞানের নামে নাস্তিক্যবাদীদের এ যুক্তিহীন প্রচারণার চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক শাখার চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানী গবেষণাগারে লব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণপঞ্জি এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার আলোকে চুলচেরা বিচার করে আদ্বাইতের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই বইটি লিখেছেন। আমরা আশা করি, বিংশ শতাব্দীর মানসিক সংঘাতময় এ যুগ-শ্রেষ্ঠগায় এই মূল্যবান বইটি মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং তাঁর মহান স্রষ্টা সম্পর্কে মানুষের সাধারণ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারবে।

বইটি আমাদের সচেতন পাঠক-সমাজের সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

বিনীত-

প্রকাশক

ঢাকা, জুলাই ১৯৬৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠ
এ বিশ্বের গোড়াপত্তন : আকস্মিক না সুপরিকল্পিত?	২০
– ফ্র্যাংক এ্যালেন, জীবপদার্থ বিজ্ঞানী	
একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা	২৫
– রবার্ট মরিস পেজ, পদার্থ বিজ্ঞানী	
গোলাপ ঝাড় যে শিক্ষা দেয়	৩০
– মেরিট স্ট্যানলী কংডন, প্রকৃতি বিজ্ঞানী	
অপরিহার্য সিদ্ধান্ত	৩৪
– জন ক্লীভল্যান্ড কথর্যান, অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা	
উত্তর দেওয়া হয়নি এমনি সব প্রশ্নের জবাব	৩৯
– ডোনাল্ড হেনরী পোর্টার, পদার্থবিদ	
পক্ষপতিত্ব বাদ দিয়ে আসুন অন্যের দিকে তাকাই	৪৪
– এডওয়ার্ড লুথার কেসেল, প্রাণিতত্ত্ববিদ	
বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রয়োগ	৪৯
– ওয়ালটার অস্কার লান্ডবার্গ, জীব-রাসায়নবিদ	
আল্লাহর বাহ্যিক প্রমাণ	৫২
– ক্ল্যারেন্স ইবার সোল্ড, প্রাণ-পদার্থবিদ	
‘আইন্সটাইনের সৃজনীশক্তি’ সনাক্তকরণ	৫৫
– মারলিন বুকস্ট্রীডার, শরীরবৃত্তবিদ	
বৈজ্ঞানিক প্রত্যাশে আল্লাহকে নির্দেশ করে	৬০
– জর্জ আর্ল ডেভিস, পদার্থবিদ	
সামান্য পানি আপনাকে গল্প বলবে	৬৩
– থমাস পার্কস, রসায়নবিদ	
প্রকৃতির জটিলতা ও আল্লাহ	৬৬
– জন উইলিয়াম কুটয়, প্রজনন বিদ্যাবিদ	
আমাদের মুখোমুখী অত্যন্ত অপরিহার্য প্রশ্ন	৭১
– অস্কার লিও ব্রাউয়ার, পদার্থ ও রসায়নবিদ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রেণী জড়বাদ চলবে না	৭৩
-আরভিং উইলিয়াম নবলক, প্রকৃতি বিজ্ঞানী	
ব্যক্তিগত বিশ্বাসের খোঁদা : বিজ্ঞান সম্ভবভাবে দেখা	৭৬
-জন লিও অ্যাবারনেথী, রসায়নবিদ	
এক তরুণ অতীন্দ্রিয়বাদী স্পষ্ট চিন্তাধারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে	৮০
-রাসেল লাওয়েল মিক্সটার, প্রাণিতত্ত্ববিদ	
উদ্ভিদ জগতে আল্লাহর স্বাক্ষর	৮৩
-জিরাড ডেন হার্টক, উদ্ভিদ ও জীববিদ্যাবিদ	
এক করেটারের কিন্তু বুক থেকে সংগৃহীত তথ্য	৮৭
-লরেন্স কল্টন ওয়ালকার, উদ্ভিদবিদ	
ফল বাগানের মালিক পুত্র বা শিখেছিলো	৯৪
-ওয়াল্টার এডওয়ার্ড লেয়ার্স, প্রজনন বিদ্যাবিদ	
শত্রু-পরার্থ প্রাণচক্রল দেখকোষ তাদের স্বর্জ শোনাচ্ছে	৯৮
- রাসেল চালস্ আর্টিষ্ট, জীবতত্ত্ববিদ	
আন্তিকতার যুক্তিযুক্ততা	১০৩
-জর্জ হার্বিট ব্লাস্ট, ফলিত-পদার্থবিদ	
ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নির্দেশপত্র	১০৮
-ডোনাল্ড রবার্ট কার, ভূ-রসায়নবিদ	
আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোতে 'জেনেসিস-১'	১১২
-পিটার স্টোনার, জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ	
মহান পরিকল্পক	১১৭
-ক্রাড হ্যাথাওয়ে, যন্ত্রবিদ্যাবিদ	
বিষমজ্ঞানোচিত সাক্ষ্য আর কয়েকটি পর্যবেক্ষণ	১২০
-মার্লিন স্মিথ, গাণিতিক	
প্রাকৃতিক আইনাবলীর' পশ্চাতে একবার অবলোকন	১২৪
-এডুইন ফাষ্ট, পদার্থ বিজ্ঞানবিদ	
রাসায়নিক আইনাবলী ও আল্লাহ	১২৭
- জন বুয়েহ্লার, রসায়নবিদ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিজ্ঞান আল্লাহর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে	১৩৩
-আলবার্ট আইনস্টাইন, জীববিদ্যাবিদ	
আন্তিকতার কাছে প্রকৃতিবাদকে অবশ্য মাথা নোয়াতে হবে	১৩৫
-কারল কারকালিটস, রাসায়নিক যন্ত্রশিল্পবিদ	
আল্লা- আদি ও অন্ত	১৩৯
-এডমন্ড কার্ল কর্নফেল্ড, রিসার্চ কমিটি	
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে মহাবিশ্ব	১৪২
-আল্য চেষ্টার রেন্ন, গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী	
ধর্মের বৈধতা	১৪৫
-ম্যালব্‌স ডানকান উইন্টার জুনিয়ার, মেডিক্যাল ইন্টারনিষ্ট	
মৃত্তিকার বিশ্ব	১৪৯
- ডেলি সোয়াট জেনডুবার, মৃত্তিকা পদার্থ বিদ্যাবিদ	
মৃত্তিকা উদ্ভিদ আর একটি ৪০০০ বছরের পুরানো ব্যাখ্যা	১৫৩
-লেটার জন থিয়ারম্যান, মৃত্তিকা বিজ্ঞানবিদ ও শরীরবৃত্তবিদ	
মানুষ নিজেই সাক্ষ্য	১৫৭
-রবার্ট হটম ক্যানেরন, গাণিতিক	
পবেষণাপাণের শিক্ষা	১৬০
-এলমার ডব্লিউ মরার, রিসার্চ কমিটি	
বিজ্ঞান ও ইমানের মধ্যে ঐক্য	১৬৪
- ওয়েনি ইউ, অল্ট, ভূ-রসায়নবিদ	
চিকিৎসা পদ্ধতিতে আল্লাহ	১৬৮
-পল আর্নেস্ট অ্যাডল্ড, চিকিৎসক ও সার্জন	
ফুল আর ওরিশুল পানীয় সম্পর্কে	১৭৩
-সিগিল বয়েস হ্যামান, জীববিদ	
আল্লাহর অস্তিত্বের নিশ্চয়তার পূর্ণতা	১৭৭
-আনাড্রু কনওয়ে আই, ভি, শরীর বৃত্তবিদ	

সম্পাদকের কথা

এই বইখানি মুদ্রণের দুই-এক মাস আগে ইভিরালা পেলিসে আয়োজিত বিজ্ঞানের উৎসব সাধনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান সমিতির অধিবেশনে টেক্সাসের জনৈক জীববিদ্যার অধ্যাপক মন্তব্য করেন যে, মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে জীব নয়, সে উদ্ভিদ। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, জীবন্ত উদ্ভিদের দেহকোষের আত্যন্তরীণ কাঠামোর উন্নতির কালে মানুষের জন্ম। এই সংগে তিনি মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে, হলুদ আলগী (অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব এমন এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ) ও লাল এবং বাদামী সামুদ্রিক জাগাছার কথা উল্লেখ করেন। কি করে এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার হিসেব নিকেশ করা যেতে পারে? অধ্যাপক অবশ্য স্বীকার করেন যে, যে প্রক্রিয়ার মানুষ উদ্ভিদ থেকে মানুষের রূপ নিয়েছে, তা আজও অজ্ঞাত। মনে হয়, তিনি যেন কোন দিনই আল্লাহ'র কথা এবং আল্লাহ'র সৃষ্টির কথা পোনেলনি।

এই ঘটনার ঠিক আগ, আরেকটি ব্যাপার সংঘটিত হয়। ব্যাপারটি হচ্ছে জনৈক কলেজ গ্রাজুয়েট মিয়ামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি করতে অস্বীকার করে। গ্রাজুয়েটটি ছিল উগ্র নাস্তিক। তিনি শিক্ষকতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চেরেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ নাস্তিকের কাছে তাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষালাভ ক্ষতি মনে করেন বলে তাঁকে ভর্তি করা হয়নি। “আমেরিকার স্বাধীন চিন্তাবিদগণ, তাকে যাতে ভর্তি করা হয় তার জন্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের সম্মতি অর্জনের জন্যে একজন আইনজ্ঞ পর্বস্ত নিযুক্ত করেন। বাই হোক, বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন আছে।

প্রায় একই সময়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ছাত্রপরিষদ’ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মনোভাব সম্পর্কে আগর-গ্রাজুয়েটদের অভিমত সংগ্রহ করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তারা মোট ১৯০ জন ছাত্রকে তাদের মতামত জানাতে অনুরোধ করেন। তার মধ্যে ৪০ জন ছাত্র কোন প্রকার মতামত প্রকাশে অস্বীকার করেন। অবশিষ্ট মোট ছাত্রের শতকরা ৪০ জন নিয়মিত গির্জায় যেয়ে থাকেন। শতকরা ৭৯ জন প্রশ্নটি, আল্লাহ'র অস্তিত্বের বিষয়টি ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’ বলে মনে করেন। কমিটি আগর-গ্রাজুয়েট ছাত্রদের মধ্যে অধিকতর ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্যে একান্তিক দাবী উত্থাপন করেন। “অস্তিত্বের অর্থ কি?” আল্লাহ আছেন কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান চেরে কমিটি উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী জানান।

আমেরিকার শিক্ষা জীবনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় উল্লিখিত বিষয় থেকে। একটি জনপ্রিয় জাতীয় পত্রিকায় হার্ভার্ড কমিটির এই প্রশ্নগুলি ও মন্তব্যসমূহকে আগর-গ্রাজুয়েটদের আতঙ্কিততা বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এতে আমেরিকার জনগণের একটা অংশের মতামত প্রকাশ পেলেও সাংবাদিকতার দিক থেকে একটা প্রাচীর পরিচয় মেলে।

গার্ল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণরা এগিয়ে আসার কয়েক মাস আগে আমি আমেরিকার-
কর্নট বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্নই করেছিলাম, “আল্লাহ্‌র আছেন কি?” আমি লিখেছিলাম,
তারা যেন তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে লিখে জানান। এই সঙ্গে তাঁদের উক্ত
মতামত আমি পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতিও তাঁদের কাছে চেয়ে পাঠাই; তাঁদের যেহেতু
চল্লিশটি জবাব পুস্তকাকারে পাঠক সমাজের কাছে পেশ করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি জবাব,
দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-প্রত্যেকটিতে চিন্তাধারা ভিন্ন; রচনামূলক স্বতন্ত্র-কারণ
এতো তাঁদের স্ব-স্ব সৃষ্টি। আমি শুধুমাত্র জবাবগুলির মামুলী সম্পাদক মাত্র। তবে আমি
বলতে চাই : এই বইয়ের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ, ইয়া, চল্লিশটি নিবন্ধই একটি মাত্র
লক্ষ্যপথে এগিয়েছে- যে লক্ষ্য সুদৃঢ় বিশ্বাস বৈ আর কিছু নয়। আমি এই বইয়ের
লেখকদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এই ধরনের বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, গুরুত্ব যে ‘জীব’র
উল্লেখ করা হয়েছিল, তেমনি মনোভাবের পরিচয় অনেক অনেক দেশেই মিলবে।
আজকের দিনেও অনেক অভিভাবক রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষা
দিতে আজো ভয় পান-ভয় এই জন্যে যে, তাঁদের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা পেলে ধর্ম
থেকে দূরে সরে যাবে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানশিক্ষা এমন অকল্যাণ থেকে আনতে পারবে বলে
অভিভাবকদের ধারণা ভ্রান্ত সংশ্লিষ্ট নেই। এই বইয়ের বিভিন্ন নিবন্ধে তাঁদের এই ধারণা
অনেকখানি দূর হতে বাধ্য-তাঁরা প্রকৃত আলোর সন্ধান পাবেন।

আশা করা যায়, এই বইয়ে বড় বড় বিজ্ঞানীগণ যে সকল তথ্য পরিবেশন করেছেন,
তা ছাত্র ও তাঁদের শিক্ষকদের-দুনিয়ার শত-সহস্র শিক্ষক আর ছাত্রের বিশেষ উপকার
হবে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং মহাবিশ্বের সংগে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে আমাদের চিন্তাশীল
বিজ্ঞান-মহলের যেসকল মনোভাব বিদ্যমান; আমার মনে হয়, সাধারণ শিক্ষিত মহলেরও
একই ধারণা-এই বই তাদের সকল অবাস্তব কল্পনাকে দূর করে সঠিক পথ প্রদর্শন
করবে।

আমরা আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক বছরের মাঝখানে রয়েছি; কাজেই এই সময়ে যখন
বিশ্বের ষাটটিরও বেশী সংখ্যক জাতি এই ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ কাজে যোগ দিয়েছে, তখন
এই ধরনের একটি বই তাদের সবার জন্যে প্রকাশ করা খুবই সময়োপযোগী হবে বলে
আমার বিশ্বাস। হাজার হাজার বিজ্ঞানী যখন মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত তখন আমি
মনে করি, ধর্মবিশয়ক ব্যক্তিদের লিখিত, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে অকাটা প্রমাণ অত্যন্ত
বাঞ্ছনীয়।

এই বইটি প্রকাশ হতে চলেছে, এমন সময়ে “স্পুটনিক” আকাশে উড়লো। বিশ্বের
ইতিহাসে বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষকে হতবাক করে দিলো। মানুষের

মনে ধারণা হলো, তাহলে বিজ্ঞানের অসামান্য বোধ হয় আর কিছুই থাকছে না। মানুষের সব সাধারণ চিন্তার সীমা ছাড়িয়ে, আরো দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। বৈজ্ঞানিক ঘটনা হিসেবে, আমরা যতদূরই “স্পুটনিক”-কে অভিমত দিচ্ছি। আমরা সাধারণ উদ্বেগের আর উদ্বেগেরও শরীক হলাম। কিন্তু একই সঙ্গে যেখান থেকে, যে মাটি থেকে “স্পুটনিক” আকাশে উঠলো, সেই মাটির প্রতিটি আশ্বাসের সৃষ্টি নিবন্ধ হলো।

এ কথা ঠিক, আজকের দুনিয়ার বেশ উল্লেখযোগ্য অংশে এমন সব নেতা প্রভুত্ব বিস্তার করে রয়েছেন যাদের দর্শন হচ্ছে নাস্তিক-জড়বাদ। এই দর্শনের একটি কার্যকরী কল হচ্ছে ব্যাপক কারিগরি সাক্ষ্য। আরেকটি দিক হচ্ছে, বিজ্ঞানিক দিক। যোদাকে যখন তারা “চেকে ফেলছে” তখন ঐশ্বরিক আইন, বিবেক; নৈতিক আদর্শ এবং বর্ধাৎ নৈতিকতা সবই সেই সঙ্গে চাপা পড়ে যায়, এটাও ঠিক। সেই সঙ্গে তারা যে বর্ধার অসামান্যতার অবাধ জয়যাত্রা শুরু করে তাতেও সম্বন্ধের অবকাশ নেই। আমাদের প্রতিটি লেখক এই বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে নির্ভুল সত্য-ভেদ করেছেন; জড়বাদী এই দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁরা স্পষ্ট আক্রমণ করেছেন।

এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, প্রকৃতির আইনাবলী প্রত্যেকের সাধ্যমে এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবিদ্যা দ্বারা মানুষের কর্মসূচির অতীত একটি শক্তির অস্তিত্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা। বিজ্ঞান ও ধর্মের সাধারণ ভাষার বর্ণনা করা ছাড়া উভয় শক্তিকে সনাক্ত করতে অথবা বর্ণনা করতে পারে না। বিশেষভাবে পরিচয় করানোর জন্যে এবং বিস্তারিত বর্ণনামানের জন্যে বিশেষ ওহির (বাইবেলের) প্রয়োজন। কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য পথে অগ্রসর হয়ে আসি মনে করি আমাদের বিজ্ঞানীপন বর্ধাৎ নাস্তিকতার মূলে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছেন।

যে সকল দেশে খৃষ্টাব্দ বিদ্যমান সেখানে নাস্তিকতা, প্যাগানবাদকেই বুঝায়। অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে বলা হয় যে, এক আদ্বাদ, প্যাগানবাদের সর্বনিম্ন স্তর থেকে ধীরে ধীরে জনসাধারণ করেছে। কারণ, এর ঠিক উল্টোটিই হচ্ছে সত্য। মূলে এক আদ্বাদই বিকৃত হয়ে বিভিন্ন রূপের প্যাগানবাদের সৃষ্টি করেছে। মূলতঃ মানুষের সাধারণ একটা ধারণা ছিল, আল্লাহ একজন আছেন, এবং আল্লাহ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তারপর, এই সাধারণ ধারণাটি নানানভাবে বিকৃত হতে থাকে। এই বিকৃতি ইতিহাসের পাতায় এমনভাবে ধরা পড়েছে : (১) প্রথমে এক আদ্বাদ থেকে সর্বপ্রাথমিকের জন্য হয়, তারপর আসে (২) অস্বত্বিত্ব বহুবাদ, তারপর (৩) প্রকৃতির উপাসনা, (৪) পৌত্তলিকতা-সৃষ্টি সৃষ্টির উপাসনা (৫) মানুষের পূজা করা-শক্তিশালী মানুষের পূজা করা, (৬) রক্তিকে পূজা করা ও সর্বশেষ পর্যায়ে আসে (৭) নাস্তিকতা।

আমাদের অনেক প্রকৃত-দার্শনিক, নিঃসন্দেহে মহান চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁদের দর্শন মূলতঃ প্যাগান। আধুনিক জীববিদ্যাবিদ লাবর্ক, ওয়াগেনার এবং

ডারউইনের ক্ষেত্রে এই কথাটি খুবই ঠাট। খুব বেশী প্রভাব বা হলেও এ কথা ঠিক যে, চার্লস ডারউইন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বলেছিলেন, যদি তাঁর বিপরীত কোথাও সামান্যতম একটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীতই ভেঙে পড়বে। প্রকৃত প্রত্যয়ে তিনি যে ধার্মবাহিকতার উল্লেখ করেছিলেন তার একটি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে তাঁর বিপরীত অসার প্রমাণ করা হয় নি। তদনুসারে নিউ-ডারউইন পন্থীদের জন্ম হয়েছে।

আধুনিক 'প্যাগান' চিন্তানায়কদের কয়েকজন— ডারউইন ও তাঁর সহকর্মীদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কয়েকজন, পিছনে ফিরে তাকাতে কসুর করেননি। জার্মানীর রাইনিকি তাঁর 'ডাই' ওয়েল্ট অ্যালস দ্যাট' (Die welt als that) -এ বীকার করেছেন, 'শাস্ত্রত মনীষা' ও 'শাস্ত্রত কমতা বা শক্তি' বিদ্যমান। ইল্যোডের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোমানোস তাঁর স্বল্পকাল আগে বীকার করে গেছেন যে, তাঁর সমুদয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা বৃত্তঃ ফুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বীকার করেছেন, মহাবিশ্বকে কোনক্রমেই আল্লাহর অস্তিত্ব বীকার না করে বোঝানো যায় না। তিনি ছাড়া আরো অনেক অনুশোচনাকামী রয়েছেন।

বিশ্ববিখ্যাত ইরোজ রাসায়নিক ও পদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল ক্যারাডের জীবন আরেকটি দৃষ্টান্ত। মাইকেল ক্যারাডে আত্মবিশ্বাস নিজস্ব বিপরীত পক্ষে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত তিনি দাঁড় করান। ১৮৬৭ সালের কোন একদিন মাইকেল ক্যারাডের সূহৃদ্যব্যার তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী গ্রুপ করলেন, "ক্যারাডে! এখন তোমার ধারণা কি?" "ধারণা?" সূহৃদ্যপথের বাকী গ্রুপটি পুনরাবৃত্তি করলেন। "ধারণা? না, আমার আর কোন ধারণাই নেই। আল্লাহ তা'আলাকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাকে আর কোন ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। আমি কাকে বিশ্বাস করতাম তা জানতে পেরেছি, জ্ঞানতে করেছি, সেদিন পর্যন্ত আমি যা কিছু করেছি তিনি সমুদয়ই সন্মত করতেন।"

বিপ্লব-যুগের বিখ্যাত রাসায়নশাস্ত্রবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানীশ্রম তখন খেঁচই জড়বাদী বিপরীত আগোনে গিয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন বন্ধু সম্পর্কে নানা প্রকার বুদ্ধিতর্কের অবতারণায় সন্নিবিষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই কেন্দ্রীয় সাধারণভাবে অগভীর-বিজ্ঞানীদের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল এ কথা ঠিক; কিন্তু বারো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসেবে বীকৃতি লাভ করেছেন, তাঁদের বিপরীত সম্পূর্ণ অন্য পথে, সহজ পথে অগ্রসর হয়েছে। তাঁরা বিপ্লব অর্ধশতকে তাঁদের গবেষণা দ্বারা জড়বাদী চিন্তাধারাকে হতবাক করে দিয়েছেন।

এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট। সৃষ্টিশীল বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসম্মত সাধনা করেছেন। তাঁদের পূর্ববর্তীদের চাইতে তাঁরা অনেক বেশী জ্ঞানলাভ করেছেন— অনেক

বেশী জ্ঞানতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যে নতুন নতুন তথ্যই আবিষ্কার করতে পেরেছেন তাই নয়—সেই সংগে তাঁদের সমস্যা বেড়েছে অনেক—অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। ক্রমে তাঁদের চিন্তার দিগন্ত একেবারে অশেষতার অন্ধকারে ঢেকে যায়। কলে তাঁরা সেইসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ করেন। আর তাই আমরা আজকের দিনের বাবতীয় বিষয়ের বস্তু দেখতে পাই।

আমরা এই বইয়ে দেখতে পাবো, আমাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক কত বিনয়ী হয়ে উঠেছেন তাঁদের গবেষণার মধ্যদিয়ে। আবার অনেকের পরিচয় পাবো, যারা আগে থেকেই অভ্যস্ত বিনয়ী। গবেষণার মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান বতই বাড়তে থাকে, ততই তাঁরা ভক্তিতরে নূয়ে পড়তে থাকেন। তাঁদের অনেকে সেই সঙ্গে অবর্ণনীয় আনন্দে উষ্মলিত হয়ে ওঠেন। কারণ, সকল ঘটনার মধ্যদিয়ে, কুয়াশা ও কুঙ্কটিকা এবং অসংখ্য সমস্যাবলীর ভেতর দিয়ে তাঁরা মহান আলোকের সন্ধান লাভ করেন, অর্ধদৃষ্টি লাভ করেন এবং সত্য-সুন্দর পথে তাঁদের অভঃপর পরিচালিত করে সেই আলোক।

— জন ক্রোডার বোনহুমা

এ বিশ্বের গোড়াপত্তন : আকস্মিক না সুগমিকল্পিত?

ক্যাম্ব্রিও প্রাচীন।। জীবপদার্থ বিজ্ঞানীঃ এম, এ, ড, গি-এইচ, ডি, কর্বেল বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯০২-১৯৪৪ পর্বত কানাডার ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক; বর্ণদর্শন, শারীর বৃত্তীর আলোকবিদ্যা, তরঙ্গ বায়ু উৎপাদন বিশেষজ্ঞ। কানাডার রয়াল সোসাইটির টোন্ট্রী পোস্ট মেডেল প্রাপ্ত ॥

অনেক সময় এমনি প্রতীতি জন্মানো হয় যে, এই জড় বিশ্বপ্রকৃতির জন্যে কোন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয়নি। তবে একথা ঠিক যে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে চারটি সমাধান দেওয়া যেতে পারেঃ প্রথম, পূর্ববর্তী উক্তির পরিপন্থী এ বিশ্ব বিজ্ঞান যাত্র; দ্বিতীয়, সম্পূর্ণ শূন্য থেকে বতঃকর্তভাবে তার উৎপত্তি হয়েছে; তৃতীয়, আলো এ বিশ্বের কোন গোড়াপত্তন হয়নি-অনাদিকাল থেকে মহাবিশ্ব বিদ্যমান; চতুর্থ, এটি সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রথম সমাধানটি নিশ্চিতভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র অনেক সময় বিজ্ঞান বলে বিবেচিত মানব মনের চেতনা সম্পর্কিত অধিবিদ্যা-সমস্যা হাড়া এই ব্যাপারে আর কোন সমস্যা নেই। স্যার জেমস জিনসের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সন্ততি বিজ্ঞানের প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত ধারণা থেকে তিনি বলেন, “এ বিশ্ব কোনক্রমেই জড় প্রতিরূপকে স্বীকার করতে পারে না। আমার মতে এর কারণ এই যে, এটি শুধুমাত্র মানসিক কল্পনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।” অনুরূপভাবেই কেউ বলতে পারে, কল্পনার রেলগাড়ী আপাত প্রতীয়মান কাল্পনিক যাত্রী বোঝাই করে নিয়ে মানসিক কল্পনার মালমশলায় তৈরি সেতুর ওপর দিয়ে অবাস্তব সব নদী অতিক্রম করে।

পদার্থ আর শক্তির আধার এই বিশ্বের হঠাৎ করে একেবারে শূন্য থেকে উৎপত্তি সম্পর্কিত এই দ্বিতীয় ধারণাও প্রথম চিন্তাধারার মত এতই অতিমাত্রায় অযৌক্তিক যে, এর বিচার-বিবেচনা নিশ্চয়োজন।

তৃতীয় চিন্তাধারা হচ্ছে, আবহমানকাল থেকে এই বিশ্ব বিদ্যমান। এতে অন্ততঃপক্ষে একটা বিষয় স্বীকৃত হয়েছে, এবং তা হচ্ছে সৃষ্টি সম্পর্কিত ধারণা- তা সে সৃষ্টি শক্তি-সম্মিলিত কোন জড়-পদার্থ দ্বারা হোক বা স্বয়ংকৃত কোন সৃষ্টিকর্তা দ্বারা তৈরি হয়ে থাক, তাতে কিছু আসে-যায় না, তবে সৃষ্টির ধারণা শাস্ত। এই দু’টি ধারণার একটি থেকে অপরটিতে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে যে বড় রকমের অসুবিধে রয়েছে, তা নয়। কিন্তু তাপ-গতিবিদ্যার (তাপের) নিয়ম-কানুন থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে,

এই বিশ্ব ক্রমশঃ ভাগ বিকিরণ করতে করতে নিম্ন-তাপের দিকে এসিয়ে যাচ্ছে এবং এমন এক সময় আসবে যখন গ্রহ-উপগ্রহ মাত্রাধিক রকম নিম্ন তাপমাত্রায় উপনীত হবে এবং তখন তাপশক্তি বলতে আর কিছুই থাকবে না। আবহমানকাল থেকেই যদি এ বিশ্ব বিদ্যমান থাকতো, তাহলে অনন্ত জলীয় এই সময়ের ব্যবধানে নিশ্চয়ই এই বিশ্বে ইতিমধ্যেই অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতো। কিন্তু উক্ত সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলী, গ্রাণ-সংশদে সমৃদ্ধ এই পৃথিবী এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মহাবিশ্ব যথাসময়ে এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, নিশ্চয়ই এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিরাট সৃষ্টির মূলে শাব্বত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এক মহান সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই রয়েছেন এবং মহাবিশ্ব তাঁরই সুন্দর সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

প্রাণী বাসের উপযোগী করে পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এতে এমনি সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যে, সেগুলি বিবেচনা করলে কোন ক্রমেই বলা চলে না যে, হঠাৎ করে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে : পোলাকার এই পৃথিবী মহাশূন্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থান (“তিনি পৃথিবীকে শূন্যের ওপর স্থলিয়ে রেখেছেন”— জোব ২৬ঃ৭) করছে এবং সেই সংগে নিজ মেরুদণ্ডের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। এই দু’টি গতির ফলেই পৃথিবী মহাশূন্যে ঠিক নির্দিষ্ট পথে ঘুরে আসতে সক্ষম হচ্ছে এবং পরিক্রমণ কালে পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্যের চারদিকে ধীর পরিক্রমণ পথের (কক্ষপথের) সংগে একটু (২-৩০ ডিগ্রী) ঝুঁকে থাকার ফলে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আবাদী এলাকার পরিমাণ বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সংগে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির পৃথিবীর চাইতে অনেক বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ-পুষ্টি জন্মানো সম্ভবপর হয়েছে।

দ্বিতীয়, গ্রাণ-রক্ষাকারী গ্যাসে ভর্তি বায়ুমণ্ডল পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যথেষ্ট উপর পর্যন্ত (প্রায় ৫০০ মাইল) বিস্তৃত এবং সেক্ষেত্রে প্রায় তিরিশ মাইল পতিবেগে প্রতিদিন বিশ লক্ষ টন পৃথিবীর দিকে ছুটে আসলেও বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এত বেশী যে, এই সমুদয় উচ্চারণ সংঘর্ষ থেকে পৃথিবীকে সারকণ আড়াল করে রাখছে। আরো অনেক কাজের মধ্যে তাপমাত্রাকে জীবনধারণের পক্ষে নিরাপদ মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখাও বায়ুমণ্ডলের একটি কাজ। মহাসাগর থেকে উদ্ভিত অত্যাবশ্যকীয় অ-সবপাত জলীয় বাষ্পকে স্থলভাগের অনেক অভ্যন্তরে বহন করে নিয়ে গিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠকে সিঞ্চন করা বায়ুমণ্ডলের আরেকটি কাজ। অর্থাৎ, এই বৃষ্টি না হলে সারা পৃথিবী প্রাণহীন উষ্ণ মরুভূমিতে পরিণত হতো। তাই দেখা যাচ্ছে, মহাসাগরগুলি, বায়ুমণ্ডলসহ প্রকৃতির ‘সুখ-চক্র’।

পানির চারটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ ধর্ম হচ্ছে : নিম্ন তাপমাত্রায় এর বিপুল পরিমাণে অক্সিজেন তবে নেয়ার ক্ষমতা, হিমায়-বিশুর ওপর ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এর

সর্বাধিক ঘনত্বের কলে হ্রদ আর নদীর পানি তরল অবস্থার থাকা, বরফের ঘনত্ব পানির চাইতে কম হওয়ার বরক পানির ওপরে ভাসমান অবস্থায় থাকা এবং পানি যখন জমাটবদ্ধ হয়ে বরফে পরিণত হয় তখন বিপুল পরিমাণ তাপ বিকিরণের কমতা দ্বারা সারা শীতকালে মহাসাগর, হ্রদ এবং নদীতে জলজ প্রাণীর জীবন রক্ষা করা।

ওহ হুলভাগ অধিকতর ভূ-চর প্রাণীর স্থায়ী আবাস ভূমি। সৃষ্টিকা খনিজ পদার্থের ব্যবস্থা করে এবং সজীব উদ্ভিদ মাটি থেকে সেই খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ হজম করে নিয়ে তাকে আবার প্রাণিজগতের প্রয়োজনীয় খাদ্যে রূপান্তরিত করে। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এই খনিজ পদার্থ ছিল বলে সভ্যতার শিল্প-নৈপুণ্য গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সম্পর্কে তাই ইসারা ঠিকই বলেছেন : 'তিনি একে বিশুদ্ধতম একটা কিছু করেন নি, তিনি একে মানুষের বাসোপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন।' (৩৫ঃ১৮, আর, এস, ভি,)

মহানুস্যের বিশালত্বের সংগে তুলনা করে পৃথিবীকে অনেক সময় অবজ্ঞার সংগে অতিশয় ক্ষুদ্র বলে উল্লেখ করা হয়। পৃথিবী যদি সত্যি চাঁদের সমান আকারে ক্ষুদ্র হতো, বর্তমান ব্যাসের যদি এক-চতুর্থাংশে পৃথিবীর ব্যাস হতো, তাহলে এর মধ্যাকর্ষণ শক্তি (পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির এক ষষ্ঠাংশ) বায়ুমণ্ডল ও পানিকে ধরে রাখতে পারতো না এবং তাপমাত্রাও সেই সনে মারাত্মক রকম বৃদ্ধি পেতো। বর্তমান ব্যাসের ত্রিগুণ হলে বর্ধিত পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাণ বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠ হতে চারগুণ বেশী হতো; মধ্যাকর্ষণ শক্তির ত্রিগুণ বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলের বিশাল উচ্চতা মারাত্মক রকম হ্রাস পেতো এবং প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে সেই সংগে এই বায়ুমণ্ডলের চাপ ১৫ থেকে ৩০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পেতো। কলে প্রাণিজগতের ওপর তার ভরত্বের রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো। শীতপ্রধান এলাকা যেমন অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেতো, তেমনি গ্রাণী বসতিযোগ্য অঞ্চলের পরিমাণ ভরানক হ্রাস পেতো। আজকের গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো, ভ্রমণ অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা দুঃসাধ্য বা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়তো।

যদি আমাদের এই পৃথিবী আরও সূর্যের সমান হতো অথচ এর ঘনত্বের কোন পরিবর্তন না হতো, তাহলে মধ্যাকর্ষণ শক্তি ১৫০ গুণ বৃদ্ধি পেতো, বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা হ্রাস পেয়ে প্রায় চার মাইলে এসে ঠেকতো; পানির বাষ্পীভবন হতো অসম্ভব এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে এক টনের চাইতে বেশী হতো। তাহলে এক পাউন্ড ওজনের একটা প্রাণীর ওজন দাঁড়তো ১৫০ পাউন্ড এবং মানুষ আকারে ক্ষুদ্র হয়ে, বলা যেতে পারে, প্রায় কাঠবিড়ালীর সমান হতো। আর এত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কোন প্রকার বুদ্ধি-বিবেচনার কাজ একেবারেই তখন অসম্ভব ছিল।

পৃথিবীকে সূর্যের কাছ থেকে বর্তমান দূরত্বের ত্রিগুণ দূরে সরিয়ে নিলে বর্তমানে পৃথিবী যে পরিমাণ উত্তাপ পায়, তার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে এক চতুর্থাংশে পৌছবে,

পৃথিবীর বার্ষিক পতিবেগ অর্ধেক হবে, তাতে শীতকাল বর্তমান অপেক্ষা দ্বিগুণ দীর্ঘ হবে এবং তার কলে পৃথিবী ভূ-পৃষ্ঠের সকল প্রাণী জমাটবদ্ধ হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর সৌর-দূরত্ব যদি অর্ধেক হতো, তাহলে সূর্য থেকে যে তাপ পৌছে তার পরিমাণ হতো চারগুণ বেশী, নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর পতিবেগ দ্বিগুণ হতো, প্রত্যেকটি ঋতুকাল অর্ধেক হয়ে যেতো। যদিও-বা এই পরিবর্তন কল্পনা করা যেতো, তাহলেও প্রাণাধিক্যের কলে পৃথিবীতে প্রাণিজগতের জীবন-ধারণ কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। সূর্য থেকে আকার ও দূরত্বে এবং কক্ষপথে পতিবেগ এমনি যে, পৃথিবী প্রাণী রক্ষা করতে পারে এবং সেই সঙ্গে বাতাস করে মানব জাতি আজকের মতো শারীরিক, বুদ্ধি-বৃত্তিসংক্রান্ত ও আধ্যাত্মিক জীবন উপভোগ করতে পারে, পৃথিবীতে তারও ব্যবস্থা আছে।

প্রাণিজগতের সৃষ্টির মূলে যদি কোন পরিকল্পনা না থেকে থাকে নিশ্চয়ই তাহলে হঠাৎ করেই তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এখন কথা হচ্ছে, আকস্মিক ঘটনা বা সম্ভাবনা বলতে বা বোঝায় তা হচ্ছে, অতি উচ্চাসের গাণিতিক বিশদী—বা সুনিশ্চিত ও সম্পূর্ণ প্রামাণিত বিষয়ের বাইরে জানেন যে বিরাট পরিধি রয়েছে তাকে বোঝায়। এই বিশদী আমাদের হাতে সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ একটি নীতি জুড়ে দিয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে পারি এবং কোন ঘটনার কোন যে বিশেষ রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই সম্পর্কে আমরা নিশ্চয় করে বলে দিতে পারি।

আমিষ উপাদানগুলি (প্রোটিন) সকল জ্যাত্ত জীবকোষের অপরিহার্য উপাদান এবং পাঁচটি মূল উপাদান—অংগারক ((Carbon), উদ্‌বান, যবক্ষারবান, অম্লজান এবং গন্ধক নিয়ে গঠিত। সেই সংগে সম্ভবতঃ অতীত ভারী একেকটি অণুতে ৪০,০০০ পরমাণু থাকে। যেহেতু প্রকৃতিতে ৯২ টি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ রয়েছে আর সবই যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে ছড়িয়ে আছে, তখন একটি অণু সৃষ্টি করার জন্যে এই পাঁচটি মূল উপাদানের একত্রে মিলিত হওয়ার কতটা সুযোগ, এই জন্যে কি পরিমাণ পদার্থ একত্রে সংরক্ষণ ও নাড়াচাড়ার প্রয়োজন এবং এই কাজ সম্পন্ন হতে কতটা সময়ের দরকার সবই হিসেব করা যেতে পারে। সুইজারল্যান্ডীয় গাণিতিক চার্লস ইউজীন্‌ গাই এই গণনা করেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন যে, এমনি সুযোগের চাইতে অসুযোগের সংখ্যা হচ্ছে ১-এর অনুপাতে ১০—১৬০; বা ১০—১৬০-এর মধ্যে মাত্র একবার এমনি মিলিত হওয়ার সুযোগ হতে পারে। অর্থাৎ ১০-কে ১০ দিয়ে ১৬০ বার গুণ করার পর যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, অবশ্যি তাকে ভাষায় প্রকাশ করা দুর্ভাগ্যবাপ্য, তার মধ্যে মাত্র একবার এমনি ধারা মিলিত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আমিষ উপাদানের একটি মাত্র অণু সৃষ্টি করার জন্যে যে পরিমাণ পদার্থ নাড়াচাড়ার প্রয়োজন রয়েছে তার পরিমাণ সমগ্র বিশ্বের পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণ বেশী। তারপর একমাত্র এই

পৃথিবীতে অনুরূপ একটি অণু সৃষ্টি হতে বহু বছর—প্রায় সীমাহীন লক্ষ কোটি (১০—২৪৩) বছরের প্রয়োজন হবে।

অ্যানিমো অ্যাসিড থেকে এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমিষ উপাদান সৃষ্টি হয়। যেভাবে এই প্রক্রিয়া একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন কারণে এই প্রক্রিয়ার একইখানি ব্যতিক্রম হয়, তাহলে তার জীবন রক্ষা করতে পারবে না—হয়তো তা বিধে পড়িত হবে। অধ্যাপক জে, বি, লেথস (ইংল্যান্ড) হিসেব করে দেখেছেন, একটি মানুষী আমিষ উপাদান সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে যে যৌগসূত্র রয়েছে তাকে লক্ষ লক্ষ উপায়ে একত্রিত (১০—৪৮) করা যেতে পারে। কিন্তু আমিষ উপাদানের একটি মাত্র অণু সৃষ্টি করার জন্যে এইসব সুবোধের যুগপৎ মিলন ঘটানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে আমিষ উপাদানগুলি প্রাপ্য। যখন রহস্যজনক প্রাণ এই উপাদানের মধ্যে প্রবেশিত হয়, তখনই তারা হয় জীবিত। এইরূপ একটি অণু প্রাণের যে আধার হতে পারে, তা আগে থেকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা একমাত্র অনন্ত অসীম সর্বকালত্রুটা আত্মার পক্ষেই সম্ভব। একমাত্র আত্মাই পারেন অণু সৃষ্টি করতে এবং পারেন একে জীবন্ত করে রাখতে।

একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা

রিসার্চ মরিস গেজ ॥ পদার্থবিজ্ঞানী: বি, এস-সি, হ্যামলীন বিশ্ববিদ্যালয়; এস, এস-সি, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়; অনার্স, ডি, এস-সি, হ্যামলীন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭ থেকে ন্যাভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী ওয়াশিংটন ডি, সি-র সংগে জড়িত। ১৯৩৪-এ বিমান সনাক্ত করার জন্যে বিশেষ প্রথম পাল্‌স রাডার প্রদত্ত করেন। ইউ, এস, ডিস্টিংগুইসড সিভিল সার্ভিস এওয়ার্ড, যোগ্যতার জন্যে প্রেসিডেন্টের সার্ভিকিট, আই, আর, ই, কেলোসীপ, হারী ডায়মন্ড মোমোরিয়াল এওয়ার্ড, ফ্র্যাংকলীন ইনস্টিটিউটের ট্রাট ব্যালাকীন মেডেল লাভ করেন। রাডারের ৩৭টি প্যাটেন্টের মালিক। বহুসংখ্যক টেকনিক্যাল প্রবন্ধ এবং সারণ্য রচনা প্রকাশ করেন। বর্তমানে ইউ, এস, ন্যাভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর ইলেকট্রনিক্স রিসার্চের এসোসিয়েট ডিরেক্টর। ইলেকট্রনিক গবেষণা পরিচালনে ও কার্যকরণে বিশেষজ্ঞ ॥

প্রকল্পের পরীক্ষা করতে হলে, প্রকল্পকে সত্যি বলে ধরে নিয়ে যেসব ফলাফলের কথা প্রকল্প পূর্বেই উল্লেখ করে থাকে, সেসব ফলাফল পাওয়ার জন্যে প্রকল্পের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রকল্পের পরীক্ষার জন্যে কমপক্ষে তিনটি মৌলিক বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন : (১) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা। (২) পূর্বোদ্ধৃতিত ফলাফলগুলি সৃষ্টি করা (৩) বিনা প্রমাণে প্রকল্পের সত্যতা সম্পর্কে স্বীকার করা। প্রথম দু'টি শর্ত সাধারণতঃ কোন রকম বিতর্ক ছাড়াই স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে; তৃতীয় শর্তটি একটি জটিল বিষয় এবং কোন প্রকল্পের পরীক্ষার প্রয়োজনীয় মূল বিষয় হিসেবে মাঝে মাঝে এটি স্বীকৃতি লাভে বাদ পড়ে যায়।

গোড়াতে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো যে, পানিতে ভাসার জন্যে জাহাজকে পানির চাইতে হালকা কোন জিনিস দিয়ে তৈরি করতে হবে; তাই কাঠ দিয়ে জাহাজ নির্মাণ করা হতো। পরে ধারণা করা হয় যে, লোহা দিয়েও জাহাজ নির্মাণ করা যেতে পারে এবং তা নিশ্চয়ই পানিতে ভাসতে বাধ্য। জনৈক কর্মকার বলেছিলেন যে, লোহার তৈরি জাহাজ কখনও ভাসতে পারে না; কারণ লোহা কখনও পানিতে ভাসে না। তারপর সে ঘোড়ার পায়ের একটি নাল পানিতে বালতির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তার উজ্জ্বল বর্ণার্থতা প্রমাণ করে। এই প্রকল্প সত্যি নয় বলে তার পূর্ব-বিশ্বাস থাকায় প্রকল্প যে ফলের কথা আগে থেকে উল্লেখ করেছিল, যাতে করে সেই ফল লাভ হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য না রেখে, প্রকল্পের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরীক্ষা উদ্ভাবন করার পথ সে নিজ থেকেই বন্ধ করে দেয়। প্রকল্পে ভুল নেই বলে যদি অনুমান করতে পারতো তাহলে

সে পানি ভর্তি বালতির মধ্যে লোহার তৈরি ঘোড়ার পারের নাল না ছুঁবিয়ে লোহার গামলা পানিতে ভাসিয়ে দিতে পারতো।

অনেক সময় একটি প্রকল্পের সম্পূর্ণ পরীক্ষার জন্যে এমন সব পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়, যা কোন একজন পর্যবেক্ষকারীর পক্ষে প্রত্যক্ষ করা আদৌ সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—ধরুন, একজন পর্যবেক্ষকের কমতা মহাসাগরের পানির উপরিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পর্যবেক্ষকারী পানি-তলের উপরে অথবা পানির নীচে কিছুই দেখতে পারেন না। একমাত্র সম্পর্ক দ্বারা যখন পানি-তল ঠাঁক হয়ে যাবে তখনই তাঁর পক্ষে লক্ষ্য বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব। এই পর্যবেক্ষকারী পানির উপর যে কোন বস্তু সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। অর্থাৎ সব রকম নৌকা, তা সে যতবড় অথবা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, অথবা ভাসমান কোন কিছুর ভগ্নাবশেষ এবং পানির উপর সত্তরপকারী পাখিগুলি সবই তার পর্যবেক্ষণের আওতার মধ্যে আসতে পারে। পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আকাশ-মার্গে বিচরণকারী সব পাখী বা উড়োজাহাজ অথবা সাগরের তলদেশে সত্তরপকারী মাছ ও ডুবু জাহাজের প্রতিদ্বন্দ্বের যতটা সম্পর্ক আদতে তার কোন অস্তিত্বই নেই। পানির তলদেশ থেকে যদি কোন কিছু পানির উপরে উঠে আসে অথবা একটি পাখী যদি আকাশ থেকে পানিতে মাঝে তাহলে তা পর্যবেক্ষকের কাছে—কোন কিছু নেই অথচ তার মধ্য থেকেই একটা কিছু সৃষ্টি হলো বলে মনে হবে। ঠিক এই বিপরীত কিছু ঘটলে তার কাছে সম্পূর্ণ ফল-সাধন প্রক্রিয়া বলে প্রতীয়মান হবে। এই পর্যবেক্ষকের নিকট অনেক প্রশ্ন সূপরিচিত হয়ে উঠবে এবং ক্রমবশী সবই সে ভালোভাবে বুঝতে সমর্থ হবে। বিশেষ করে পানির উপরে ভাসমান বস্তুর সংলগ্ন সম্পর্কিত প্রশ্ন সম্পর্কে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে। তবে মাঝে মাঝে এবং হঠাৎ করে আবির্ভূত প্রশ্নকে কোন ক্রমেই তার কাছে বোঝানো যাবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে : হঠাৎ করে একটি পাখির পানির উপর আবির্ভাব বা তিরোধান এবং পানি থেকে উপরে উড়ে যাওয়া কোন ক্রমেই তাকে বোঝানো যাবে না।

আসুন আমরা ধরে নেই—এই পর্যবেক্ষক একজন সংবাদদাতার সাক্ষাৎ পেলেন, যে নাকি আকাশে বিচরণকারী পাখী ও বিমান দেখতে পায় এবং পানির উপর থেকে তলদেশে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে মাছ ও ডুবু জাহাজও দেখতে পায়। যদি এ দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তাহলে অনেক প্রশ্ন, যা নাকি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় নি, অন্যায়সে এখন তা ব্যাখ্যা করা যাবে এবং উপলব্ধি করাও সম্ভব হবে। তবে উপতল সত্তরণ বা উপস্থিতি তলে উভয়নের মত এমন একটা বৈশ্বিক ধারণার অস্তিত্ব, আমাদের মূল পর্যবেক্ষকের পক্ষে মনে নেওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার হবে। যতক্ষণ না তার সংবাদদাতার নিজস্ব সত্যবাদিতা কোন না কোন প্রকারে পরীক্ষা করা হচ্ছে, ততক্ষণ মূল পর্যবেক্ষকের অবিশ্বাস করার ঝোঁকই বেশী

ধাকবে। হয়তো এই কাজ করা খুবই কঠিন হবে। তবে পর্যবেক্ষক যাতে তার উক্তি সত্য বলে মনে করেন, তার জন্যে সংবাদদাতা একটা কাজ করতে পারেন এবং তা হচ্ছে তিনি যা কিছু দেখতে পাবেন, কেবলমাত্র সেই বিষয় সম্পর্কেই পর্যবেক্ষকের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন—যা আমাদের পর্যবেক্ষক পরে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। কিন্তু কি করে হলো, সংবাদদাতা তার কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটা পাখী মাহ ধরার জন্যে পানির মধ্যে উপর থেকে ডুব দেওয়ার উপক্রম করছে এবং পানির মধ্যে যে মাহটি রয়েছে সেটিকেও সংবাদদাতা সম্ভবতঃ দেখতে পারেন। তিনি তখন পর্যবেক্ষককে বলতে পারেন, তিনি এখন দেখবেন যে, পানির উপরিভাগ হঠাৎ করে কাঁক হয়ে যাচ্ছে। কারণ পানি-ডলা ভেদ করে একটি পাখী পানির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে। পানি কাঁক হওয়ার পর পর্যবেক্ষক দেখতে পারেন একটি পাখী সেই পানির কাঁকের মাঝখান থেকে মাহ ধরে নিয়ে উঠে আসছে এবং আবার আকাশে উঠে যাচ্ছে। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যথার্থ বাস্তবায়িত হবে তখন আমাদের পর্যবেক্ষক অন্ততঃপক্ষে কিছু প্রমাণ পাবেন যে, তার সংবাদদাতা যেসব বিষয়ের কথা বলেন, সে সম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত হয়েই বলছেন এবং তিনি যথার্থই সত্য কথা বলছেন।

এই সামান্য ভূমিকার পর এবারে আসুন আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেই এবং এই ধারণাকে শ্রেণী-বিন্যাস করি—যেভাবে একজন হিসেবে উক্ত ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। যখন আমরা উক্ত একজনের সমস্যাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ করবো, তখন আমাদের এইসব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে :

প্রথম, একটি যুক্তিসিদ্ধ পরীক্ষাকার্য পরিচালনের জন্যে আমাদের অবশ্য কিছুকালের জন্যে মনে করে নিতে হবে যে, একজন যথার্থই খাঁটি। আমরা বিশ্বাস করি আর নাই করি, পরীক্ষার জন্যেই আমাদেরকে এমনি অনুমান করতে হবে। অন্যথায় আমাদের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ পরীক্ষা করা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়, সকল বাস্তবতার সংগে জুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, আমাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা অতিশয় ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই, আমাদের অনেক কিছুরই প্রমাণ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ একজন আছেন এই একজন—আল্লাহরই অস্তিত্বের সংগে সম্পর্কিত কতকগুলি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি পরীক্ষার জন্যে বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্রের বাইরে বিদ্যমান। অনেকে এমনি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ হচ্ছেন একটি আত্মা এবং তাই, যা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত নয়, তিনটি বিশেষ আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং আমাদের জানা সময়ের আইনেরও বাধ্য নয় এবং সেই সঙ্গে এ কথাকেও আমাদের স্বীকৃতি দানের জন্যে প্রস্তুত

ধাকতে হবে যে, ঠিক যেমন সাগরের উপরিতাপ আমাদের জালা সমগ্র এলাকার তুলনায় একটি নগণ্য অংশ, তেমনি আমাদের প্রাকৃতিক বিশ্বের সবই মহাপুণ্য ও কালের বিশেষ আয়তনের মধ্যে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যে সমগ্র বাস্তবতার অতীব ক্ষুদ্র একটি অংশ হতে পারে—সেই বাস্তবরাজ্যে তাঁর অবস্থিতি।

তৃতীয়, আল্লাহ্‌র আছেন—এইরূপ অনুমান করার পর আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই ধারণা বিবেচনা করার জন্যে প্ররোচিত থাকতে হবে যে, আল্লাহ্‌র আমাদের প্রাকৃতিক বিশ্বের বাইরের বাস্তবতা সম্পর্কিত সকল তথ্য আমাদের কাছে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন।

এই প্রবন্ধকারসহ অনেক পর্ববেষণকারী কর্তৃক উল্লিখিত উপায়ে পরীক্ষাকার্য চালানো হয়েছে। তাতে তাঁরা খৃষ্টান বাইবেলে লেখা আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কিত খুব বেশী পরিমাণ তথ্য দেখতে পেয়েছেন। এইসব তথ্য মানবীয় সব সূত্রের দৌলতে বাইবেলে স্থান লাভ করেছে, যারা বাইবেল লিখে গেছেন তাঁদের মাধ্যমে। এঁরা যা বিশ্বাস করেছেন, যা সত্য বলে জেনেছেন, তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যদিও সব মানুষই মানবধর্মী তবুও এইসব মানুষের লেখার সত্যতা সুদূর ভবিষ্যতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভবিষ্যৎগীর মত সব বিষয় যারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে—যে ভবিষ্যৎগামী আমাদের জ্ঞান সময়ের আইনের অবাধ্য একমাত্র এবনি এক জগতের কাছ থেকে কেবলমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্পাদন করা যেতে পারে। অনাগত দিনের ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎগামীই একমাত্র প্রমাণ নয়; তবে, এক ধরনের প্রমাণ হিসেবে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো, যে দৃষ্টান্ত আমাদের সংবাদদাতাদের অর্থাৎ যারা বাইবেল রচনা করেছেন, তাঁদের সাফল্য সত্যতা প্রমাণিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রধান প্রধান সাক্ষ্যের মধ্যে বীণ ও মুসা সম্পর্কে দীর্ঘ ধারাবাহিক ভবিষ্যৎগামী উল্লেখ করা যেতে পারে। বীণর জন্মের শত শত বছর আগে বিভিন্ন সময়ে এইসব ভবিষ্যৎগামী করা হয়েছিল। বীণ সম্পর্কে এইসব ভবিষ্যৎগামীতে অগণিত খুঁটিনাটি তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর স্বভাব এবং আবির্ভাবের পর প্রাকৃতিক বিশ্বের বা বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর জন্যে তিনি যেসব কাজ করবেন, সবই উল্লেখ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সবই ব্যাখ্যাভীত ব্যাপার হয়ে আছে। যেসব ভবিষ্যৎগামী করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি বীণর ঐতিহাসিক আবির্ভাব, সেই সঙ্গে অন্যান্য যেসব বিষয়ের কথা ভবিষ্যৎগামীতে উল্লেখ করা হয়েছিল, তার সব কিছুই সিদ্ধি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত; এই সিদ্ধি সম্পর্কে একমাত্র মূর্খ ব্যক্তিদেরই সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। তাঁর সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যৎগামী করা হয়েছিল, সে সমুদয়ই যে এতে করে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়, বরং সেই সঙ্গে তাঁর আগমনের পর তিনি যে বাণী প্রচার করবেন, পূর্বাঙ্কেই তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের মৌলিক প্রকল্পের বৈধতার জন্যে চূড়ান্ত যুক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও একান্ত ব্যাপার। ব্যক্তি-বাতস্ত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই কেবলমাত্র এ যুক্তির উদ্ভব হতে পারে।

প্রকল্পের সঙ্গে বিজড়িত সংবাদদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে যখন কেউ গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, ভবিষ্যদ্বাণী-উল্লিখিত সেই কল পাওয়া বাচ্ছে কিনা, তা তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

যখন কেউ মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে যে সম্পর্ক থাকতে পারে এবং থাকা উচিত সেই সম্পর্কে গবেষণা করেন, যখন কেউ এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে মানুষের অবশ্যাপালনীয় শর্ত সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং যখন কেউ অতীব ভরত্ব সহকারে ও সর্বাঙ্গিকরূপে এইসব শর্ত পূরণ করতে উদ্যোগী হন, তখন দু'য়ের বেষ্টিত সম্পর্কের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল, ঠিক সেই সম্পর্কই স্থাপিত হয় এবং তা ব্যক্তিগত জীবনে এতটা আত্মব্রকারী প্রভাবের সৃষ্টি করে যে, তখন সেই ব্যক্তির মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আল্লাহ তখন এত কাছে আর এতই বিশাল হয়ে ধরা দেন যে, তিনি তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত এক বাস্তব সত্যের পরিণত হন আর সেই সংগে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমানুপাতে তার বিশ্বাসও তেমনি সুদৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে।

গোলাপঝাড় যে শিক্ষা দেয়

[মেরিট স্ট্যানলী কংডন ।। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকঃ পি-এইচ, ডি; এস, সি, ডি, ওয়েবস্টার বিশ্ববিদ্যালয়; এস, টি, ডি, বার্টন বিশ্ববিদ্যালয়; ফ্লোরিডা ট্রিনিটি কলেজের মৌলিক বিজ্ঞানে সাবেক অধ্যাপক; আমেরিকান কিঙ্কিক্যাল সোসাইটি, মেডিক্যাল একাডেমী অব আমেরিকা এবং অসংখ্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য। মনস্তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, বিজ্ঞানের দর্শন ও বাইবেল সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষজ্ঞ ।]

বহু বছর আগের পেনসিলভিনিয়ার এক বিজন পথের ধারে আমি সুন্দর প্রস্তুতিত একটি গোলাপের ঝাড় দেখেছিলাম। পরে আবার আমি যখন সেই স্থান অতিক্রম করি, তখন ঝাড়ের কাছে আগাছা আর বুনো গোলাপের লতার ঢাকা একটি কুঠুরির দেয়ালের ধসোবশেষ আমার নজরে পড়ে। এর অন্ততঃপক্ষে আধা মাইলের মধ্যে কোন দালালকোঠার চিহ্ন ছিল না। সম্পূর্ণ অসম্ভবতার উপর ভিত্তি করে অনুমান করলাম যে, বাতাস, পানি, বুনোমুরগী বা স্তন্যপায়ী কোন জীবের দ্বারা দূরবর্তী কোন ঝোপ বা বাগান থেকে এর বীজ বা পরিবর্তনশীল টুকরো হঠাৎ করে বাহিত হয়ে এইখানে এসে পড়েছে, আর তারই ফলে এই গোলাপঝাড়ের সৃষ্টি। এমনি অসম্ভব একটা কল্পনা করার পরই আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করেছিলাম যে, কোন প্রাণবন্তক মানুষ একদিন সময়ে তার বাড়ীর কাছে এই গোলাপের বাগান করেছিলেন। গোলাপের চারা লাগাবার সময় আমি দেখিনি এবং এই সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্যে আমার কাছে কোন প্রকার ঐতিহাসিক সূত্রও উপস্থিত ছিল না; তবুও বাধ্য হয়ে এই অদম্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, শুধুমাত্র মানুষের সূত্র ধরে এবং মানুষেরই হস্তক্ষেপের ফলে এই গোলাপের ঝাড় বর্তমান স্থানে এবং ঐ অবস্থায় হয়তো গড়ে উঠেছে।

প্রথমে সম্ভবতঃ আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাদৃশ্যপূর্ণ হস্তক্ষেপের প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করতে পারি। কিন্তু অবিলম্বে আমরা এই বিষয়ের সম্মুখীন হই যে, এটা যথার্থই সেই ধরনের প্রমাণ, যার উপর আমাদের প্রাচীনতম প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, জ্যোতিঃশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের জন্যে আমরা ছায়াপথ, নক্ষত্র অথবা গ্রহগুলিকে তাদের কক্ষপথ থেকে সরিয়ে জোর করে আমাদের কাছে আনতে পারি না। ঘটনাস্থল থেকে আমরা মহাজাগতিক রশ্মিকেও দূর করতে পারি না। ডপলার প্রভাব (Doppler Effect) দূরত্বের উপর নির্ভরশীল শব্দ ও আলো-তরংগের সংখ্যার পরিবর্তনকে সম্ভবতঃ বিশাল দূরত্ব দ্বারা বৈপ্লবিকভাবে প্রভাবান্বিত করা যেতে পারে

এবং দূরবর্তী নীহারিকামণ্ডলের গতির বিরামহীন ভ্রমণ সম্ভবতঃ “মহাজাগতিক পর্দা”র ওপারের আলোকে অতিক্রম করে গিয়ে নীহারিকামণ্ডলকে ভবিষ্যতে দেখার পথ বন্ধ করতে পারে। কিন্তু আমরা এইসব কারণ পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারি না। দূর থেকে আমরা শুধু এগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারি, কিন্তু এদের নিয়ে আমরা কোন গবেষণামূলক পরীক্ষার কাজ চালাতে পারি না।

কাজেই আমরা যেমন পরমাণুর কণিকাকণিকার মধ্যে পর্বত জড়পিও ও শক্তি সম্পর্কিত নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করে থাকি, তেমনি ছায়াপথের মধ্যে সদৃশ যে প্রক্রিয়া বিজ্ঞানিত তারই ‘সজ্জনা’র উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। যদিও আমরা স্পষ্টভাবে নক্ষত্র ও নীহারিকামণ্ডল দেখতে পাই এবং তাদের আগাত-প্রতীয়মান ও বর্ধার গতিসমূহ দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারি; তথাপি এ পর্বত আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরমাণুর কোন উপাদান দেখতে পারিনি। এতদসত্ত্বেও, প্রথম আর্থবিক বোমা অদৃশ্য পরমাণুর কাঠামো ও ধর্ম সম্পর্কে আমাদের পুষ্টিগত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন ও সত্য বলে প্রমাণ করেছে। এই উভয় প্রেক্ষার বাস্তব পদার্থ বা সত্তা (ছায়াপথ ও পরমাণু)-কে বর্ধাই কাজের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং ‘অ-বিজ্ঞাতালঙ্কা’ (পরীক্ষামূলক) উপাত্ত থেকে পৃথক করে যুক্তিযুক্ত অনুমিতি দ্বারা প্রমাণ করতে সাহায্য করা যেতে পারে।

অবশ্য মহাজাগতিক পদার্থের (বহির্জগতের প্রপঞ্চের সামগ্রিকতার) নিজস্ব শক্তি ও বিশেষ গুণের বর্ধার সদৃশ শক্তি ও বিশেষ গুণ আমাদের থাকতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আমরা যাকে “ব্যক্তিত্ব” বলে অভিহিত করে থাকি, তেমনি কোন সামগ্রিকপূর্ণ নতুন মহাজাগতিক কাঠামোর মধ্যে অবশ্য থাকতে হবে। যে কোন বৈতবাদ সম্বন্ধীয় ধারণার যুক্তিসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এরূপ একটি ব্যবস্থাকে অবশ্যই অধিবিন্যাস (অ-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক)-এর সাহায্য দরকার হবে। কারণ, ব্যবহার সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ব স্বয়ং এর জন্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি পক্ষে তুলতে অক্ষম বলে মনে হয়।

আমি অনেক সময় আমার ছাত্রদের কাছে একটি “চিন্তার” বর্ধার রাসায়নিক কর্মমূল্য কি হতে পারে তাই জানতে চেয়েছি। জিজ্ঞেস করেছি, ঠিক কত সেকেন্ডিটার চিন্তার দৈর্ঘ্য, কত গ্রাম এর ওজন, কি এর রং, কেমন গঠন বা আকার, কি এর প্রাথমিক চাপ বা অভ্যন্তরীণ টান, এর ‘কর্মক্ষেত্র’ এবং এর অবস্থান বা দিক, আর চলার শক্তিই-বা কি? তারা একটি চিন্তাকে কোন প্রাকৃতিক সংজ্ঞায়, সমীকরণ বা কর্মমূল্যের হকে ফেলে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এ জন্যে বীকৃত অর্থ বা চিন্তাহীন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শব্দসমূহের চিত্রাচারিত অর্থহীন নতুন শব্দ সমূহের প্রবর্তন করতে হবে।

এই সমস্যাটি কেবলমাত্র “হেসে উড়িয়ে দেয়া” চলে না, কারণ মহাবিশ্ব যদি ফি-বোল্ডী (দুটি অংশ বা মৌলিক পদার্থে গঠিত) না হতো, তবে মানুষের “চিন্তা”

সম্পর্কিত সমস্যা কখনও তরুণ সহকারে বিবেচনা করা হতো না। আর যদি অইতবাদী (একক; একটি যাত্র মৌলিক পদার্থে পঠিত) তরুণের বিষয়বস্তুতে, চিন্তার মতো একটি সম্পূর্ণ বহুতাত্ত্বিক উপাদানের উপর জোর দেয়া হয়, তাহলে একমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শর্তাবলীতে আমাদেরকে এর 'সম্পূর্ণ' করণা দানের দাবী করতে হয়। এটা কখনও করা হয়নি।' ডেবোক্রিটাস, হবস্ বা আধুনিক চৈতন্যবাদীদের বহুতাত্ত্বিক বস্তুসিদ্ধতা অথবা শিবনিষ্ঠ, বার্কলে বা হেগেলের আদর্শবাদ সম্বন্ধীয় পূর্ব অনুমিতি কেবলমাত্র কাল্পনিক প্রকল্প। এতে পরীক্ষামূলক বৈধতার বড়টা সম্পর্ক তাতেও অভিজ্ঞতালব্ধ কোন ভিত্তি নেই। কারণ, প্রাকৃতিক বিশ্বের সব রকমের ঘটনা মনোযোগ আকর্ষণকারী নির্দিষ্ট অংশ ও মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে প্রাকৃতিক দর্শনে যদি মূলগত কারণ না ধোঁয়ায়, তাহলে প্রকৃতির সেই দর্শনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এবং চ্যালেঞ্জ করাই উচিত।

বিজ্ঞান পরীক্ষিত জ্ঞান, তবে এটি এখনও মানুষের খেরাল-বিজ্ঞান এবং ভ্রমসংকুলতার অধীন। এর নিজস্ব পরিধিতে এটি কেবল সীতিনিষ্ঠ। বর্ণনা ও ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে এটি সুদৃঢ়ভাবে পরিমাণাত্মক উপাত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্ভবনা নিয়ে এর আরও এবং সম্ভবনা নিয়েই এর সমাপ্তি—নিচরতা নিয়ে নয়। এর কলাকল হচ্ছে 'সভ্যতা ভুল' সাপেক্ষে, বিশেষ করে পরিমাপ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র উপযোজনে। এর কল সব সময়েই পরীক্ষামূলক এবং যাবে যাবেই নতুন উপাত্ত দ্বারা সংশোধিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক অনুমিতিতে সর্বশেষ কোন সিদ্ধান্ত নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন—কর্তমান সময় পর্যন্ত ঘটনা হচ্ছে এই এবং এমনি

মূলতঃ প্রাকৃতিক সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয় এমনি অনবীকার্য বস্তুসিদ্ধ সত্য ও নীতিসূত্র থেকে বিজ্ঞানের শুরু। অতএব সেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান দার্শনিক দ্বিভিন্ন ওপর তার সীতিনিষ্ঠ জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করে। দর্শন ও ধর্মের দ্বারা বিজ্ঞানেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সকল সত্যের চরম পঞ্জিকা এবং এই অভিজ্ঞতাই দৃঢ়ত সাপিনের কাজ করে। একজন বৈজ্ঞানিক কোন অনুমিতি করলে তা সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং সকল বৈজ্ঞানিকের জন্যেই তা বৈধ হবে। এতদসত্ত্বেও প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ সম্পর্কিত আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা অত্যন্ত নিরস্ত্রিত ও আপেক্ষিক।

কখনও এইসব অসামর্থ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক মূল্য ও গুণাবলীকে বিনষ্ট করে না, তবে এ কথা ঠিক যে, এইসব অসামর্থ্য এতেটাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত এবং কলাকলকে পরিণিষিত করে। কলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সেইসব সমস্যাবলী সরাসরি বিবেচনা করতে অকম বেতলি পরিমাণাত্মক বিশ্লষণ ও সংযোগ সাধনের পক্ষে সংবেদনশীল সত্তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই ধরনের সমস্যাতে জন্যে, "বরংকুঁত আদ্রাহ আছে কি?" এই প্রশ্ন দৃশ্যতঃ মনে জাগে। কিন্তু বহুতাত্ত্বিক

সত্তার সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক সত্তার নির্দিষ্ট বিরোধ থাকে, তাহলে বিষয়টি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যথার্থ বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয় এবং এর সঙ্গে আচরণে, সাদৃশ্যপূর্ণ অনুমিতিসহ যে কোন ন্যায়সংগত রীতি বা পদ্ধতি অবশ্য মেনে নিতে হয়।

এমন অনেক নিদর্শন আছে, যা প্রাকৃতিক ও বিজ্ঞানের কার্যধারায় অবলুপ্তাত্মিক সত্তার অস্তিত্ব বা কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে বা অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু তাই বলে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জগতের বাইরের বাস্তবতার সম্ভাবনাকেও তা প্রতিরোধ করে না। বিচারশক্তিসম্পন্ন মূল্যবোধে পরিপূর্ণ একটি দুনিয়ার সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা থেকে আমাদের নিজস্ব বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দ্বারা আমাদেরকে অবশ্য ঘটাকৃতি বিস্তারণ রেখায় (এমনকি তড়িৎ অপূর্ণ কক্ষপথে) “জল চক্রে”, “কার্বন ডাই-অক্সাইড চক্রে”, জীবজগতের পুনঃসৃষ্টির আচর্যজনক প্রক্রিয়ায়, অনন্তকাল পর্যন্ত পৃথিবীর সকল শ্রেণীর জন্তো সৌরশক্তি সঞ্চয় করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ আলোক-সংশ্লেষের কার্যক্রমের পঁচাত্তর অদ্বন্দ্ব বিজ্ঞ কার্যক্রম ও বুদ্ধিদীপ্ত নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্যকে মেনে নিতে হবে। যথার্থই কি করে আমরা এমন সব প্রক্রিয়া কোন বুদ্ধিদীপ্ত মাধ্যম ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক দ্বারা বা আকস্মিকভাবে আরম্ভের কথা ধারণা করতে পারি? একটি ক্রিয়াশীল মহাবিশ্বের চাহিদা পূরণের জন্যে যুগের পর যুগ ধরে সমরূপতা ও সার্বজনীনতা, আকস্মিকতা ও পূর্ণতা, উচ্চশাশ্বত ও অস্থায়িত্ব, অথবা নিত্যতা ও সমতা সম্পর্কিত বিকৃতি কি চলে আসতে পারে? কি করে তারা সমগ্র প্রকৃতিতে একজন বিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তার, যিনি সর্বকণ তাঁরই সৃষ্টির মধ্যদিয়ে কাজ করে চলেছেন, তাঁর বুদ্ধিমত্তার নির্ভর না করে এমনি বিচারবুদ্ধি মত কাজ করে যেতে পারে?

এখনও এই অদ্ভুত দ্রুতবেগে অগ্রগামী মহাবিশ্বের গোপন রহস্য থেকে এমন কোন ঘটনা জোর করে বের করা হয়নি, যা নাকি স্বত্বকৃত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত কার্যবলীকে যে কোন মাত্রায় অনুমোদন করতে পারে। অধিকন্তু, সাবধানী বৈজ্ঞানিকের মত আমরা যখন প্রাকৃতিক বিশ্বের উপাত্তগুলি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করি, তখন কেবলমাত্র সাদৃশ্যপূর্ণ অনুমিতি দ্বারা কেবলমাত্র সেই অদৃশ্য সত্তার, বিপুল কাজের সামান্য প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করি—যে সত্তা বা আল্লাহকে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ, আল্লাহ যথার্থই নিজেকে মানুষের মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন এবং যথার্থ প্রকাশ করেছেন।

তাই বিজ্ঞানে বহুতঃপক্ষে “আল্লাহকে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।”

অপরিহার্য সিদ্ধান্ত

জন ক্লীভল্যান্ড কথরাম ।। গাণিতিক ও রাসায়নিক : পি, এইচ, ডি, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক চাক, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, ডালুথ ট্রেট টিচার্স কলেজ; মিননেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় ডালুথ শাখার রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও পণ্ডিত বিভাগের চেয়ারম্যান; ক্যানসাস ট্রেট টিচার্স কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারার। অ্যামোনিয়ামিট্রাইট ও টেট্রাজল প্রভৃতে টাইটেন পরিশোধনে বিশেষজ্ঞ ।।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ লর্ড কেলভীন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন, “আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আত্মাহুতে বিস্তান স্থাপন করতে বাধ্য করবে।” আমাদের অবশ্য বীকার করতে হচ্ছে যে, আমিও তাঁর এই উক্তির সঙ্গ সম্পূর্ণ একমত ।

সামগ্রিকভাবে এ বিশ্ব সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বা কিছু জানা রয়েছে, কৌশলী আর পরিজ্ঞাত বিবেচনা দ্বারা তৎসম্পর্কে এ কথই প্রকাশ পায় যে, উক্ত বিবেচনার অবশ্য বধাতম্যের তিনটি প্রধান জগতকে অন্তর্ভুক্ত করছে হবে। এই তিনটি জগত হচ্ছে : জড় (পদার্থ), বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চার (মন) এবং আধ্যাত্মিক (আত্ম) জগত ।

এই বিবেচনার ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্রীয় জগতের অবদান অপরিহার্য বল হিসেবেই সীমাবদ্ধ, যেহেতু ইহা নিম্নোশিষ্টায়ে অনেকের মধ্যে একটি অবদান মাত্র ।

কারণ, রসায়নশাস্ত্র, প্রধানতঃ পদার্থের বিশ্লেষণ এবং মিশ্রণের পরিবর্তন ও সেই সঙ্গে মিশ্রণের এই পরিবর্তনের ফলে শক্তির যে পরিবর্তন ঘটে প্রকাশিতঃ তার সঙ্গে সঞ্চিত । সেই সঙ্গে পদার্থ ও শক্তির আন্তঃনিম্নরূপ রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত । নিঃসন্দেহে ইহা প্রধানতঃ জড় এবং দৃশ্যতঃ এক সম্পূর্ণ অ-আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান । তাহলে কি করে আশা করা যায় যে, ইহা মহাবিশ্বে সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি আত্মাহুতা আশার অস্তিত্ব সম্পর্কিত কোণ প্রকার প্রমাণ বোঝাতে পারবে এ বিশ্ব শুধুমাত্র দৈবের নিকট তার অস্তিত্বের জন্যে স্বীকৃতি, দৈবক্রমেই ইহা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এতে বা কিছু ঘটছে সবই উৎকর্ষশীলভাবেই ঘটে যাচ্ছে, আর শুধুমাত্র দৈবই এ জন্যে দায়ী,—এই চিন্তাধারাকে, এমননি এক বিজ্ঞান কি করে অসার হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারে বলে আশা করা যায়?

রসায়নশাস্ত্রসহ সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গত করেক শত বৎসর ধরে যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা প্রধানতঃ পদার্থ ও শক্তির গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির

প্রয়োগের কদেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই গবেষণার পরীক্ষামূলক অংশে, ভ্রান্তে করে পরীক্ষার যে কল পাওয়া বাবে তা সবই শুধুমাত্র দৈবক্রমে পাওয়া গেছে এমনি প্রতিপন্ন হয়, তার জন্যেই প্রতিটি পরিজ্ঞাত সজ্ঞাবানকে দূরে সরানোর সজ্ঞা সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই গবেষণার অতীতে, বারংবার এই-ই প্রতীয়মান হয়েছে এবং এখনও ইহাই দেখাচ্ছে যে, অনুভূতিহীন জড়পদার্থের আচরণ পর্বত আদৌ লক্ষ্যহীন নয়; অধিকন্তু, অপর পক্ষে তা নির্দিষ্ট ‘বাস্তবিক নিয়মকানুন’ “মেনে” চলে। প্রায়ই এই নিয়ম বা আইনের অস্তিত্বের কোন কারণ এবং প্রয়োগের পন্থা আবিষ্কারের অনেক আগেই আইনের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে যে সকল শর্তসাপেক্ষে এইসব আইনকে বৈধ বলে দেখানো হয়, একবার যদি সেই শর্তগুলি জানতে পারেন, তাহলে রাসায়নিক স্থির নিশ্চিত হতে পারে যে, উক্ত আইন ঐসব একই শর্তে, অবশ্যই একই কল লাভের জন্যে কাজ করে যাবে। পদার্থ ও শক্তির ধর্ম যদি লক্ষ্যহীনই হতো এবং বা কিছু ঘটবার সবই দৈবক্রমে ঘটতো, তাহলে তারা কখনও দৃষ্টিবিশ্বাস স্থাপন করতে পারতেন না। আর যখন চূড়ান্তভাবে জ্ঞান হয়, কেন আইন বিদ্যমান, কেন যেমনভাবে কাজ করে ঠিক তেমনভাবে কাজ করা যায়; তখন লক্ষ্যহীনতার সামান্য বেটুকু সজ্ঞাবান থাকে তাও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়।

রাসায়নের শ্রেষ্ঠ রাসায়নবিদ্যাবিদ, মেন্ডেলিভের আজ থেকে একশ’ বছর আগে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন বৃদ্ধির জন্যে যে স্বাভাবিক করেছেন (বা নাকি পরবর্তীকালে সামান্য সংশোধিত ও বিস্তারিত করা হয়েছে) তার জন্যে, একই প্রকার ধর্মের অধিকারী মৌলিক পদার্থের সংঘটনের পর্যাবৃত্তিকে যুক্তিসূতভাবে শুধুমাত্র আকস্মিক ব্যাপার বলে কি অভিহিত করা চলে? তাই যদি হতো, তাহলে তিনি যে সব মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং পরে যখন সেই সকল পদার্থ আবিষ্কৃত হলো এবং তিনি সেইসব মৌলিক পদার্থের যে সব ধর্মের কথা উল্লেখ করেছিলেন যখন তার সবই পাওয়া গেল, তখন বলাইকি এমনি কোন সজ্ঞাবান থাকলে তা অপসারিত হতো। তাঁর এই বিরাট সাধারণ শ্রেণীভুক্তিকে “দৈব পর্যায়” বলে অভিহিত করা হয় না। অধিকন্তু ইহাকে “পর্যায়ক্রম” বলে উল্লেখ করা হয়।

আবার যখন “ক” মৌলিক পদার্থের পরমাণু, সঙ্গে সঙ্গে “খ” মৌলিক পদার্থের পরমাণুর উপর প্রতিক্রিয়া করে, কিছু দৃশ্যতঃ “গু” মৌলিক পদার্থের পরমাণুর-ওপর আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া করে না, তখন কি সেদিনকার বৈজ্ঞানিকগণ একে শুধুমাত্র আকস্মিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন? নিশ্চয়ই নয়। অধিকন্তু তখন তাঁরা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, “ক” মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু এবং “খ” মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রকার শক্তি বা আসক্তি রয়েছে, বা নাকি “ক” মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু ও “খ” মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর মধ্যে

মারাত্মকভাবে কাজ করে। কিন্তু “ক” মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর সংগে “ন” মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর এই সম্পর্কই হয় অত্যন্ত নগণ্য মাত্রার সত্ত্বেই আর না হয় কোন সম্পর্কই নেই।

আবার, খাতব কারের পরমাণুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার হার কি হবে, তাঁরা তা জানতেন। ঊদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, তাঁরা জানতেন খাতব কারের পরমাণুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার হার পানির সংগে মিশিত হলে, আগবিক ওজন বৃদ্ধির সংগে সংগে বৃদ্ধি পায়। আবার হ্যাডোজেন পরিষ্কারের বিভিন্ন সদস্যের পরমাণুর ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটাই সত্য হয়ে থাকে। কেউ এইরূপ হস্তাক্ষর করণ জানতেন না, কিন্তু তাই বলে দৃশ্যতঃ কেউই এই আগাত-প্রতীকমান বিপরীত ধর্মকে আকস্মিক ব্যাপার বলেও উল্লেখ করেননি অথবা এমনি যুক্তি প্রদর্শন করেননি যে, সম্ভবতঃ আগামী মাসে বিভিন্ন প্রকারের সকল পরমাণু একই হারে প্রতিক্রিয়া করবে, অথবা একেবারেই করবে না। অথবা বিপরীতভাবে প্রতিক্রিয়া করবে, বা কোন প্রকারের সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীনভাবে প্রতিক্রিয়া করবে। পরমাণুর গঠন-কৌশল আবিষ্কারের কলে ইহাই প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসায়নিক ধর্মের উদ্ভিষিত সকল নৃতাতে সঠিক আইন বিদ্যমান; লক্ষ্যহীনতা বা দৈবের কোন কিছু তাতে নেই।

জানা ১০২ টি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ ও তাদের আন্তর্ভুক্তক অসাদৃশ্য এবং সাদৃশ্য বিবেচনা করা যাক। এসের কতক রঙিন, অবশিষ্ট বর্ণহীন; কতক ঘাস জাতীয়, যে গ্যাসকে তরল বা কঠিন অবস্থায় পরিণত করা অসম্ভব রকম কষ্টসাধ্য, আবার কতক তরল অবস্থায় বিদ্যমান। কতক আবার কঠিন অবস্থায় থাকে, থাকে তরল বা বাষ্পে পরিণত করা খুবই কঠিন; কিছু খুবই নরম, অন্যগুলি অস্বাভাবিক রকম কঠিন। কতক খুবই চর্মকোর পরিবাহী; বাকীগুলি খুব সামান্য পরিবাহী; কিছু রয়েছে শৈথিল্য, অন্যগুলি তা নর; কতক অন্ন সৃষ্টি করে আর বাকী কার সৃষ্টি করে, কতক অত্যন্ত দীর্ঘায়ু অধিকারী, অন্যগুলি এক সেকেন্ডের সামান্য এক ভগ্নাংশ সময় টিকে থাকে। এতদসত্ত্বেও, সকল রাসায়নিক পদার্থই ইতিপূর্বে উদ্ভিষিত পর্যায়ক্রম অনুযায়ী কাজ করে থাকে।

এইসব আগাত-প্রতীকমান জটিলতা সত্ত্বেও, ১০২টি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির প্রতিটি পরমাণু একই রকম তিন প্রকারের বৈদ্যুতিক কণিকা দ্বারা গঠিত প্রোটোন (পজিটিভ), ইলেকট্রোন (নেগেটিভ) ও নিউট্রোন (প্রত্যেকটি দৃশ্যতঃ একটি প্রোটোন ও একটি ইলেকট্রোনের এক রকমের সংযোগ), প্রস্তুত এক রকমের একটি পরমাণুতে সব কয়টি প্রোটোন ও নিউট্রোন কেন্দ্রীয় “নিউক্লিয়াসের” মধ্যে অবস্থিত এবং সব কয়টি ইলেকট্রোন সংখ্যায় প্রোটোনের সমান এবং ইহারা নিজ নিজ অক্ষের চারদিকে বিভিন্ন “কক্ষপথে” নিউক্লিয়াস থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক দূরে দূরে থেকে প্রদক্ষিণ

করে। ইলেকট্রনের এই পরিক্রমণ ছোট-খাটো সৌরজগতের মত, একেকটি পরমাণুর অধিকৃত অধিকাংশ অংশ শুধুমাত্র “ফাঁকা শূন্যতায়” ভরতি। এবং যদিও এসব অবিশ্বাস্য রকম সহজতর মনে হয় তথাপি এক প্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংগে আরেক প্রকার মৌলিক পদার্থের পরমাণুর পার্থক্য—নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটোনের (এবং নিউট্রোনের) সংখ্যায় যে পার্থক্য নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রোনের সংখ্যা ও তাদের বিন্যাসের যে পার্থক্য বিদ্যমান, কেবলমাত্র তারই উপর নির্ভরশীল। যাতে মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থসহ সব রকমের লক্ষ লক্ষ দ্রব্য “সহজতর হয়ে” তিন প্রকারের বৈদ্যুতিক কণিকায় পরিণত হয়, যা আবার একটি মাত্র প্রাথমিক সত্তা, বিদ্যুতের বিভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ হয়, যা সবশেষে সহজতর পৃথক বা বিশ্লেষণ করা যায় না এমনি মৌলিক পদার্থের কেবলমাত্র একটি রূপ বা গুণ বা অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়—তাই হচ্ছে শক্তি।

এখন কথা হচ্ছে, অণু ও পরমাণু গড় হিসেবে জড়পদার্থ; অণু ও পরমাণু স্বয়ং; এদের সব উপাদান- প্রোটোন, নিউট্রোন; তড়িৎ শক্তি; শক্তি নিজে—সবই দেখা যায়, উপযুক্ত আইন মেনে চলে, আদৌ দৈবের নির্দেশ মানে না। এই উক্তি এতই খাঁটি যে, ১০২টি মৌলিক পদার্থের ১৭টি পরিচিতি ইহার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে জড়—এ মহাবিশ্ব, স্ଥିতি ও ক্রমের জগত, বিশৃংখলার নয়; আইনের জগত; দৈব বা লক্ষ্যহীনতার জগত নয়।

কোন প্রজ্ঞাবান ও বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ধীশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির কি এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব যে, অনুভূতিহীন, প্রাণহীন জড়পদার্থ আপনা-আপনি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে এবং সব ক্রম অতঃপর দৈবক্রমে নিজেরাই নিজেদের উপর আরোপ করেছে, আর তারপর, দৈবক্রমেই তা তাদের উপর আরোপিত আছে? নিশ্চয়ই এর জবাব হচ্ছে “না”। শক্তি যখন “নতুন” পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তখন এই রূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত ‘আইনানুগত ভাবে’ অগ্রসর হয় এবং রূপান্তরের ফলে নতুন যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তা ইতিপূর্বে বিদ্যমান পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব আইনেরই অধীন হয়।

রসায়নশাস্ত্র এই তথ্য প্রকাশ করে যে, জড়পদার্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে, কতক খুব ধীরে ধীরে, আবার কিছু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বলা চলে, জড়পদার্থের অস্তিত্ব শাশ্বত নয়। অতএব, নিশ্চয়ই জড়পদার্থের একটা আরম্ভও রয়েছে। রসায়নশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা এই ইংগিত করে যে, এই সূচনা কখনও ধীরে ধীরে এবং ক্রমাবয়ে অগ্রসর হয়নি; অপরপক্ষে হঠাৎ এর সূচনা হয়েছিল। ঠিক কখন এইসব জড়পদার্থের সূচনা হয়েছিল, উক্ত সাক্ষ্য আমাদেরকে আনুমানিক সেই সময়ও বলে দিতে পারে। অতএব বলা যায়, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই জড়জগত সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন থেকেই ‘আইন’ মেনে চলছে, দৈবের কোন নির্দেশ মেনে চলছে না।

এখন কথা হচ্ছে, এই জড়জগত যখন নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারেনি, পারেনি ডাকে পরিচালনাকারী আইনাবলী সৃষ্টি করতে, তখন সৃষ্টির এই কাজ নিচেরই অ-জড় কোন প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত প্রতিনিধি এই কাজ করতে গিয়ে অতীব বিশ্বয়কণ্ড অলৌকিক যে ব্যাপার সম্পাদন করেছেন, তাতে এই-ই প্রতিপন্ন হয় যে, এই প্রতিনিধি নিচের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী—যে মনীষাকে ‘মনের’ প্রতীক বলা যায়। জড়জগতে মনকে কাজে লাগাতে হয়; যেমন, চিকিৎসাকার্য পরিচালনে অধীমনস্তম্ভের ক্ষেত্রে ‘ইচ্ছা’কে কাজে লাগানোর দরকার হয় এবং একজন ব্যক্তি বা সম্ভার পক্ষে ইচ্ছাকে কাজে লাগানো সম্ভব। অতএব, আমাদের যুক্তিবৃত্ত এবং অপরিহার্য সিদ্ধান্ত ওধু এই নয় যে, সৃষ্টি হয়েছে; বরং সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই সৃষ্টি এক সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা ও জ্ঞানের (সর্বদর্শী) অধিকারী এক সম্ভার পরিকল্পনা ও ইচ্ছা মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি একে সৃষ্টি করার ও সেই সৃষ্টিকে কয়েক রাখার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান (সর্বশক্তিমান)। তিনি সকল সময় এবং সর্বত্র মহাবিশ্ব জুড়ে বিদ্যমান (সর্বত্র বিদ্যমান)। অন্য কথায় বলতে গেলে, এই প্রবন্ধের শুরুতে যে তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, ‘মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা হিসেবে,’ আমরা নিঃসন্দেহচিত্তে সেই “সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্ভার আল্লাহ্‌’র অস্তিত্বকেই” মেনে নিছি।

লর্ড কেলভীনের যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতখানি অগ্রগতি হয়েছে যে, তৎসমুদয় অগ্রগতিই তাকে পূর্বাপেক্ষা আরো দৃঢ়তার সহণে বোষণা করতে সক্ষম করেছে, “আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করবে।”

উত্তর দেওয়া হয়নি এমনি সব প্রশ্নের জবাব

| ডোনাল্ড হেনরী পোটার।। গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানবিদ : বি, এস-সি, মেরিয়ন কলেজ, পি-এইচ, ডি, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক টিচিং ফেলো, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়। মেরিয়ন কলেজের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। স্পর্শ রূপান্তর, দুই-বিমাত্র সীমিত পরিবৃতি ও পরম অনবচ্ছেদ বিশেষজ্ঞ।।

যেমন করে জ্যামিতির পাইথাগোরাসের সম্পাদ্য প্রমাণ করা হয়ে থাকে, যদি কেউ ঠিক একইভাবে আত্মাহুত অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে আত্মাহুতে বিশ্বাস স্থাপন অবশ্য কর্তব্য হতো। আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের কোন প্রমাণের অস্তিত্ব নেই। অপরপক্ষে, অপ্রমাণিত আইন বা নীতির উপর ভিত্তি করেই মূলতঃ বিজ্ঞানের সৃষ্টি। এইসব আইন সম্ভবতঃ হরেক রকমের পরিহিতিতে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু যেহেতু এগুলি প্রমাণ করা হয়নি কাজেই কেউ তাদের ব্যবহার করতে পারবে না, এমন কোন নিষেধ নেই। যখন প্রাকৃতিক জগতে প্রমাণ মেলে না তখন অতিপ্রাকৃত জগতে প্রমাণের আশা করা আদৌ বুদ্ধিসংগত নয়।

পদার্থবিদ্যার সকল প্রশ্নের মধ্যে সবচাইতে ভাল করে বেসব প্রশ্নের জবাব দেয়া যেতে পারে তা আরও হচ্ছে, “কি করে” এই কথা দিয়ে। পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির বর্তমান পর্যায়ে, “কেন” দিয়ে আরও এমন অনেক প্রশ্নরই জবাব দেয়া হয় না। “কি করে” এই দিয়ে আরও প্রশ্নগুলির জবাব সম্ভবতঃ সম্ভার সন্নিবর্ষ। কি করে দু’টি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, নিউটনের সার্বিক মহাকর্ষ আইনে তার সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন দু’টি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই প্রশ্নের কোন জবাব তাতে উপস্থিত নেই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদেরকে পৃথিবীর উপরে ধরে রেখেছে এবং সূর্যের চারদিকে নিজ কক্ষপথে হির দূরত্বে ধরে রেখেছে আমাদের এই পৃথিবীকে। কিন্তু এর জন্যেই তরু হয়েছে অনুমিতি। বিশ্বের একটি শিঙরীর জন্যে মহাকর্ষ আইনের বিপরীততার প্রয়োজন হয় এবং যদি দু’টি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিকর্ষণকারী শক্তি হওয়ার প্রয়োজন হয়।

বৈদ্যুতিক উপায়ে আহিত (Charged) বস্তুর মধ্যে, শক্তি পরিচালনকারী একটি স্বীকৃত আইন বিদ্যমান। এইরূপ আধান (charged)- কে বলা হয়, অপর (negative) ও পরা (positive) আধান। উক্ত আইনে বলা হয় যে, এই আধান যদি বিপরীত চিহ্নের হয়, তাহলে আকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হবে, আর যদি একই চিহ্নের হয় তাহলে বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হবে। আর শক্তি সকল ক্ষেত্রেই দু’টি আধানের গুণফলের সরাসরি আনুপাতিক রাশি ও দু’টি বস্তুর দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত আনুপাতিক রাশি হয়ে থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটোন নাম অভিহিত পরা-আধান-সম্পন্ন কণিকা থাকে। কিন্তু আমরা যখন একটি পরমাণুর অতিশয় ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রবিষ্ট হই তখন এই আইন

ব্যর্থতায় পর্ববসিত হয়, আর তখন আমাদের শক্তির একটি নতুন আইন অপরিহার্যরূপে ধরে নিতে হয়। এই আইনকে বলা হয়, “নিউক্লিয়াস শক্তি”। কাজেই প্রকৃতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষ যখন এর খুব বড় অথবা খুব ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে, তখন তার প্রচেষ্টা নগণ্য প্রতিপন্ন হয়, কুলোয় না।

মনে হয়, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক প্রশ্ন ও তার সূত্র ব্যাখ্যা করতে যেয়ে যেন বাধ্য হয়েই ঘটনাস্থলে আল্পাহকে টেনে না এনে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ গাণিতিক ও দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, “খোদাকে কে সৃষ্টি করেছে?” এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি বলে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খোদা বলে কেউ নেই। রাসেলের চিন্তাধারা চিন্তারাজ্যের গভীরতম প্রদেশে আরো বহুদূর প্রসারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু যখন প্রায় প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক খিণ্ডনী শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি, এমন প্রশ্নে পৌঁছায়, তখন এই প্রশ্নের জবাব চাওয়া কি যুক্তিসংগত হয়েছে? আমার নিজের কথা হচ্ছে, আমি খোদাকে ঘটনাস্থলে স্থাপন করে থাকি। হেতু ও যুক্তিবিদ্যা ইহাই দাবী করে।

যেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি এমনি প্রশ্নের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, মহাবিশ্বে দুটি খিণ্ডনী বর্তমানে সর্বাধিক অভিনবিত হচ্ছে। কিন্তু এই দুটি খিণ্ডনীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আগে আসুন আমরা কিছু প্রাথমিক বিষয় দেখে বেই।

সৃষ্টি ভঙ্গে, আমাদের মহাবিশ্বের সাধারণ আকৃতি, মহাশূন্যে ইহা কতদূর পরিব্যাপ্ত এবং কালের হিসেবে কতদিন ইহার স্থিতিকাল, তারই গবেষণা বিদ্যমান। পাণোমার পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে ২০০ ইঞ্চি বিশাল দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ মহাশূন্যে এক মহাপন্থ আলো বহরের বেশী দেখতে পায় এবং প্রায় এক মহাপন্থ দ্ব্যাপথ তার নজরে পড়ে, দূরত্বের মাত্রা হিসেবে আলো বছর বলতে প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রমকারী আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বুঝায়। আজকের দিনে আকাশের বসি আলোকচিত্র নেওয়া হয়, তাহলে আলো চলে যাওয়ার পর নক্ষত্রগুলিকে যেমন দেখিয়েছিল, ঠিক হবিতে তেমন দেখাবে। সম্ভবতঃ এই আলো বহু লক্ষ বছর আগে চলে গেছে।

একটি ধারণা, যা নাকি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিন পলা কাঁচের মধ্যদিয়ে মানুষ যখন দেখে তখন সে রঙধনুর রংগুলি দেখতে পায় এবং যদি একটি ধারাবাহিক বর্ণচ্ছটা সৃষ্টি করার জন্যে বর্ণগুলি একত্রে মিলিত হয়, তখন তাকে ধারাবাহিক বর্ণালী বলা হয়। মৌলিক পদার্থগুলিকে তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সব বর্ণের দ্বারা সনাক্ত করা যেতে পারে এই সত্যের উপর ভিত্তি করে বর্ণালীবিশ্বের বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত আলোর প্রতিসরণ দ্বারা উক্ত মৌলিক পদার্থের বর্ণালী সৃষ্টি হয় এবং এই প্রতিসরণ দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণ সৃষ্টি করে যার বস্তু ও পরিমাত্র মৌলিক পদার্থের অংশুলাংকে বই আর কিছু নয়। এমনিভাবে, এই পৃথিবীতে আর সব আবিষ্কারের আগে সূর্যে একটি পদার্থ

আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার নামকরণ করা হয়, “হেলিয়াম”। গ্রীক ভাষায় ‘হেলিয়াম’ শব্দের অর্থ হচ্ছে সূর্য, তা থেকেই এই নাম। বর্ণালীর যে পাশে লাল রং সেই দিকে বর্ণালীর স্থান পরিবর্তন বা সরে যাওয়াকে লাল চালান (red-shift) বলা হয় এবং এই চালান ইহাই নির্দেশ করে যে, আলোর উৎস পর্যবেক্ষণকারীর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। দূরবর্তী ছায়াপথগুলি পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই খিওরী গড়ে উঠেছে যে, মহাবিশ্ব ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আলোকপথগুলি ক্রমান্বয়ে বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে।

এখন পূর্বোক্তিস্থিত দু’টি সর্বাধিক অভিনবিত খিওরীতে আসা যাক। একটি হচ্ছে, আলফা ও গামার বিকাশের মধ্যদিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টির খিওরী এবং অপরটি হচ্ছে হেরাশীর নিয়ন্ত অবস্থা সম্পর্কিত খিওরী।

প্রথম খিওরী মোতাবেক, কল্পনাভীত ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট অবস্থা থেকে বিকোরণের ফলে এই মহাবিশ্বের প্রকাশ ঘটেছে। এই খিওরী আরও প্রস্তাবনা করে যে, অত্যন্ত সম্প্রসারিত এবং মারাত্মক রকম উত্তাপমূলক গ্যাস থেকে মহাবিশ্ব তথা নক্ষত্র, ছায়াপথ, গ্রহাদি ও বিশ্বের বিশাল পটভূমির যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। ছায়াপথের এই যে বাইরের দিকে বর্তমানের গতি, তা উক্ত যাবতীয় বিকোরণের ফল।

এই আলফা ও গামার খিওরী স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করে যে, যখন আমাদের এই মহাবিশ্বের বয়স মাত্র পাঁচ সেকেন্ড হয়েছিল, তখন তার তাপমাত্রা ছিল এক মহাপন্থ ভিত্তী। এর আগে যাবতীয় জড়পদার্থ শুধুমাত্র প্রোটোন, নিউট্রন ও ইলেকট্রোন দ্বারা গঠিত ছিল এবং মারাত্মকরকম তাপমাত্রা আর চাপের জন্য জড়পদার্থ বিযুক্ত অবস্থায় ছিল। বিকোরণের পর অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা হওয়ার পর তিরিশ মিনিটের মধ্যে সকল রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই খিওরী অনুযায়ী হাঙ্কা মৌলিক পদার্থ অপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থগুলি সৃষ্টি হতে অনেক বেশী ধারাবাহিক পর্যায় অভিক্রম করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আজকের এই ছায়াপথগুলি সৃষ্টি হয়, হয়তো বিকোরণের পর বহু লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হলে অথবা অনুরূপ বহু বছর পরে এই ছায়াপথের সৃষ্টি হয়। ছায়াপথগুলি সৃষ্টির ব্যাপারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল কল্যাণপাদী কারণ।

কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের সূচনার ঠিক আগের মুহূর্তে কি অবস্থা বিদ্যমান ছিল? প্রস্তাব করা হয়েছে, আমরা যেন সৃষ্টির গোটা প্রক্রিয়াকে এমনভাবে বিবেচনা করি যে, আমাদের মহাবিশ্ব পূর্ববর্তী একটি মহাবিশ্বের মারাত্মক রকম সংকোচনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। পূর্ববর্তী মহাবিশ্ব অসীম অনুভবন (সুস্বভা বা হিদ্মনয়তা : ইহা ঘনত্বের বিপরীত)-এর অবস্থা থেকে অনন্তকালের জন্য যখন ধ্বংস হতে চলেছিল, তখনই মারাত্মক সংকোচনের সৃষ্টি হয়।

আমি যদি এই খিওরী গ্রহণ করি যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব খুবই মারাত্মক রকম সম্প্রসারিত অবস্থা থেকে বিকাশ লাভ করেছে এবং সূচনার ইহা কল্পনাভীত উত্তম ছিল, তাহলে যেসব কণিকা ও যে উৎস-শক্তি থেকে এই চাপ ও উত্তাপের সৃষ্টি, সেইসব

কণিকা ও শক্তির উৎসের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে জানতে হয়। তাহলে, আল্লাহ ঘটনাবলি এসে যাচ্ছেন।

বাতি পোশ হেয়ালী খিওরীকে নিয়ন্ত অবস্থার খিওরী বা ধারাবাহিক সৃষ্টির খিওরী বলা হয়। উক্ত খিওরী এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, মহাপ্রাণ ও সময় উভয়ের মধ্যেই মহাবিশ্ব সমসাময়িক কিছু হৈতিক নয়; এই খিওরীর উদ্ভাবকগণ স্বীকার করেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং ছায়াপথগুলি ক্রমশঃ বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে। ছায়াপথগুলির সরে যাওয়ার ক্ষতিপূরণের পরেও মহাবিশ্বের সেই পূর্বের আকৃতি ধরে রাখার জন্য তারা বতঃসিদ্ধভাবেই ধরে নিয়েছে যে, জড়পদার্থ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হচ্ছে এবং যেসব ছায়াপথ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট আমাদের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে বাইরে চলে যাচ্ছে, তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য নতুন নতুন ছায়াপথ সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা আলোর সাহায্যে দেখে থাকি এবং যদি কোন বস্তু আলোর গতির চাইতে অধিক গতিবেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলে আমাদের দিকে আলো আসতে পারবে না এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র বত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, উক্ত বস্তু দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। হিসেব করা হয়েছে, দুই মহাপথ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়াপথের এমনি গতিবেগ থাকতে পারে এবং তাই তা চিরদিনের জন্য আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। পাশোয়ার পর্বতের উপরে যে বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে, বর্তমানে তার সাহায্যে বতটা দূরে দেখা যেতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে এই দূরত্ব তার দ্বিগুণ। সূর্যের বতটা বয়স হয়েছে বলে হিসেব করা হয়েছে যদি এ মহাবিশ্ব উক্ত হিসেবের এক-পঞ্চমাংশ সময় ধরে উল্লিখিত গণনাকৃত হারে সম্প্রসারিত হতো, তাহলে এতদিন আমাদের নজর সম্পূর্ণ শূন্যতায় পরিণত হতো।

সারাক্ষণই যেহেতু ছায়াপথের সৃষ্টির জন্য বিশ্বের জড়পদার্থ সংকুচিত হতো কাজেই ধারাবাহিক সৃষ্টির খিওরী অনুযায়ী পটভূমিকার জড়পদার্থ নতুন কিছু সৃষ্টি করতো। এমনিভাবে মহাবিশ্বের সাধারণ আকৃতির কোন পরিবর্তন হতো না। নয়া সৃষ্ট জড়পদার্থ বাইরের দিকে চাপের সৃষ্টি করতো তার ফলে মহাবিশ্ব ধীরে সম্প্রসারিত হতো। সৃষ্টি সম্পর্কে হেয়ালী এই আভাস দিয়েছেন যে, জড়পদার্থ কোন স্থান থেকে আসে না। ইহা শুধুমাত্র আবির্ভূত হয়।

আমর দিক থেকে বলতে হয়, আমাদের যদি এই ধারাবাহিক সৃষ্টি সম্পর্কিত খিওরী সমর্থন করতে হয়, তাহলে আমি অবশ্য সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করবো। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ ঘটনাবলি সমুপস্থিত।

প্রকৃতির প্রস্তুত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেকোন কিছুই বিবেচনা করা হোক না কেন, অথবা প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে বেকোন প্রশ্ন পর্যালোচনা করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে সক্রিয় প্রধান ভূমিকায় আল্লাহকে বসিয়ে আমি চরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ছবিতে (ক্ষেত্রে) আল্লাহ হচ্ছেন মূল চরিত্র। যেসব প্রশ্নের আজো জবাব দেওয়া হয়নি, একমাত্র তিনিই তার জবাব।

পক্ষপাতিত্ব বাদ দিয়ে আসুন অন্যের দিকে তাকাই

[এডওয়ার্ড লুথার কেনেল ।। প্রাণিতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদ : এম, এস-সি, পি-এইচ, ডি; ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সানফ্রানসিস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমী অব সায়েন্সের টাফ-কীটপতঙ্গের এসোসিয়েট কিউরেটর, জীববিদ্যার ওয়াশম্যান জার্নালসহ কারিগরী প্রকাশনার সম্পাদক। কীটপতঙ্গের ভূগতত্ব, রোগতত্ত্ব, সালামাভার ক্রিস্টীডির ডিপটারোলজী বিশেষজ্ঞ ।।]

সাম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আত্মাহুত আছেন বলে সনাতন দর্শনে যেসব প্রমাণ রয়েছে, তাকে সমর্থন করে নতুন প্রমাণ সৃষ্টি করেছে। এই নতুন প্রমাণের যে কোন প্রয়োজন আছে তা নয়। কারণ, যার মন পক্ষপাতের হুঁলিতে ঢাকা নয়, তাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে সনাতনী প্রমাণগুলি প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী। তবে আত্মাহুতের অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে থেকেই বিশ্বাসীদের একজন হিসেবে আমি দুই কারণে পূর্ব প্রমাণের সংগে এই অতিরিক্ত প্রমাণসমূহকে বাগত জানাই : (১) এগুলি আমাদেরকে আত্মাহুতের কতিপয় সিকাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে থাকে; (২) আমি বিশ্বাস করি, এইসব প্রমাণ বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সত্যাপ্রদী অনেক নাস্তিকের চোখ খুলে দেয়, যাতে তারা দেখতে পারেন— যথার্থই আত্মাহুত একজন আছেন।

এক বিরাট ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন বিগত কয়েক বছরে আমাদের সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করে কেলছে, ধর্মীয় চিন্তাধারার আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই আলোড়নের ডেউ ওধু আমাদের কাজগুলিকে অতিক্রম করেনি, অধিকন্তু আমাদের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জীবনের সংযোগের সৃষ্টি করেছে। ইহা অত্যন্ত নিশ্চিত ব্যাপার যে, সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা ও নির্দিষ্টকারী আত্মাহুত দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ব্যাপারে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

অবশ্য যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা কখনও আত্মাহুত তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে করা হয়নি। কারণ, বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতির তথ্যাবলী সম্পর্কে বিশদভাবে পরীক্ষা করা, এর উৎস সম্পর্কিত আরও মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা নেই। বিজ্ঞান কেবল প্রাকৃতিক কলকজা নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু এই কলকজা কোথা থেকে এল, এই মৌলিক প্রশ্নটি বিজ্ঞান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। তবে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে, তা তিনি বৈজ্ঞানিকই হোননা কেন; একটি করে দার্শনিক মন লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এ অত্যন্ত

দুঃখের বিষয়, একজন ভাল বৈজ্ঞানিক সব সময় ভাল দার্শনিক হন না। অনেকে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে খুব অস্পষ্টভাবে চিন্তা করেন। আবার অনেকে আছেন, যারা 'এই মহাবিশ্ব নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়েছে' এমনি একটা দ্রুত ধারণা পোষণ করে আসছেন। আবার অন্যান্যরা বলেন, আবহমানকাল থেকে এই মহাবিশ্ব বিরাজমান। এই কথাটি তাদের কাছে মনে করা যেমন সোজা, তেমনি সর্বকালে বিরাজমান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাও তাদের পক্ষে সহজ।

তাপ গতিবিদ্যা (heat)- এর দ্বিতীয় আইন বা Law of entropy নামে অভিহিত আইন অধিকাংশ সময় প্রমাণ করে যে, শেষ গোষ্ঠী ভুল করেছেন। বিজ্ঞান সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে কখনই বিরাজমান হতে পারে না। Law of entropy বলে যে, উত্তপ্ত বস্তু থেকে ততোধিক শীতল বস্তুতে সব সময় তাপ প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাপ প্রবাহের এই নিয়মকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপরীতগামী করার জন্যে কখনও পাল্টানো যায় না। মাপা শক্তির তুলনায় অমাপ্য শক্তির অনুপাত হচ্ছে entropy; যাতে করে বলা যায় যে, মহাবিশ্বের entropy সব সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, মহাবিশ্ব এমন এক সময়ের দিকে যাচ্ছে যখন সামগ্রিকভাবে তাপমাত্রা সমান হবে এবং তখন প্রয়োজনীয় আর কোন শক্তিই থাকবে না। পরিণামে আর কোন রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া থাকবে না এবং সকল প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু বেহেতু এখনও পৃথিবীতে প্রাণী বিরাজমান এবং রাসায়নিক ও ভৌত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে; কাজেই এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব অনাদিকাল থেকে অবস্থান করছে না। অন্যথায় এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাজে লাগানোর উপযোগী শক্তি বহুদিন আগেই শেষ হয়ে যেতো আর সেই সংগে প্রকৃতি সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে যেতো। কাজেই, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞান এই কথাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আমাদের এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল। আর এই কথা প্রমাণ করতে যেয়ে বিজ্ঞান সেই সংগে আল্লাহর সন্তকে প্রমাণ করে, যারই সূচনা রয়েছে সেই আপনা থেকে আরম্ভ হয়নি, অধিকন্তু এর জন্যে এক পরম ও চরম প্রত্যাবর্তক একজন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রয়েছেন।

অনাদিকাল থেকে আমাদের মহাবিশ্ব বিদ্যমান ছিল না, এই কথা প্রমাণ করার জন্যে আমাদের কাছে শুধু যে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ রয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান এমন কথাও প্রমাণ করেছে যে, একটি মাত্র প্রচণ্ড সৃষ্টিশীল বিস্ফোরণের ফলে এই মহাবিশ্ব আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই বিস্ফোরণ ঘটে প্রায় পাঁচ মহাপঞ্চ বছর আগে। বাস্তবপক্ষে, মহাবিশ্ব তার সৃষ্টির মূলকেন্দ্র থেকে এখনও সম্প্রসারিত হচ্ছে। আজকের দিনে যারা বিজ্ঞানের প্রমাণে বিশ্বাস স্থাপন করবেন, তাদের অবশ্য সৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, সৃষ্টি প্রকৃতির সকল আইনকে অতিক্রম করে যাবে। কারণ, এইসব আইন নিজেরাই সৃষ্টির ফল। অবশ্য বাকি আল্লাহর সঙ্গে শামিল করা যেতে পারে এমন

একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোমলকমেই এমন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তিনি একেবারে প্রকৃতির সব সাজ-সরঞ্জাম এবং এই সবকে পরিচালনাকারী আইনাবলী প্রতিষ্ঠা করার পর এই যান্ত্রিকতাকে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যবহার করেন— যে সৃষ্টি অবঘাতন (সৃষ্টি, উৎকর্ষতা)—এর মধ্যদিয়ে অব্যাহত রয়েছে।

আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করি যে, অবঘাতন কথাটি অনেক মহলেই নিষিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে শুধু কথাটি উচ্চারিত হলেই অনেকের জ্ব কঁচকে যায়। অজুত মনে হলেও আমি এইসব সং-বন্ধুদের শুধু যে বুঝতে পারি তাই নয়, অধিকন্তু আমি তাদের সংগে একমত। অবঘাতন বলতে তাঁরা জড়বাদ সম্বন্ধীয় (বল-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বা যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত) অবঘাতনকে বুঝে থাকেন। এই অবঘাতন এবং সৃষ্টি সম্পর্কিত অবঘাতনের মধ্যে সুশৃঙ্খল পার্থক্য গড়ে তুলতে হবে।

যে সত্য নিয়ে এবং পক্ষপাতিত্ববাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নিজস্ব গবেষণার ফলাফলের মূল্য নিরূপণ করে থাকেন, যদি তেমন মন নিয়ে সকল বিজ্ঞানী এখানে বর্ণিত বিজ্ঞানের সকল সাক্ষ্য বা প্রমাণ বিবেচনা করতেন, যদি তারা শুধুমাত্র ভাবাবেগের উপর নিজেদের বুদ্ধিমত্তার স্থান দিতেন, তাহলে আল্লাহ যে আছেন এ কথাটি মেনে নিতে তারা বাধ্য হতেন। এইসব তথ্যের জন্য উপযুক্ত এই একটি মাত্র পরিসমাপ্তিই হতে পারে। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে, আমরা যাকে আল্লাহ বলি সেই 'মূল কারণ'-এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি নিঃসন্দেহে তাঁর মন এগিয়ে যাবে।

আল্লাহ আমাদের যুগের প্রতি অত্যন্ত উদ্বার এবং তাই আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রকৃতি সম্পর্কে আবিষ্কার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। এমন সকল মানুষের, তা তিনি বৈজ্ঞানিক হোন বা অবৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দারিদ্র্য হচ্ছে তাদের বিশ্বাসকে সুস্বাক্ষরিত প্রকৃতির ব্যাপারে বিজ্ঞানের এই অভিজ্ঞানকে বিবেচনার মধ্যে নেয়া। সংস্কারমুক্ত একজন বৈজ্ঞানিক যেমন আবশ্যকীয়ভাবে এই প্রমাণের প্রতি মনোযোগ দেবেন এবং স্বীকার করবেন যে, আল্লাহ বলে নিশ্চয়ই কেউ আছেন; তেমনি অবৈজ্ঞানিককেও অবশ্যই এই প্রমাণের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টি সম্পর্কিত অবঘাতন আল্লাহরই সৃষ্টির পদ্ধতি। তিনি একবারে এই মহাবিশ্বের সকল উপাদান সৃষ্টি ও আইনাবলী প্রতিষ্ঠার পর এই সৃষ্টিপদ্ধতি কয়েক রেখেছেন। আমাদের জন্যে প্রকৃতির প্রতিটি পৃষ্ঠাময় যেসব প্রমাণ সমুপস্থিত করা হয়েছে, সৃষ্টি সম্পর্কিত অবঘাতনই তাঁর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার আকারে বাইবেলের সব ভাষ্য বা টীকা সৃষ্টি সম্পর্কিত অবঘাতনের প্রমাণ দান করে। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে— অংগ-সংস্থান বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, ভূগর্ভতত্ত্ব, জীব-রসায়ন, জাতি-বিদ্যা, জীবাস্ত্র বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান ও প্রাণিবৃত্তান্ত ইত্যাদিতে এই প্রমাণ মেলে।

অবঘাতন যেমন সৃষ্টির কলকজা তেমনি প্রাকৃতিক নির্বাচন অবঘাতনের অন্যতম প্রধান কলকজা। ইহা প্রকৃতির প্রধান প্রধান আইনের একটি এবং বিজ্ঞানের অন্যসব আইনের মতই ইহা পৌণ কারণ হিসেবে কাজ করে। কারণ ইহাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টিরই একটি ফল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যেসব প্রজাতি উৎপন্ন হয়, তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সমান সমান; মনে হয় যেন আল্লাহ্‌ এদের উৎপন্ন করেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজে থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু প্রকৃতিতে জাতির প্রকারান্তরের উদ্ভব ও পুনরুৎপাদনকে অনুমতি বা অননুমতি প্রদান করে। জাতির এই প্রকারান্তর বা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন করে থাকে তা জাতিবিদ্যা (বংশ ইত্যাদি)-র আইনাবলী র ফল পরিব্যাতি (পরিবর্তন) থেকে উদ্ভূত এবং জড়জাগতিক অতিব্যক্তিবাদীরা এই সব প্রকারান্তর অন্ধ দৈবাধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মতে চাইলে তদনুযায়ী পরিচালিত হয় না।

পরিব্যাতি কখনও সম্পূর্ণভাবে দৈবাধীন বা লক্ষ্যহীন নয়, যদিও অনেকেই এতকাল ধরে এমন দাবীই করে এসেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সেইসব পরিব্যাতি বিবেচনা করা যাক, যা অংগের আকার নির্ধারণ করে থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এইসব পরিব্যাতির অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট অংগের আকারের দ্ব্যাস ঘটিয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচন, উদ্দেশ্যহীন পরিব্যাতিতে অন্ধ দৈবাধীনে কাজ করে কেবলমাত্র হানিকর অংগের দ্ব্যাস ঘটাতে পারে, তা সত্ত্বেও সাধারণ গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিরপেক্ষ অংগগুলিও দ্ব্যাস পেয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরিব্যাতি সব সময় উদ্দেশ্যহীন হয় না এবং অবঘাতনের কলকজা অন্ধ দৈবাধীন নয়। তাই আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই সৃষ্টির পটভূমিতে এবং এই আইনাবলী প্রতিষ্ঠার পেছনে অবশ্যই মনীষা রয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই যে, অবঘাতনের এই কলকজা পরিকল্পিত এবং ইহাই এক মহাজ্ঞানী পরিকল্পনাকারীর দাবী করে।

প্রকৃতির পরিকল্পনার অন্যান্য যেসব প্রমাণ রয়েছে, হানাজাবে তার উল্লেখ সম্ভব হচ্ছে না, তবে কীট, ভূপতন্তু ও তাদের রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমি আমার সীমাবদ্ধ সামান্য গবেষণায় অনেক প্রমাণের সম্মুখীন হয়েছি। প্রকৃতি সম্পর্কে আমি বত বৈশী গবেষণা করি, এইসব প্রমাণ আমাকে ততই মুগ্ধ করে। বিজ্ঞানে আমরা যেসব পদ্ধতি ও প্রণয়কে পর্ববেষণ করি তা যথার্থই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর অতিব্যক্তি, আর অবঘাতন শুধুমাত্র সৃষ্টির একটি পর্যায়কে বর্ণনা করে।

মূলতন্ত্রী ও জড়বাদী, উভয় পক্ষের শিবির থেকে অত্যন্ত উৎসাহী সমালোচনা সত্ত্বেও অবঘাতনিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ধর্মীয় কোন নীতিবাচক গুরুত্ব নেই; যদিও এদের ধর্মীয় সমালোচনা উভয় পক্ষের অনেক প্রকৃত

সত্য-সন্ধানীকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এর সম্পূর্ণ বিপরীতটাই সত্য— কারো পক্ষে অবঘাতনের সত্তাকে মেনে নিয়ে সেই সংগে আল্লাহর সত্তাকে স্বীকার না করা যেমন পরস্পর বিরোধী, তেমনি অযৌক্তিক ও উদ্ভট।

চতুর্দশ শতকের মহান আগুটাইনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহতে বিশ্বাসী এমন অসংখ্য লোক রয়েছেন, যারা অবঘাতন দ্বারা সৃষ্টির মতবাদকে সমর্থন করে নির্মাণপ্রণালী দ্বারা সৃষ্টির কল্পনাকে বর্জন করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এইসব কারণে (এবং আমি নিজেই তাদের একজন মনে করি বলে) অবঘাতনের একটি ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে—যা সম্পূর্ণ ঋণি ও পূর্বসংস্কারবিমুক্ত তথ্যানুসন্ধানীকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে।

তাই আমি আবার বলছি, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে নিশ্চয়ই আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের মনকে আকর্ষণ করবে বেশী।

বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রয়োগ

[ওয়ার্ল্ডটায় অসকার ল্যাভবার্ণ ।। শরীরবৃত্তবিদ ও জীব রাসায়নবিদ : পি-এইচ, ডি; জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ, এস, স্টীল কর্পোরেশনের পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক রাসায়নিক; শরীরবৃত্ত সম্পর্কিত রসায়নের অধ্যাপক, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি সম্পর্কিত জীব রসায়নের অধ্যাপক; মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়; আবাসিক ডিরেক্টর হর্সেল ইনস্টিটিউট, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৪৯ থেকে হর্সেল ইনস্টিটিউটের কার্যকরী ডিরেক্টর । বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ও রাসায়নিক সমিতির সদস্য, প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টর । 'চর্বি ও অন্যান্য বস্তুর রসায়নে অগ্রগতি' *Progress in the Chemistry of fats and other liquids.*)- এর ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের সম্পাদক এবং বহুবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার ।।

আল্লাহর সন্তোকে হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে পেশাদারী বৈজ্ঞানিকের অন্যান্যদের তুলনায় একটি বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে, অবশ্য যদি তিনি সেই সুযোগের সন্ধ্যবহার করেন । তার বৃত্তির নিয়মবদ্ধতা যে সমুদয় মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তার সবই বস্তুতঃ আল্লাহর অস্তিত্বের অতিব্যক্তি মাত্র । অনেকে, যারা এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেন না, তারা বৈজ্ঞানিক হিসেবে সিদ্ধপুরুষ এবং একে সাধারণ রীতিবিহীনতা বলে মনে করা উচিত হবে না । প্রধানতঃ স্বীকৃত নিয়মবদ্ধতার প্রয়োগের উপর বিজ্ঞানের সাফল্য নির্ভর করে এবং এই জন্যে এর মৌলিক সত্যসমূহের সূক্ষ্মদর্শী মূল্যবোধের কোন প্রয়োজন হয় না ।

এইসব মৌলিক নীতির আন্তিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে এবং স্বীকৃতিদানে কতিপয় বিজ্ঞানীর ব্যর্থতা বহুবিধ কারণ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, যার মাত্র দু'টি কারণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ।

প্রথম, অনেক সময় প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ স্বৈচ্ছাসারী নীতি অনুযায়ী আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে । নাস্তিকতা যে রাষ্ট্রের ধর্ম, সে রাষ্ট্রে সামাজিক পরিণতির এমন কি শারীরিক নিপীড়নের ভয় প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহর প্রত্যাদেশের যেসব নিদর্শন মেলে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে তার সক্রিয় পক্ষাবলম্বনকে নিরুৎসাহ করে ।

আবার এমনও হয়, যখন মানুষের মন যথার্থই ভয়-ভীতিমুক্ত থাকে তখন তা অন্যান্য পূর্বপ্রবণ সংস্কারমুক্ত নাও হতে পারে । প্রায় বেশির ভাগ সময়েই সুসংবদ্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্মে অভ্যস্ত ধীরে ধীরে অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের মনে মানুষের রূপে দ্রষ্টা সম্পর্কে

একটি ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়, স্রষ্টার সিক্তে যে মানুষের সৃষ্টি এমন ধারণা তারা পায় না। এইসব মন যখন পরে বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করে তখন এর বিপরীত হয় এবং সসীম নরধর্মী প্রত্যয় ক্রমশঃ বিজ্ঞানের যুক্তিসূক্ত উপপাদক মনোভাবের কাছে অধিক থেকে অধিকতর অসংগত হয়ে ওঠে। পরিশেষে যখন সমন্বয়ের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্ববসিত হয় (যেমন অধিকাংশ সময়ই হয়ে থাকে কারণ এই প্রচেষ্টায় যে যুক্তাভ্যাস প্রক্রিয়াকে জড়ানো হয় সেসব প্রক্রিয়াই বৈজ্ঞানিক নিয়মের সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ) তখন আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাটি পুরোপুরিভাবে পরিত্যক্ত হতে পারে। সেই সঙ্গে মোহমুক্তি ও অন্যান্য মনঃস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি নতুন কোন প্রত্যয়কে আঁকড়ে ধরার চিন্তাকে নিরুৎসাহ করে।

বৈজ্ঞানিক নিয়ম কি এবং আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যক্তকারী মূল তত্ত্বগুলিই-বা কি? সংক্ষিপ্তাকারে ও সরল ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, নিম্নলিখিত ক্রমগুলি এই আলোচনার উদ্দেশ্য হাসিল করবে।

প্রথম, বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ পর্ববেক্ষণ ও তার ফল লিপিবদ্ধ করেন। প্রপঞ্চের উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে যেমন করা হয়েছে থাকে নাক্ষত্রিক পদার্থ এবং আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যের গবেষণায় অথবা গবেষণাগারের পরীক্ষায় যেমন আংশিক নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে তেমনিভাবে এই কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়, বৈজ্ঞানিক তার গবেষণার ফলের সংগে, তার পূর্ববর্তী অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও সম্পর্কে একত্র করে নিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রকল্প গড়ে তোলেন। যেহেতু এই সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পে যতটা পর্ববেক্ষণ করা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী মানসিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান, কাজেই ইহাতে অবরোধ প্রণালী অপেক্ষা আরোহ প্রণালী বিজড়িত। বস্তুতঃপক্ষে, এইগুলিই ভবিষ্যৎবাণী। অবশেষে, যদি বৈজ্ঞানিক স্বীয় সিদ্ধান্তবলী পরীক্ষা বা বৈধ করার অভিলাষী হন, তাহলে তিনি অতিরিক্ত এবং নতুন পর্ববেক্ষণকার্য পরিচালনা করেন এবং তার ভবিষ্যৎবাণীর সংগে সেগুলি মঠেকো পৌছায় কিনা তাই নির্ধারণ করেন।

সংক্ষেপে, বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের সুশৃংখলতা আর ভবিষ্যৎবাণী ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আরও সংক্ষেপে বলা যায়, এই সুশৃংখলতা এবং ভবিষ্যৎবাণী ক্ষমতাই প্রকৃতিতে আল্লাহর প্রত্যাশনাকে তুলে ধরে মানুষের সম্মুখে। আল্লাহর অস্তিত্ব নেই এমন কাঠামোতে অর্থাৎ যেখানে যুক্তিসিদ্ধতা অনুপস্থিত সেখানে সুশৃংখলতা ও ভবিষ্যৎবাণী-ক্ষমতা অর্থহীন অসংগতি মাত্র।

প্রকৃতিতে সুশৃংখলতা আর ভবিষ্যৎবাণী-ক্ষমতা যথার্থ হৃদয়ংগম করার মানুষের যে ক্ষমতা, সাধারণতঃ তা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রত্যাকে অনুসরণ করে না। কিন্তু এই হচ্ছে,

আল্লাহর কল্পনার মানুষকে সৃষ্টি করার কল। আল্লাহ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতে সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণাকে বর্জন করে, প্রকৃতির প্রত্যাদেশসমূহকে আল্লাহর কল্পনার মানুষের সৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেই মানুষ এমন এক প্রারম্ভিক অবস্থার পৌঁছায়, যেখান থেকে সে আল্লাহর পরিমা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করতে পারে।

মানুষ কিন্তু এখনও জ্ঞানের প্রথম সোপানে রয়েছে। তার নিজ শারীরিক আকার-আকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, নাক্ত্রিক পদার্থ আর আন্তনাক্ত্রিক মহাশূন্য যে অস্বাভাবিক রকম বিশাল; জড়পদার্থ ও শক্তির যৌলিক উপাদানগুলি যে কল্পনাভীত ক্ষুদ্র এবং তার নিজের আয়ুষ্কাল চলমান মহাবিশ্বের অসীমতার মাঝে যে এক সেকেভেরও নিরতিশয় ক্ষুদ্র সময়ের সমান, সে সম্পর্কে তার কিছুটা সচেতনতা আছে। শক্তি, মহাশূন্য এবং কাল ও অনুরূপ অন্য যেসব ধারণা আজও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তার নতুন রূপ ও মাত্রার সম্ভাবনা সম্পর্কে সে ক্ষীণ ধারণা পোষণ করতে পারে। সে জীবনকে সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সত্য; কিন্তু কি এর প্রকৃতি সে সম্পর্কে তার কোন বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি নেই। তথাপি সুশৃঙ্খলতা ও ভবিষ্যদ্বাণী-ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তার সামনে অসাম্বিকৃত জ্ঞানের যে বিরাট সীমাহীন দৃশ্য পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তার সীমাবদ্ধ বোধশক্তি তাকে উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়। এখানে পৌঁছেই সে এক বলক আল্লাহর পরিমা অবলোকনে সক্ষম হয়।

প্রাকৃতিক প্রপঞ্চে আল্লাহকে যেভাবে স্মৃত করা হয়েছে তার মধ্যদিয়ে আল্লাহকে হৃদয়ংগম করার ক্ষমতা আজও মানুষের সীমাবদ্ধ, তাই আল্লাহতে আল্লাহর অস্তিত্ব। তার বিশ্বাসের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকে, ইমানের একটি ভিত্তি, ইহাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ইমানের ভিত্তিতে এক স্বয়ংকৃত আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করা অনেক মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক আল্লাহতে বিশ্বাস করেন তাদের আরো একটি অতিরিক্ত পরিভূটি রয়েছে, যা আসে প্রতিটি নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের হাত ধরে। কারণ, প্রতিটি আবিষ্কার, আল্লাহ সম্পর্কে তার ধারণার আরও অতিরিক্ত অর্থ এবং তাৎপর্য দুই-ই বৃদ্ধি করে।

আব্রাহাম বাহ্যিক প্রমাণ

[পলক্সারেন ইবারসোন্ড। প্রাণপদার্থ বিজ্ঞানবিদ : এ, বি কাননেড, ইনফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এ, পি-এইচ, ডি, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কিনে হাওয়েল রিসার্চ কাউন্সেলের সাবেক বিকিরণ বিশেষজ্ঞ ও রোয়েন্টজেনোলজিস্ট, ইউ, এস, ব্যুরো অফ টাভার্ডস্ এর মানহাটন পরিকল্পনার রিসার্চ সিয়াজেঁ। এইড, আণবিক শক্তি কমিশনের ওকরীজ অপারেশনের আইসোটোপ বিভাগের ডিরেক্টর, বর্তমানে ডিভিশন অফ সিভিল অ্যাপলিকেশন, এ, ই, সি, ওয়াশিংটন ডি, সি'র আইসোটোপ ও বিকিরণের ডিরেক্টর। আণবিক বিজ্ঞান কমিটি, জাতীয় গবেষণা কাউন্সিলের এবং বিভিন্ন জাতীয় জীবতত্ত্ব সম্পর্কিত ও রেডিওলজি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য। আণবিক পদার্থবিদ্যা, প্রাণ পদার্থবিদ্যা, নিউটন বিকিরণের উপাদান ও আইসোটোপ বিশেষজ্ঞ।]

ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক ট্রালিস্ বেকন তিন শতাব্দীরও আগে বলেছিলেন, “সামান্য দর্শন-জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শনজ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।”

নিঃসন্দেহে বেকন সত্য উক্তি করেছিলেন।

মানব জাতির অভ্যুদয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষকে লক্ষ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তার চাইতে বেশী সংখ্যক চিন্তাশীল অনুসন্ধিসু প্রতিটি ব্যক্তি-বৃত্ত এইসব রহস্যময় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন কোন্ সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা, কোন অনন্ত শক্তিশালী মানুষ এই অন্তহীন মহাবিশ্বকে পরিচালনা করেন? জীবন আর মানুষের অভিজ্ঞতার মূলে অর্থাৎ বাইরে কি আছে?

যদি পৃথিবীর উপরে এই প্রাণিজগত বেঁচে থাকে তাহলে ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি বংশধরদের অগণিত মহাপদসংখ্যক মানুষের প্রত্যেকে এইসব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করবে। বেহেতু গভীর ও বহুল আত্মা এইসব প্রশ্নের একান্তভাবেই বোঁজ করছে, কাজেই আমরা কোন প্রকারে পূর্ণ হতে পারি। এমনি কোন জরাবের প্রত্যাশী না হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবেই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করতে এগিয়ে যাই।

একটি কথা খুবই সত্যি, যদিও মানুষ খুব উপায় উদ্ভাবনে গঠু এবং বুদ্ধিমান তথাপি সে কখনও নিজের মধ্যে রহস্যসম্পূর্ণ এমনি ধারণা করতে পারেনি।

বিভিন্ন ধর্মের, জাতির এবং মহাদেশের মানুষ ইতিহাসের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বৃত্তভাবে এবং সার্বজনীন মনোভাবে নিয়ে এই বিশ্বে জীবনের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য কি এই অতীত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসহ বিশাল মহাবিশ্বকে বুঝতে আর বোঝাতে বেয়ে মানুষের মারাত্মক রকমের অসামর্থকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন।

বুদ্ধি অথবা চেতনা যা দিয়েই হোক না কেন, প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, মানুষ প্রাণহীন জড়, অনিয়ন্ত্রিত পদার্থের সঙ্গে দৈব ও লক্ষ্যহীন ঘটনা সম্পর্কিত কোন কল্পনাকে ঠাঁই না দিয়ে প্রায় সার্বজনীনভাবেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, এই মহাবিশ্বে সকল দিকে পরিব্যাপ্ত, পরিবেষ্টিত একটি বৃহত্তর মনীষা আর নিয়মবদ্ধতা বিদ্যমান। মানুষ যখন তার নিজের বুদ্ধিমত্তার বাইরে extrapolation -এর প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীনভাবেই স্বীকার করে নেয়, তখন তাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার জন্যে এক সুদৃঢ় প্রমাণ।

অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক প্রমাণ-এর মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে অসন্দিগ্ধ স্বীকৃতি লাভ করা যায় না। অবশেষে প্রত্যেকটি মানুষ, তার বস্তুতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে একত্রে ছাঁচে কেলে তারপর উত্তমরূপে গিটিয়ে, তার জবাব তৈরী করবে—তার নিজের জীবন ও আল্লাহর মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তা উন্মোচিত হবে তার জবাবে। অনন্ত বিস্তৃত ও জটিল জড় মহাবিশ্ব সম্পর্কে তার বোধশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা, ভাবাবেগ ও চেতনার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতি তার অন্তরের অন্তঃস্থলের সহানুভূতিশীলতাকে একত্র করে নিলেই এই জবাব পাওয়া যাবে। যে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দুনিয়ার সকল প্রান্তের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের কাছে আল্লাহকে চোখে আঙুলি দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যদি তার ওয়ারী নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে এ যুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিচিত্রতার দিক থেকে অসীম-সামগ্রিক প্রত্যাপণেও প্রকৃতই অভিতৃপ্তকারী।

আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পোড়ার দিকে আমি মানুষের বিচার শক্তি ও বৈজ্ঞানিক নিয়মের ক্ষমতার এতই মোহিত হয়েছিলাম যে, নিশ্চিতভাবেই অনুভব করেছিলাম বৈজ্ঞানিকেরা শেষে যেয়ে নিশ্চয়ই মহাবিশ্বে সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারেন—জীবনের উৎস, কোথা থেকে বুদ্ধি এসেছে এমন সবকিছুই অর্জ করতে পারেন। কিন্তু এসব কিছু সম্পর্কে, আমি ক্রমশঃ যতই অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞানার্জন করতে লাগলাম, পরমাণু থেকে হায়াপথ, রোগ-জীবাণু থেকে মানুষ সম্পর্কে যতই আমার জ্ঞান বাড়লো, ততই অধিক থেকে অধিকতর বিষয়ই আমার কাছে অব্যক্ত রয়ে গেল। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞান পরমাণুর খুঁটিনাটি তথ্য সম্পর্কে হয়তো জয়ের ধ্বজা উড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ মহাবিশ্বে জীবন, মানুষ ও মন কখনও অনাবিকৃতই থেকে যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা তাড়াতাড়িই জানতে পারেন যে, বিজ্ঞান যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে—“কি করে” এই প্রশ্নের অধিক থেকে অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিজ্ঞান বা মানুষ ‘কেন’ এর জবাব দিতে সক্ষম নয়। বিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের বুদ্ধিমত্তা, পরমাণু, নক্ষত্র, হায়াপথ, প্রাণ এবং সকল অলীক গুণের অধিকারী মানুষ কেন রয়েছে এই প্রশ্ন কখনও ব্যাখ্যা করবে না, যদিও বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের জন্য সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিবৃত্ত মহাপ্রাণনিক একটা খিওরী

দাঁড় করাতে পারে—তারই কলে ছায়াপথ, নক্ষত্র, সব কয়টি গ্রহ এবং পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করতে পারে, কিন্তু কোথা থেকে এই সৃষ্টির জন্যে জড়পদার্থ আর শক্তি এসেছে, কেন এই মহাবিশ্ব এমনভাবে গঠিত, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, সে বিষয়ে কোন ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানের জুটেবে না। সোজাসুজি চিন্তা করলে সুস্পষ্ট বিচারশক্তি এই ‘কেন’র জবাবে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণাকেই কাছে টেনে নেবে।

অনেকে আল্লাহকে যেমন মনে করেন, তিনি কি তেমনি সত্যি “স্বয়ংকৃত” আল্লাহ? একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তাঁকে এই অর্থে স্বয়ংকৃত মনে করি না যে, তিনি কোথাও মানুষের রাজা-বাদশাহর মত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন। আল্লাহ ও তাঁর স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র লেখাগুলিতে মানুষের জীবন ও মানবেতিহাস থেকে নেওয়া যথেষ্ট বাক্যালাংকারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ এক আধ্যাত্মিক সত্তা বিধায় সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাষায় তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ যেহেতু মানুষের চিন্তার প্রবণতা নিম্নগামী এবং মাটির সংগে তার নিবিড় সম্পর্ক; কাজেই এই ধরনের সংজ্ঞাকে কাজে লাগানো বা হৃদয়ংগম করা তার পক্ষে অসম্ভব।

অপরপক্ষে, আধ্যাত্মিকতা ও শ্রেষ্ঠতায় আল্লাহর নৈতিক উৎকর্ষতা বিদ্যমান। তিনি চিন্তা করার ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতি রয়েছে এমনি সব বর্ণনা অনেক বোধগম্য এবং এই দিক থেকে আল্লাহ হচ্ছেন একটি অভিলক্ষ্য, স্বয়ংকৃত সত্তা। মূলতঃ তিনি হচ্ছেন এক পবিত্র আদর্শ যাঁর কাছে আমাদের মানবীয় ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ পরিমেয় আদর্শ। “মানুষ আল্লাহর প্রতিচ্ছবি” বলে যে উক্তি করা হয়ে থাকে আসলে এই কথাই উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই।

আল্লাহ কোন অর্থেই শরীর নন। তাই শারীরিক উপলব্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝানো মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এই সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক প্রমাণ বিদ্যমান এবং তিনি যে বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তিতে বর্ণনাতীত, তাঁর সৃষ্টি সেই কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ সকল চেতনার অতীত, তাই মানুষ তাঁর সর্বশেষ অভিলাষ কি তা নিরূপণ করতে পারে না। যে বিশাল মহাবিশ্বের তুলনায় মানুষ অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র ও নগণ্য অংশবিশেষ, সেই মহাবিশ্বের সর্বশেষ উদ্দেশ্য কি তাও সে পরিমাপ করতে পারে না।

তবে আমরা একটি বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করি যে, মানুষ ও এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয়ই এই সবার একটা আরম্ভ আছে এবং তজ্জন্য একজন আরম্ভকর্তাও রয়েছেন। আমরা আরও উপলব্ধি করি যে, বিশ্বের এই চমৎকার ও জটিল প্রাকৃতিক আইনাবলী কখনও মানুষের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয় না এবং প্রাণের যে রহস্য তারও একটা উৎস নিশ্চয়ই আছে, মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত এক নির্দেশ শক্তি একটি পবিত্র প্রথমারম্ভ এবং একটি পবিত্র নির্দেশ।

আইনষ্টাইনের 'সৃজনী শক্তি' সনাতকরণ

[মারসিন বুকস ক্রীডার ।। শরীরবৃত্তবিদ : এম, এস-সি, পি-এইচ, ডি, মেরিন্সিয়াড বিশ্ববিদ্যালয়। নাটিক, ম্যাসাচুসেটসের ইউ, এস, কোয়ার্টার মাটারের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক প্রতিরক্ষা ডিভিশনের শরীরবৃত্তবিদ, ইয়ার্প নাথারেন কলেজের জীববিদ্যার অধ্যাপক। আমেরিকান সোসাইটি অফ প্রকেশনাল ব্যারোলজিষ্ট, ন্যাশনাল স্পেলিওলজিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতির সদস্য। বিপাক ও সঞ্চয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।]

সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নিচয় আল্লাহ আছেন।

তবে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। গবেষণাপায়ে নিয়ম মাসিক পাত্র যায় না তাঁকে কোন প্রকার বিশ্লেষণ বা পুংখানুপুংখরূপে বিচার করে দেখা। তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃতিক, আশ্বিক, প্রজ্ঞাবান, সৃজনশীল, সর্বশক্তির আধার।

তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে যদিও আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি না, তবুও আমরা মানুষ ও প্রকৃতিতে তাঁর অস্তিত্বের যে অগণিত প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তা নিয়ে গবেষণা করতে পারি। আমার মনে হয়, ঐসব প্রমাণ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি বিশ্বাসজনক।

আমি কি এখানে বলতে পারি যে, বিজ্ঞানের তথাকথিত অনেক শিওরী বা তথ্য, বা নাকি অনেক মানুষই সত্য বলে মনে করেন, তা আদৌ প্রমাণিত সত্য নয়। ইহাদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত যৌলিক সত্য না হয়ে কেবল প্রকৃত তথ্যের দিক নির্দেশ করে মাত্র। বিষয়টা কতকটা এই রকম : আপনি দেখলেন একটা লোক আপনার বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল এবং তারপর আবিষ্কার করলেন বাড়ীর সবকিছু চুরি হয়েছে। সে যে অপরাধী তা প্রমাণ করার জন্যে আপনার হাতে কোন প্রমাণ নেই, তবে ঘটনা পরিদৃষ্টে নিঃসন্দেহে তারই অপরাধ বলে মনে হয়। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে বিচারক তাই সাক্ষ্য-প্রমাণের যথার্থতা যাচাই করে থাকেন।

তদুপরি, বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রত্যেকটি সত্যের অস্তিত্ব হাতে কলমে দেখানোর বা প্রমাণ করার পক্ষে অপ্রতুল। উদাহরণ স্বরূপ বল যায়, মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারে

এমন সব শক্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেম অন্যতম। কিন্তু শ্রেম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা বিশ্লেষণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি সৌন্দর্যবোধ বা সংগীতের রসজ্ঞান থেকে বঞ্চিত, তাকে কি করে সৌন্দর্য বা সংগীতের রস গ্রহণ করতে হয় একথা কি বোঝানো যায়? কিন্তু শ্রেম, সৌন্দর্য এবং সংগীতের যে মাধুর্য রয়েছে, তা কে অস্বীকার করতে পারে? যদিও আত্মাহুত অস্তিত্ব সম্পর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণের অভাব থাকতে পারে তবুও যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যেমন অনেক প্রমাণকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, তেমনি শক্তিশালী প্রমাণ আত্মাহুত অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিন্যস্ত।

আমাদের প্রাণের প্রথম পর্বীর মেলে সৃষ্টিভঙ্গে, মহাবিশ্বের অস্তিত্বে যার সবকিছু প্রকৃতির নির্দিষ্ট কতকগুলি শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যার সুশৃংখলতা একজন নিয়ামক বা পরিচালক রয়েছে এমনই ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। এই যথার্থতা এত বিশাল যে, গ্রহগুলির কক্ষপথ এবং অথুনা 'পূর্বাহ্নে' কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ বলে দেয়া যেতে পারে। এ যথার্থতা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে বিজড়িত বৈদ্যুতিক আধানের মিথস্ক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা অধিকাংশ প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে পানিতিক নিয়ম ও সূত্রে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম দান করে।

সাধারণ মানুষের অজিজ্ঞতা অনুযায়ী, এ ধরনের শৃংখলা একটি সুশৃংখল মনের কল। পরিকল্পনাকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এর পশ্চাতে না থাকলে শৃংখলতার পরিবর্তে বিশৃংখলাই মাথা উঁচু করতো।

প্রাণিরাজ্যে এবং জৈবিক কাঠামোতে আরেক শ্রেণীর প্রমাণ বিন্যস্ত। শরীরবৃত্তবিদ হিসেবে মানুষ ও জীবদেহের আকৃতি আর কাঠামোর জটিলতা এই প্রবন্ধকারকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। যদিও কৃত্রিম উপায়ে অভ্যস্ত সীমিত মাত্রায় কতিপয় কাঠামোর কাজ নতুন করে করা যায়, তথাপি দেহের যে কোন একটি অংশ আগের সৃষ্টি বা নির্মাণ, শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনকর্ম সুদক্ষ মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। এই প্রসঙ্গে, কৃত্রিম সুসুস্ক, হৃদযন্ত্র, যন্ত্রাংশ এবং যান্ত্রিক মস্তিষ্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী মস্তিষ্ক সম্পর্কে বলা যায় যে, মস্তিষ্ক বিদ্যুতের মত আধান উৎপাদন ও পরিচালন করতে পারে এবং মস্তিষ্কে কতিপয় রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সামান্য বিষয় ছাড়া আমরা এখনও এর প্রাকৃতিক ভিত্তি খুব কমই জ্ঞাত আছি। কিন্তু মস্তিষ্কের যে অগণিত কাজকে তার ব্যাখ্যা করতে পারে বা হিসেব দিতে পারে? পেশীর যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন করার জন্যে এই মস্তিষ্ক দায়ী এবং ইহা দেহবস্তুর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শ্বাসপ্রক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এতে থাকে নৃতি এবং মুহূর্তের স্বরণে নৃতিপটে ভেসে উঠার জন্যে হাজারো মানসিক প্রতিচ্ছবি এতে ধরে রাখা হয়। মস্তিষ্কের এই একত্রীকরণের ও সমস্যা সমাধানের

ক্ষমতা, অথবা বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান, উদ্দেশ্য, আকাংক্ষা এবং সুর্ব শক্তির কি কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব? সৌন্দর্যকে পুরামাত্রায় উপলব্ধি করার মত রুচিজ্ঞান, প্রেমের মত অপার্থিব সত্তাকে অনুভব করার মত শক্তি, আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ-সবকিছু একই ক্ষুদ্রাকার জীবনের মূলীভূত উপাদানের বা প্রোটোগ্লাজমের সমাবেশে গড়ে ওঠা মস্তিষ্কের নিত্যকার কর্ম। কিন্তু প্রাকৃতিক অথবা অন্যকোন ভিত্তিতে কে একে ব্যাখ্যা করতে পারে?

দেহের অনেক জটিলতার মধ্যে, সারাক্ষণ দেহাভ্যন্তরে যে অযুত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, যার অনেক বিক্রিয়াই আদৌ দেহের বাইরে ঘটানো সম্ভব নয়, তার দুর্বোধ্য নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। দেহমধ্যস্থিত ঝাঁকুনী ঝারা শরীর উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন সাধনের জন্যে পরিপূরক অবস্থা অঙ্কুণ রাখে। এতে করে দেহাভ্যন্তরে ক্ষতিকারক কোন রোগজীবাণু ঢুকলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে রক্তে রোগজীবাণুর প্রতিবেদক সৃষ্টি হয় এবং অনাক্রম্যতাও লাভ করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে যেমন প্রোটোগ্লাজম গঠনকারী রাসায়নিক পদার্থের কাঠামো সুনির্দিষ্ট, তেমনি প্রত্যেকটি রোগের জন্যে রক্তের মধ্যে রোগজীবাণুর প্রতিবেদক ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই প্রত্যেকটি মানুষ একটি রাসায়নিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। কে এই স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলেছে? নিশ্চয়ই শুধুমাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

একবার হৃদযন্ত্রের কথা ভাবুন। একটি জীবনে গোটা আয়ুষ্কাল ধরে এই ক্লাস্তিহীন দেহযন্ত্রটি বিরামহীন সব দাবী মিটিয়ে চলে। তা'ছাড়া এটি রহস্যজনক হৃদোবদ্ধতার অধিকারী এবং যখন দেহের সকল স্নায়ুতন্ত্রী বিকল হয়ে পড়ে তখন এই হৃদোবদ্ধতা একে স্পন্দিত হতে সাহায্য করে — দুর্ঘটনার সময় এই বৈশিষ্ট্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়। শারীরিক সনাতনী এই রহস্য আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যায়? কি করে আমরা একে ব্যাখ্যা করতে পারি।

দেহাভ্যন্তরের কাজের এই সব অলৌকিক ব্যাপার প্রাণের রহস্যের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন; কিন্তু দীর্ঘকালের এই সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রোটোগ্লাজমের বৈশিষ্ট্য এবং সারাক্ষণ দেহের অভ্যন্তরে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে, তবুও এই বিষয়ে যথোপযুক্ত এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞার আমাদের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান।

প্রাণবাদ বলে অভিহিত একটি খিওরী আছে। উক্ত খিওরী এই ধরনের প্রস্তাবনা করে যে, প্রাণের প্রয়োজনীয় জানা প্রাকৃতিক শক্তি ছাড়া অতিরিক্ত আরও কোন শক্তি এর পেছনে কাজ করে চলেছে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই, প্রথমতঃ অনেক বৈজ্ঞানিকের এই খিওরী সম্পর্কে মতবৈধতা বিদ্যমান এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাণের প্রকৃত সারবস্তু কি, তা এই

খিওরী! অত ব্যাখ্যা করে না— ব্যাখ্যা করে না, জ্ঞাত ও সীমিত পরিমাপ করা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত অবয়বীর জন্য ও ক্রমবিকাশের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান দিক বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে। অবিভাজ্য কোষের একটি ক্ষুদ্র সমাবেশকে পরিবেশে প্রাপ্তবয়স্ক কলার জটিল ব্যবস্থারূপে গড়ে তোলার জন্যে জগতস্থ স্বর্ধীয় ক্রমবিকাশের পচাতে কোন সংগঠনী ও পরিচালন শক্তি রয়েছে কে তা বলতে পারে?

এ প্রসঙ্গে আমাদের ইহাও যথার্থ উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা যে সব বিষয় বুঝতে অক্ষম সেগুলিকে আদিমকালের মানুষ যেমন আল্লাহর অসন্তোষের নির্দেশ হিসেবে ঝড় ও বজ্রকে মেনে নিয়েছিল, তেমনি করে আল্লাহর বিশেষ হস্তক্ষেপ বলে বিবেচনা করি। সে যাই হোক, প্রাণ ও তার ক্রমিক বৃদ্ধিতে পরিদৃষ্ট এই উদ্দেশ্যক, নিশ্চয়ই ক্রমপরিকল্পনার দিক নির্দেশ করে।

সৃষ্টিতত্ত্বের আরেকটি দিক, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা যদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা সৃষ্টিধর্মী অতি জাগতিক শক্তির অতিরিক্ত প্রমাণের সম্মুখীন হই। মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, উত্তম চক্রাকারে আবর্তিত গ্যাসের মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রথম জড়পদার্থ গঠিত হয় এবং আরতনে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে ও ভেঙে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঞ্জকারে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে পরিশেষে জ্যোতিষ্মন্তীতে পরিণত হয়। প্রস্তাব করা হয়েছে, অনুরূপভাবেই জীবনের সৃষ্টি। তবে পাল্লুরের সময় থেকেই এই কথা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে, প্রাণ কখনও অ-প্রাণ জড়পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়নি। অতএব, দেখা-যাচ্ছে, ইহা প্রাণের সূত্রপাত সম্পর্কিত খিওরীকে অস্বীকার করেছে। তদুপরি আমরা গবেষণাগারের বিচিত্র পরিবেশজনিত অবস্থা সৃষ্টির উপযোগী বহুবিধ উপকরণের সাহায্যে প্রোটোপ্লাজমের কতিপয় উপাদান সৃষ্টি করতে পারলেও তা প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাছাড়া, সঠিক আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় সব কয়টির কারণ সৃষ্টি হওয়ার গাণিতিক সম্ভাবনাও প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য।

যদিও বা কিছু পদার্থ এইভাবে সৃষ্টি হয় তবুও প্রারম্ভিক মৌলিক পদার্থ বা বৈদ্যুতিক আধার বা নবগঠিত পিণ্ডগুলিকে উত্তাপ ও প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বিলম্বিত করে ও চলমান রাখে এবং যা নাকি বর্তমানে প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার উৎপত্তির প্রশ্নটি অস্বীকারসিদ্ধই থেকে যায়।

সৃষ্টি সম্পর্কিত এই মতবাদ অন্যান্য সমস্যারও সৃষ্টি করে থাকে। প্রোটোপ্লাজমের ক্ষুদ্র একটি পিণ্ড হিসাবে যদি প্রাণের সূচনা হয়ে থাকে, তবে পৃথিবীর উপর যে অগণিত বিচিত্র প্রাণের সমারোহ বিদ্যমান তা সৃষ্টির জন্য নিশ্চয় একটা বিস্তৃত শক্তি উক্ত প্রোটোপ্লাজমের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। প্রোটোপ্লাজমের একটি পিণ্ড যে জৈবিক অবস্থাতন দ্বারা আজকের দিনের জটিল মানুষের আকারে পরিণত হতে পেরেছে, যখন তার পরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক কল-কজাগুলি পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা যায় সেগুলি অত্যন্ত অপর্বাণ।

প্রথমতঃ সৃষ্টিজননবিদ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান, বংশের সামান্য কয়েক রকম রূপবদলের প্রকাশ করে, কিছু মূল কাঠামোর কোন প্রকার বড় রকমের জটিলতার জন্যে যে এই পরিবর্তন দায়ী তেমন কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়তঃ কথা হচ্ছে বোণাতমের উদ্ভবতন সম্পর্কিত আইন কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছে এ প্রস্তাব করে, কিছু তা পৃথিবীর গ্রামী বা উদ্ভিদের অসংখ্য প্রকার ভেদ বা প্রজাতি কেন গড়ে উঠছে তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অধিকন্তু এন্ট্রপি বা বিশ্বের লভ্য শক্তির গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একটি প্রারম্ভিক ক্রম থেকে তাপশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। সাধারণ প্রোটোপ্লাজম থেকে জটিল মানুষে পরিবর্তিত হওয়ার জন্যে এরোজেনীর জৈবিক অবস্থাতলে এই নিয়ম সম্পূর্ণ বিপরীত।

নিঃসন্দেহে একথা বল চলে যে, বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জগতের কেউই সৃষ্টিতে যে পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তি কখনও তার প্রমাণ পাবে না, কিছু আমাদের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সম্পূর্ণ জড়বাসী ব্যাখ্যার মধ্যে এত বেশী অসম্ভবতার কথা ব্যক্ত করে যে, প্রধান কারণ হিসেবে বিশেষ সৃষ্টির একটি রূপ এবং বাইরের শক্তির প্রভাবকে বীকার করে নেয়া অধিকতর বুদ্ধিবৃত্ত মনে হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন এই বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনী শক্তিকে বীকৃতি দান প্রসঙ্গে ইহাকে “অসীম সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাসী শক্তি” বলে উল্লেখ করে “ব্যাপক মহাবিশেষ” এই শক্তি প্রতীয়মান বলে মন্তব্য করেছেন।

ওরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমি এই “শক্তিকেই আল্লাহ বলি।” মহাজাগতিক পদার্থের ওরুতে আমি অনন্ত শক্তি বা জড়পদার্থ দেখি না। দেখি না “দূর্জয় কোন অদৃষ্ট,” ন আমার নজরে পড়ে “আদিম যৌগিক পদার্থগুলির একটি আকস্মিক সমাবেশ,” না পড়ে কোন “মহান অজানাকে”— আমি স্পষ্ট দেখতে পাই পরম শক্তিমান আল্লাহকে

এই সঙ্গে, আমি কখনও আমার মনোভাবকে “অযৌক্তিক” বলে মনে করি না। মরণশীল মানুষের শক্তি ও জ্ঞানের পরিধি অভ্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই আমার মতে এটা “বুদ্ধিবৃত্ত” ওটা “অযৌক্তিক” এই সব না বলে, যদি তারা খুব বেশী তাদের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে এই অভ্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে কথা কয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেছি তাই মেনে নেন, তাহলে বিচক্ষণতার কাজ করবেন।

যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, এই আমার বক্তব্য এবং এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস, যা আমি প্রবাসত্য বলে মনে করি।

বৈজ্ঞানিক প্রত্যাদেশ আল্লাহকে নির্দেশ করে

অর্জ আর্ল ডেভিস ।। পদার্থবিদ : এম, এন্স, আই, ওয়াশেট কলেজ, সি-এইচ, ডি, মিনোসোটা বিশ্ববিদ্যালয়; ন্যাভাল অর্ডিন্যান্স ল্যাবরেটরীর সাবেক পদার্থবিদ্যাবিদ ১৯৪৮ হতে ম্যাটেরিয়াল ল্যাবরেটরীর নিউইয়র্ক ন্যাভাল শিপইয়ার্ড, ক্রুকলীনের নিউক্লিওনিক শাখার প্রধান; শের্কাট্রোকটোমেট্রি সৌর বিকিরণ, জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক জগতের বিশেষজ্ঞ ।।

যতই জ্ঞান বাড়তে থাকে এবং পুরাতন কুসংস্কারগুলি আসলে কি, তাই যখন জানা যায়, তখন ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের নীতিসমূহের আরও খুঁটিনাটিভাবে মূল্য নিরূপণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে ।।

এইরূপ পূর্ণ মূল্য নিরূপণের পেছনে বহুবিধ উদ্দেশ্য থাকতে পারে; কিন্তু আমাদের অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, এই উদ্দেশ্য সত্যকে জানার বর্ধার কামনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে ।। বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অজ্ঞেয়বাদ ও অনিশ্চয়বাদের ভুল-চুকের বিরুদ্ধে আমাদেরকে অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে এবং সেই সংগে আমাদের একথাও মনে নিতে হবে যে, যদি কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে সনাতনী যে সব ভিত্তি রয়েছে সেগুলিকে তীব্র সমালোচনা করে, একমাত্র এই কারণে সে “নাস্তিক” অপবাদ পাবার যোগ্য নয় ।। এরূপ ব্যক্তি হয়তো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারে, বর্ধারই তার বিশ্বাস অত্যন্ত সুদৃঢ় বুনিয়েদের উপর সূত্রটিষ্ঠিত ।।

বৈজ্ঞানিক মহলে যে নাস্তিকতা বিদ্যমান আছে, তা অনস্বীকার্য ।। কিন্তু অবৈজ্ঞানিকদের চাইতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নাস্তিকতা অধিক বিদ্যমান বলে সর্বসাধারণের ধারণাও যে সম্পূর্ণ সত্যি, তা কখনও প্রমাণিত হয়নি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথম প্রথম যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, তা তার সম্পূর্ণ বিপরীত ।।

সর্বশক্তিমানে আমার নিজস্ব যে বিশ্বাস রয়েছে, সেই সম্পর্কে এই কথা না বললে বোকামী করা হবে যে, আমার এই বিশ্বাস ছেলেবেলার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি ।। চিন্তাধারা গড়ে উঠার বয়সে আমরা যেসব ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকি কখনও তার প্রভাব এড়াতে পারিনি ।। কিন্তু আমি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি, আমার বর্তমান বিশ্বাস যদিও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, তথাপি তার এমন একটি সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে, যা যাবতীয় মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।।

একজন পদার্থবিজ্ঞানবিদ হিসেবে এই মহাবিশ্বের অবিস্থাস্য জটিল কাঠামোর স্ব-কিন্ধিত দেখার সুযোগ হয়েছে আমার, যার ক্ষুদ্রতম পরমাণুর আভ্যন্তরীণ প্রাণসংশ্লিষ্ট বৃহত্তম নক্ষত্রের বিশাল কর্মভৎপরতার ভূমিনায় কোন অংশেই কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। যেখানে প্রতিটি আলোকরশ্মি, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া, প্রতিটি প্রাণির প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য, একই অপরিবর্তনীয় আইনাবলীর নির্দেশ যোতাবেক আত্মপ্রকাশ ও নিজস্ব পথে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এই ছবিই সবার সামনে মেলে ধরেছে। যে কেউ এই ছবির প্রতি দৃষ্টি বোঁদী অভিমুখিত সহকারে পর্ববেষণ করবে, এই ছবি তার কাছে ততই জটিল আর ততই মনোরম রূপ পরিগ্রহ করবে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে, আশ্চর্যজনক সব রহস্য উদঘাটিত হওয়ার সেই সঙ্গে কতকগুলি অপরিহার্য প্রশ্ন জেগেছে। অবশ্য এর কোনটাই নতুন নয়, তবে বিশ্বের শিল্প-নৈপুণ্যে সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এতে করে নতুন পরিশ্রুতির সৃষ্টি হয়েছে, যাতে মানব জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরা পড়েছে। এই সবার মধ্যে একটি প্রশ্ন আমাদের নৈতিক দায়িত্বাবলী ও চরম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তার অনুমিতির জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটি অতি পুরাতন প্রশ্ন “সর্বশক্তিমান এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, আছেন কি?” এবং এই সঙ্গে রয়েছে ততধিক কঠিন আর একটি প্রশ্ন, যা নাকি অনেক অপ্রাণ্ড বয়স্ক ছেলেমেয়ে আশ্চর্যজনক আর অপ্রতিভ করা চমৎকার যুক্তিপূর্ণ উপায়ে উপস্থাপিত করে থাকে, “আল্লাহ্ যদি আমাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে ‘আল্লাহকে’ কে সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ আছেন কি আল্লাহ্ নেই, এর কোন প্রশ্নেরই যে বৈজ্ঞানিক যথার্থ প্রমাণ নেই একথা অনবীকার্য। ইহা আরও সম্ভবপর হতে পারে যে, যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কখনই সূত্রাকারে গ্রহণিত করা যাবে না। আমরা এমন একটি প্রাকৃতিক বিশ্বে বাস করি যার সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গবেষণা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এর কাঠামো, এর নিয়মাবলী সবই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এই বিশ্ব তার নিজের বাইরে কোন কিছু সম্পর্কে আমাদেরকে তথ্য যোগাতে পারে—এরূপ বিশ্বাস করার পশ্চাতে কোন যুক্তি নেই। এই বিশ্ব জ্ঞানালহীন একটি কক্ষ অথবা কাঁচের জানালাযুক্ত একটি কক্ষও হতে পারে—যে জানালা দিয়ে ভেতরের দিকে দেখা যায়, কিন্তু বাইরের কোন কিছুই দেখা চলে না।

যেহেতু আমরা আল্লাহর সন্তিত্ব আছে কি নেই, তা প্রমাণ করতে পারি না। কাজেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজ আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে, আমরা যা জানি তা থেকেই বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন একটা অনুমিতি করে নেয়া। এমন একটা অনুমিতি, যা নাকি আমাদের পরিজ্ঞাত জ্ঞানের কোন ভিত্তিতেই যুক্তিসংগত উপায়ে সমালোচনা করা চলবে না। এই অনুমিতি হচ্ছে : কোন পার্থিব জিনিস আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না।

যদি একটি মহাবিশ্ব নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তাতে সৃষ্টিকর্তা খোদা তা'আলার কক্ষতা অন্তর্নিহিত আছে বলে ধরে নিতে হবে এবং আমরা বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, এই বিশ্বই খোদা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। তবে এখানে এক ক্ষুদ্রতরুণে আল্লাহকে কল্পনা করা হচ্ছে— আল্লাহর আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় রূপে। আমি কিন্তু এমনি এক আল্লাহর কথা চিন্তা করতে পছন্দ করি, যিনি নিজের সংগে কোন সাদৃশ্য রেখে একটি জড়জগতকে সৃজন করেন নি, কিন্তু তারই সৃষ্টি সেই বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছেন এবং যিনি এই বিশ্বের প্রতিটি রক্তে প্রবেশের ক্ষমতা রাখেন।

এই সংগে আমি দ্বিতীয় অনুমিতি যোগ করতে চাই : সৃষ্টির দিকে পরিচালিত ক্রমবিকাশ সর্বদায় উৎকর্ষতা যতই উচ্চতরের হচ্ছে, সৃষ্টির পটভূমিতে সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞার অস্তিত্বের প্রমাণ ততই জোরদার হবে।

আমাদের মহাবিশ্বের অবস্থাতনিক ক্রমোন্নতি বিজ্ঞানের সাহায্যে হাতেকলমে এতখানি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাই আমাদের প্রমাণ। “আকারহীন ও শূন্য” মৌলিক কণিকাসমূহের একটি মহাবিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র এবং সম্ভবতঃ তার চাইতে অনেক লক্ষ কোটি গ্রহ সৃষ্টি হয়েছে—যে নক্ষত্র ও গ্রহ নির্দিষ্ট আকারের এবং অবশ্য বর্ণনায়োগ্য। তারপর অপরিবর্তনীয় আইনের অধীনে তাদের অবশ্যজ্ঞাবী সব জীবনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নক্ষত্র ও গ্রহ যে মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত, তারাই অপরিমেয়রূপে ক্ষুদ্র কণিকায় কি করে পরিণত হলো এবং কোন দক্ষতার জন্যে এই জীবন রক্ষা পাচ্ছে, তা সম্ভবতঃ চিরদিনই মানুষের বোধশক্তির বাইরে থাকবে।

ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এর সঙ্গে আমাদেরকে অবশ্য সর্বাপেক্ষা বিশ্বয়কর বিষয় যোগ করতে হবে যে, ঐ সব মৌলিক অপরিমেয়রূপে ক্ষুদ্র কণিকায় মধ্যে সকল প্রকার নীতি বিদ্যমান রয়েছে, যা নাকি শুধু নক্ষত্র ও গ্রহ সৃষ্টি করার জন্যে প্রয়োজনীয়, তা নয়— সেই সংগে চিন্তা ও আকাংক্ষার সক্ষম জটিল আর মনোরম সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী এবং পরিশেষে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দেবতুল্যতার হাতেকলমে মহান প্রমাণ দ্বারা জীবনের মূল রহস্য প্রবেশকারী জীবসহ অব্যুত আকৃতিক জীবন্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন। পারস্যের মহান জ্যোতির্বিদ ও কবি ওমর খৈয়াম তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ‘রুমাইয়াত’-এ সৃষ্টির এই সর্বাপেক্ষা বিশ্বয়কে অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

“মহাবিশ্বের অবস্থাতনের মূলে বিশ্বের অতীত মনীষার এইসব প্রত্যাশা আমার জন্যে আল্লাহর অস্তিত্বের পর্বাণ্ড প্রমাণ। কোন পার্শ্বিক জিনিস আপনা আপনি সৃষ্টি হতে পারে না—এই অনুমিতি ছাড়াই এসব প্রত্যাশা আমার জন্যে যথেষ্ট।”

সামান্য পানি আপনাকে গল্প বলবে

[থমাস ডেভিস পার্কস্ ।। রিসার্চ কমিটি : পি-এইচ, ডি, ইমিনিয়স বিশ্ববিদ্যালয়;
ষ্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রসায়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, বর্তমান কোরর
কেমিক্যাল কোম্পানীর রিসার্চ ডিরেক্টর। মাইক্রো কেমিস্ট্রি ইকোট্রোণিক কেমোমেনা,
রক্তনরশি ব্যাবহেল এবং সিন্থেটিক রেসিন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।]

হুইটেকার চেয়ার্স তাঁর “উইটেনেস” নামক বইয়ে একটি মানুষী ঘটনার উল্লেখ
করেছেন । সম্ভবতঃ এই ঘটনাই তাঁর জীবনের (এবং সম্ভবতঃ মানবজাতির ঘটনারলীর)
মোড় ঘুরিয়ে দেয় । তিনি তাঁর মেয়েকে নির্বিষ্ট মনে দেখছিলেন এবং নিজের অজান্তেই
তিনি মেয়েটির কানের আকারের প্রতি হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন । তিনি আপন
মনে ভেবেছিলেন, কানে এমনি নাজুক কুণ্ডলী সৈবক্রমে সৃষ্টি হওয়া কতই না অসম্ভব ।
একমাত্র পূর্ব কল্পিত নমুনা থেকেই এমনি অপক্লপ জিনিস সৃষ্টি করা হতে পারে । কিন্তু
এই চিন্তা তাঁর মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অজ্ঞেরবাদী মন থেকে ঝেড়ে
ফেলে দিয়েছিলেন । কারণ তিনি সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পর্যায়ক্রমে
যুক্তিসিদ্ধ পরবর্তী ধাপই হবে : এই পরিকল্পনার আগে থেকেই আল্লাহর অভিজ্ঞকে মেনে
নেওয়া—এমশ একটি গবেষণামূলক বিষয়, যা মেনে নেওয়ার জন্য তিনি তখনও তৈরী
হননি ।

আমার অধ্যাপক ও গবেষণা কার্বে তাঁর সহকারী অনেক বৈজ্ঞানিককে আমি
জানি, যারা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার পঞ্জীকৃত বিষয় সম্পর্কে অপক্লপ চিন্তাধারা পোষণ
করে থাকেন । অবশ্য এই কথা সত্যি, হুইটেকার চেয়ার্স নিজকে যেক্লপ হত্যাশার সখাদ
সলিলে নিমজ্জিত বলে উপলব্ধি করেছেন, তারা তেমন কোন গভীর হতাশা থেকে
কোন কথা বলেন নি ।

আমি অজ্জিব এই বিষয়ে, আমার চারিদিকে নিয়ম শৃংখলা আর সুপরিকল্পিত
পরিকল্পনাই দেখতে পাই । আমি বিশ্বাস করিনা আকস্মিকভাবে ও ভাগ্যক্রমে পরমাণুর
একত্রিত হওয়ার কলে সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার চারিদিকে তারা বিরাজ
করছে । তার কারণ মনে করি, পরিকল্পনার জন্য মনীষার প্রয়োজন; আর সেই
মনীষাকেই আমি আল্লাহ বলে অভিহিত করি । সম্ভবতঃ একজন রাসায়নিকের কাছে
মৌলিক পদার্থের পর্যাবৃত্ত খুবই আকর্ষণীয় বিষয় । রসায়ন শাস্ত্রের একজন নবীন
শিক্ষার্থী সর্বপ্রথম যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তা হচ্ছে মৌলিক পদার্থের মধ্যে
এই পর্যাবৃত্তি বা ক্রম । বিভিন্ন প্রকারের এই ক্রমিক বর্ণনা করা হয়েছে এবং
শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভক্ত করা হয়েছে । তবে আমরা সাধারণতঃ এই পর্যাবৃত্তি সারণীর জন্য

বিগত শতকের ক্রম রসায়ন বিজ্ঞানবিদ যেনেদিককে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। এই সারণী শুধু যে জ্ঞাত সকল বৌলিক ও তাদের উপাদান পর্ববেশনের উপায় করে দিয়েছে তাই নয়, অধিক যে সকল বৌলিক পদার্থ আজও আবিষ্কৃত হয়নি, সেগুলি আবিষ্কারের ব্যাপারে সন্ধানকার্য পরিচালনার যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে। সারণীর ক্রমব্যবস্থায় যে শূন্যস্থান বিদ্যমান তাই তাদের যথার্থ অস্তিত্বের বতসিদ্ধতা প্রমাণ করে।

আজকের দিনের রাসায়নিকেরা এখনও অজ্ঞাত নতুন বৌগিক পদার্থের বিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে এবং এই সারের উপাদান সম্পর্কে ভবিষ্যৎজীবীর জন্যে তাদের কাজের সহায়ক হিসেবে এই পর্যাবৃত্ত সারণীর সাহায্যে গ্রহণ করে থাকেন। এই গবেষণা ও ভবিষ্যৎজীবীর ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য অজৈব বিশেষে যে সুন্দর ক্রম বিদ্যমান তারই অদ্রাষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু আমরা আমাদের চারদিকে যে ক্রম দেখতে পাই, তা আদৌ হৃদয়হীন সর্বশক্তিমত্তা নয়। পরোপকারিতার সুকোমল আবরণ এর উপরে বিস্তৃত। ইহা এই কথাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির অনপরিবর্তনীয় আইনাবলীর সঙ্গে আমাদের যতটা সম্পর্ক, বিশেষ কল্যাণ ও আনন্দে ঐশ্বরিক মনীষার সম্পর্ক বা উৎকর্ষা তার চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনাদের চারদিকে যেসব বর্জিত পদার্থ ব্যত্যয় যথার্থই প্রকাণ্ড যুক্তিসিদ্ধ আইনাবলীকে অবজ্ঞা করে, তার দিকে একবার দৃষ্টি দিতে বলছি।

উদাহরণস্বরূপ পানির কথা ধরা যাক। এর সূত্রগত ওজন ১৮। এই থেকে কেউ এই ভবিষ্যৎজীবী করবে যে, সামান্য তাপ ও চাপে পানি গ্যাসে পরিণত হবে। অ্যামোনিয়া-সূত্রগত ওজন ১৭ সেঙ্গেও বায়ুমণ্ডলের চাপে ৩৩ সেঃ তাপমাত্রায় গ্যাসে পরিণত হয়। পর্যাবৃত্ত সারণীতে অবস্থানের দিক থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং এর সূত্রগত ওজন হচ্ছে-৩৪ আর ৫৯ সেঃ তাপমাত্রায় পৌঁছে ইহা গ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে। কিন্তু এমনি সাধারণ তাপমাত্রায় এই যে পানি তরল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে, তা এমনি একটি ব্যাপার যা নাকি মানুষকে একদণ্ড ধমকে দিয়ে ভাবিত করে তোলে।

তবে পানির আরও অনেক করটি বিশেষ ধর্ম রয়েছে যা খুবই চিত্তাকর্ষক এবং এই সকল ধর্ম একত্রিত করলে তা আমার কাছে পরিকল্পনার জোরদার প্রমাণ বলে প্রতীয়মান হবে। সাধারণভাবে বলা চলে, আমাদের পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত পানি-বিস্তৃত। তাই এই পানি তাপমাত্রা ও আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর মারাত্মক রকম প্রভাব সৃষ্টি করে। পানির সবগুলি ধর্মের মধ্যে যদি একটি অনুপম সময় বা থাকতো, তাহলে তাপমাত্রায় যে কি ভয়াবহ পরিবর্তন দেখা দিতো তা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। পানি পল্লব জন্যে অত্যন্ত বেশী তাপের প্রয়োজন হয়। গলে তরল অবস্থায়ও দীর্ঘ সময় থাকে এবং বাষ্পীভবনের জন্যে অত্যধিক তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। এই কারণে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ব্যাপারে পানি আশ্চর্য রকমের অভিঘাত (শক) শোষক; অন্য কথায় তাপমাত্রার জন্যে পানি যে সৃষ্টি প্রতিবন্ধ রয়েছে যদি উক্ত প্রতিবন্ধ না থাকতো

তাহলে এই পৃথিবী জীবনধারণের জন্যে অনেক কম উপযোগী এবং মানুষের কর্মতৎপত্তার জন্যেও অত্যন্ত কম আনন্দদায়ক হতে পারতো।

পানির আরও অনেক অনুশম বিশেষ ধর্ম রয়েছে যা নাকি প্রত্যক্ষ করলেই আমার মন এই ধারণায় সংবেদনশীল হয়ে উঠে যে, নিজ সৃষ্টির প্রতি যথেষ্ট সচেতন সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই একমাত্র এইসব বিশেষ ধর্মের ব্যবস্থা আগে থেকে করা সম্ভব। আমাদের জানা সকল পদার্থের মধ্যে একমাত্র পানিই একটি পদার্থ যা জমাটবদ্ধ হলে ওজনে আরো হালকা হয়। জীবনধারণের জন্যে এইজন্য অস্বাভাবিক বরকম গুরুত্বপূর্ণ। এই একটি মাত্র কারণে বরফ, হ্রদ বা নদীর তলদেশে তলিয়ে না যেয়ে পানির উপরে বরফের এই আবরণ, অন্তরকের কাজ করে। ফলে আবরণের নীচেকার পানির তাপমাত্রা সব সময় হিমাকবিন্দুর অধিক থাকে। গাছ ও অন্যসব জলজ প্রাণী এই কারণে রক্ষা পায়। আবার বসন্তকালে উক্ত বরফের আন্তরণ তাড়াতাড়ি তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

এই অতি সাধারণ পদার্থে পানির অন্যান্য অনেক চমৎকার সব বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, পানির উপরিভাগের অত্যধিক টেনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকার ফলে তা মাটির মধ্যদিয়ে উদ্ভিদের পক্ষে পুষ্টিকারক পদার্থ এক জারগা থেকে অন্য জারগায় পরিবহণ করে উদ্ভিদ জন্মাতে সাহায্য করে। পরিবর্তনীয় দ্রবীভূত করার ক্ষমতা বিদ্যমান এবং তাই দ্রাবক হিসেবে জানা পদার্থগুলির মধ্যে পানি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রাবক এবং এই কারণেই আমাদের দেহের জীবন-প্রক্রিয়ার আমাদের রক্তের প্রধান উপাদান হিসেবে পানি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। তাপমাত্রার এক অতি বিস্তৃত পরিসরের উপর পানির অত্যন্ত বেশী বাষ্পীয় চাপ বিদ্যমান সত্ত্বেও প্রাণের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ পরিসরের মধ্যে পানি সর্বত্র তরল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

অনেক বৈজ্ঞানিক পানির এইসব আশ্চর্যজনক বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং যে সব প্রশ্নক তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই বিষয়ে তাঁদের খিওরীও দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু যদিও আমরা সম্পূর্ণ বিষয়ের 'কি করে' এই প্রশ্নের জবাব বুঝতে শিখব, তাহলেও আমাদেরকে তখনও এই বিষয়ের 'কেন'র জবাব খুঁজতে হয়। আর পানিই একমাত্র আশ্চর্যজনক পদার্থ নয়। অন্যসব পদার্থের মধ্যে কোন সংখ্যার অনেক পদার্থ পাওয়া যাবে, যা নাকি পানির মতই এত অসাধারণ যে, আমাদের সীমাবদ্ধ মানব মনের তা দেখে ধমকে না যেয়ে উপায় নেই। তারপর ধীরে ধীরে অতিনিঃশব্দে এইসব অসাধারণত্বকে সম্মান দেখানোর জন্যে আরাধনাকালের মত অজ্ঞান্তে আমাদের নতজানু হতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে এইসব আশ্চর্যজনক বিষয়ের জন্যে আমি আমার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছি। অত্যন্ত সন্তোজনক ব্যাখ্যা। প্রকৃতির এই জনমের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার এবং এ পরিকল্পনার জন্যে বর্ণনা দিতে যেয়ে এর সব কিছুর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারীর মধ্যে আমি একটি শাস্ত সমাহিত যুক্তিবৃত্ত পরিকল্পনার পরিচয় পাই। আমি এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার তাঁর সৃষ্টির প্রতি এক গভীর উদ্বেগ, বস্তুার্থ প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা প্রত্যক্ষ করি।

প্রকৃতির জটিলতা ও আল্লাহ

[জন উইলিয়াম ক্রুট্‌ব । সুপ্রজননবিদ্যাবিদঃ পি-এইচ, ডি; পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বি, ডি, কনকর্ডিয়া সেমিনারী । ১৯৪৫ থেকে কনকর্ডিয়া টিচার্স কলেজের জীববিদ্যা, শরীরবৃত্ত এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বিষয়ের অধ্যাপক । জেনেটিক্‌স এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য । হ্যাবরোব্রেকন ও মরমোনীনা, বাতব বিদ্যা, লেখাল ও আধা লেখাল প্রভৃতি জাতি বিশেষের জন্য ৩ বংশ সঙ্করীয় বিদ্যালয় বিশেষজ্ঞ ॥

যে বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চলেছি, তা বিবেচনা করতে গেলে সংগে সংগে পুরাতন পবিত্র সত্যার্পণ মনে জেগে ওঠে—

: স্বর্ণ আল্লাহর মহিমা প্রচার করে এবং আসমান প্রকাশ করে আল্লাহর কারুকার্য ।

মূর্খের অন্তর রলে আল্লাহ নেই ।

আমাদের এই পৃথিবী এতই জটিল ও এতই দুর্বোধ্য যে, এর পক্ষে দৈবক্রমে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাব্যতা খুবই কম । এ বিশ্ব এত জটিলতার সমাচ্ছন্ন যে, এইসব জটিলতা সৃষ্টির মূলে অত্যন্ত বিচক্ষণ সত্তার প্রয়োজন, এ এক অক্ষ অদৃষ্টের বা দৈবের কাজ নয় । বিজ্ঞান যথার্থই আমাদেরকে এইসব জটিলতা উপলব্ধি করতে ও সেই সংগে হৃদয়ঙ্গম করিতে সহায়তা করে পরোক্ষভাবে আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান বাড়িয়েছে এবং এই জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে ।

এইসব জটিলতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ সম্পর্কে কতিপয় চিন্তাকর্ষক জটিলতা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে । এর মধ্যে সব চাইতে পরিজ্ঞাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, উচ্চা পতংগ ও উচ্চা উদ্ভিদ বা তার সঙ্গে স্পেনীয় বেয়নেটের চিন্তাকর্ষক সম্পর্ক । উচ্চা ফুল নীচের দিকে ঝুলে থাকে এবং গর্ভকেশর বা ফুলের স্ত্রী-অংশ পুংকেশরের বা ফুলের পুরুষ অংশের নীচের দিকে থাকে । তবে গর্ভমুণ্ড বা ফুলের যে অংশটি পরাগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে কাজ করে থাকে তা রাটির আকৃতি বিশিষ্ট হয় । কিন্তু এখানে এমনি ব্যবস্থা যে, পুংকেশর থেকে এতে পরাগ পড়া একেবারেই অসম্ভব । তার পরিবর্তে স্ত্রী উচ্চা উচ্চাপতংগকে পরাগ পরিবহনের কাজ করতে হয় এবং স্ত্রী উচ্চা পতংগ ঠিক সন্ধ্যার পর পরই তার এই কাজটি শুরু করে । সে উদ্ভিদের পরাগ কোষ থেকে বেশ কিছুটা পুষ্পরস গ্রহণ করে এবং তার মুখের সম্মুখভাগে বিশেষভাবে তৈরী অংশে সেই পুষ্পরস ধরে রাখে । তার পর সে উড়ে বেয়ে আরেকটি উচ্চা ফুলে বসে এবং তার ডিম্বাশী দিয়ে ডিম্বকোষ ভেদ করে । সেখানে সে একা বা একাধিক ডিম দিয়ে গর্ভদণ্ড বেয়ে নিচে নেমে যায় এবং মুখের পরাগে ছোট বলটি

গর্তমুণ্ডের মধ্যে এঁটে দেয়। তারপর উদ্ভিদ বহু বীজ জন্মায়। উক্ত পতঙ্গের শুককীট কিছু বীজ খেয়ে কেলে এবং কিছু বীজ উদ্ভিদের বংশকে জিইয়ে রাখার জন্য ক্রমে উকা উদ্ভিদে পরিণত হয়।

আমেরিকার বাজারে কল হিসাবে এক রকম ডুমুর পাওয়া যায়। এই ডুমুরও এক শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বোলতার সম্পর্কে কতকটা একই রকম অবস্থার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ডুমুরের দুই প্রকারের পুষ্পগুচ্ছ জন্মে। এক গুচ্ছ পুরুষ ও স্ত্রী ফুল দুই-ই থাকে। আরেক গুচ্ছ থাকে কেবল স্ত্রী ফুল। উভয় গুচ্ছই স্ত্রী বোলতা দ্বারা পরাগাগ্রিত হয়। এই পুষ্প গুচ্ছের মুখ উপর্যুপরি স্থাপিত শব্দের সাহায্যে প্রায় এক রকম বন্ধ থাকে। তাই অতিক্রম্য স্ত্রী বোলতা যখন প্রবেশ করতে যায় তখন তার ডানা দেখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের গুচ্ছের ভিতর প্রবেশ করার পর স্ত্রী বোলতা ফুলের মধ্যে ডিম দেয় তারপর মরে যায়। এই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় ও বাচ্চা বোলতারা পরস্পরের সংগে মিলিত হয়। একমাত্র স্ত্রী বোলতাই ফুলের গুচ্ছ পরিত্যাগ করে বের হয়ে আসতে পারে। পুরুষ বোলতা সব জন্মস্থানেই মরে যায়। ফুলের গুচ্ছ থেকে বেরিয়ে আসার আগে স্ত্রী বোলতাদের গায়ে পরাগ মেখে যায়। তাই নিয়ে সে অন্য পুষ্প গুচ্ছ প্রবেশ করে। যদি এবারও সে পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের গুচ্ছের ভিতর প্রবেশ করে, তাহলে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু যদি সেই গুচ্ছ কেবল স্ত্রী ফুল থাকে তাহলে ডিম না দিয়েই স্ত্রী বোলতাকে মরতে হয়। কারণ, এই ক্ষেত্রে স্ত্রী ফুল এত লম্বাটে হয় যে, ডিম দেওয়ার জন্য সেই ফুলের তলদেশে পৌঁছান তার আর ভাগ্যে হয় না। তবে ফুলের তলদেশে পৌঁছার চেষ্টা করতে গিয়ে স্ত্রী বোলতাগুলি তাদের দেহের পরাগ খুব ভাল করে এই ফুলের গায়ে মেখে দেয় এবং তার ফলেই শেষ পর্যন্ত পাকা ডুমুর পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম যখন ডুমুর আনা হলো, দেখা গেল তা থেকে ডুমুর কল পাওয়া যায় না। তারপর এই বোলতা আমদানী করার পরই ডুমুর শিল্প লাভজনক ব্যবসা হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছে।

জেল-ফুল, যেমন জ্যাক-ইন-দি -পালপিট ফুলে আরো অদ্ভুত রকম ব্যাপার ঘটে। এই উদ্ভিদের দুই প্রকারের ফুলের গুচ্ছ রয়েছে— পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের গুচ্ছ। পালপিটের মধ্যে এই ফুলের গুচ্ছ জন্মে এবং পালপিটের নীচের দিকে ঠিক মাঝখানটার সংকোচনের ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণতঃ এক রকম ক্ষুদ্রাকৃতি মাছির সাহায্যে এই ফুলের পরাগ সংযোগ ঘটে। উক্ত মাছি সংকোচন ব্যবস্থা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, তারপর কিরে দেখে তার বেরোবার প্রাণ বন্ধ হয়ে গেছে। তার নির্গমন পথে ঐ সংকোচন ব্যবস্থাই যে শুধু একমাত্র অন্তরায় তাই নয়— পালপিটের চতুষ্পার্শ্ব সোজের মত পিচ্ছিল হয়ে থাকে। তার বেরোবার জন্যে মাছি কোথাও পা আটকে জোঁর করতে পারে না। তাই সে ভিতরেই প্রাণপণে বোঁ বোঁ করে উড়তে থাকে, ফলে তার সারা দেহে

পুষ্পরেশু লেগে যায়। অল্পকালের মধ্যেই পালপিটের পা অসুস্থ হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত মাছি পরাগ-মাখা অবস্থার কোনরকমে বৃকে হেঁটে বেরোতে পারে। যদি এরপরও সে বেয়ে আরেকটি পুরুষ ফুলের গুচ্ছে প্রবেশ করে তাহলে একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু যদি সে স্ত্রী ফুলের গুচ্ছে পৌঁছায় তাহলে সম্ভবতঃ তার অদৃষ্টে আর বের হওয়ার ঘটে না। বেরোবার জন্যে এখানেও সে ফুলের মধ্যে প্রাণপণে বোঁ বোঁ করে উড়ার কলে তার গায়ের সব পরাগ সারা ফুলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এইবার তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে উদ্ভিদের ভেতন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। প্রথমে উদ্ভিদ তার নিজের স্বার্থের খাতিরেই তাকে পুষ্পরেশু পাঁরে সেখে পুরুষ পালপিট থেকে বেরোবার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে হয় স্ত্রী ফুলের ভিতর থেকে মাহির বের হবার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে উদ্ভিদের আর কোন উৎকণ্ঠা নেই।

এই দৃষ্টান্তগুলির সব কটিই আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এইসব ব্যাপার অল্প দৈবের কলে সংঘটিত হয়েছে এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এইসব ব্যাপার একমাত্র আল্লাহর নির্দেশকারী হাতের ও তাঁরই সৃজনী কবিতার বলেই সম্ভব হয়েছে।

যেখানে মানুষ প্রকৃতির ভারসাম্যের পরিবর্তন আনতে গিয়ে শুধু সেই সমতায় বিশৃংখলা আনয়ন করে তাই নয়, সেই সঙ্গে নিজেদেরও বিপর্যয় ডেকে আনে; সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এর আরও প্রমাণ দেখতে পাই।

প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা যখন অস্ট্রেলিয়ার গেলেন তখন তারা দেখতে পেলেন, ডিহলো বা বুনো গরুর ছাড়া সেখানে আর কোন অমরজাত স্তন্যপায়ী জীব নেই। ইউরোপ থেকে আগত এইসব বসতি স্থাপনকারীদের স্মৃতিপটে তখনও খরগোশ শিকারের কথা ভাবর হয়ে আছে। তাই ১৮৫৯ সালে থমাস অস্টিন নামে এক ব্যক্তি প্রকৃতির মধ্যে এই অভাব দূর করার জন্য প্রায় ২৪টি ইউরোপীয় খরগোশ অস্ট্রেলিয়ার আমদানী করলেন। পরিশেষে অত্যন্ত শোচনীয় হল, কারণ খরগোশের বংশবৃদ্ধিরোধ করার জন্যে তখন অস্ট্রেলিয়ার কোন প্রাকৃতিক শত্রু ছিল না। তাই আশাতীতভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হল এবং যে ঘাস খেয়ে অস্ট্রেলিয়ার বেঙ্গপাল জীবনধারণ করতো তার সবই খরগোশেরা নষ্ট করে ফেললো। সর্বপ্রথম খরগোশের চলাকোয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই মহাদেশের কুইন্সল্যান্ডে দীর্ঘ ৭,০০০ মাইল খরগোশ-পুক বেড়া তৈরী করা হলো। কিন্তু দেখা গেল, এতে ভেতন কোন উপকার হচ্ছে না। তার কারণ খরগোশেরা বেড়ার ভিতর দিয়েই তখন ঢুকতে আরম্ভ করেছে। তারপর চললো পারিতোষিকের ভিজিতে খরগোশ নিধন অভিযান। কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হলো। কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালে এর একটা সমাধান পাওয়া গেছে এবং তা হচ্ছে, মিক্সোমেটরিস নামক এক প্রকার জীবাণুর সাহায্যে সংক্রামক রোগের প্রবর্তন। এই রোগে ব্যাপকহারে খরগোশের মৃত্যু হয় এবং তাদের সংখ্যা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলা চলে না। কারণ, আজকাল আমরা জানতে পাই, অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ রোগজীবাণু প্রতিরোধকারী খরগোশও নাকি দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, বর্তমানে এদের

সংখ্যা যতটা হ্রাস পেয়েছে তার ফলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কল্পনা সাধিত হচ্ছে। এক কালে যে গ্রহরী অঞ্চল করণের দরুন ধ্বংস হয়েছিল, পাহাড়গুলির গায়ে মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি, এখন সেখানে সবুজ তৃণরাজি ছেয়ে গেছে। ১৯৫২-৫৩ সালে একমাত্র যেশ-শিল্পে উৎপাদনের আয় প্রায় ৮৪,০০০০,০০০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ খরগোশের সমস্যা থাকা খুবই স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্রে যে জাতের খরগোশ রয়েছে, ইউরোপীয় খরগোশ তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটনের উপকূল ভাগের অদূরে কেবলমাত্র সানজুয়ান বীশেই এই জাতের খরগোশ পরিচিত ছিল। ১৯০০ সাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবেই এই খরগোশ সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইতিপূর্বে যদিও আন্তঃস্টেট কন্টেন্টেল আমদানী সম্ভবপর ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা আর সম্ভবপর নয়। তাই সম্প্রতি সংউদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কতিপয় খেলা-ধুলার ক্লাব এই ইউরোপীয় বা সানজুয়ান খরগোশ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে চালু করার চেষ্টা করেন। এর পরিণাম সহজেই মারাত্মক হতে পারতো, যেহেতু অট্রেলিয়ার মত সানজুয়ান খরগোশেরও যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হতো। এই বংশবৃদ্ধি রোধকল্পে একটি স্টেটের শিকার কমিশন সানজুয়ান খরগোশ শিকারের উপর থেকে সব রকম বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়েছেন। এখন সারা বছরই এই খরগোশ শিকার করা চলে।

এদিকে আবার ইউরোপে খরগোশ মারার জন্যে যে রোগজীবাণু সংক্রমণের ব্যবস্থা করা হয়, তার ফলে সেখানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে তা লক্ষ্য করা খুবই মজার ব্যাপার হয়েছে। একজন ফরাসী ডাক্তার তাঁর বাগান খরগোশে নষ্ট করায় অতিষ্ঠ হয়ে এই রোগজীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন, তারপর তিনি বন্দী কতকগুলি খরগোশের দেহে ইনজেকশনের সাহায্যে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এবারে তিনি খরগোশগুলিকে ছেড়ে দিলেন। ফলে শুধু যে ভ্রাণ তাই নয়, সেই সংগে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতেও মারাত্মক রকমভাবে খরগোশের সংখ্যা হ্রাস পেল। ফলে সামগ্রিকভাবে কতটা ক্ষতি হলো, তা তখনও অনুমিত হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই সব স্থানে গোস্ত সবরারের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কারণ ইতিপূর্বে সাধারণ মানুষ এই খরগোশ খেতো এবং খাদ্য হিসাবে খরগোশের উপর তাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হতো। অপর পক্ষে, সজী বাগানে উৎপাদন অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষতির চাইতে লাভ বেশী হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

একটু আগে সত্যি যে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে তারই প্রমাণ বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। এইমাত্র যে বিষয়টি উল্লেখ করা হলো, তা আল্লাহর জ্ঞানের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। প্রকৃতিতে তিনি যে ভাবসাম্য রক্ষা করেছেন তা অত্যন্ত নাজুক এবং মানুষ মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি বীকার করে নিয়ে তবেই তাতে হস্তক্ষেপ করে। প্রকৃতির ভাবসাম্যে উন্নতি বিধান করতে গেলে মানুষকে স্বাভাবিকই পূর্বাপর ভেবে বিধাহিত হতে হয়। কারণ প্রকৃতির আল্লাহর তুলনায় সে স্পষ্টই দেখতে পায়, মানুষের বুদ্ধিমত্তার কোন স্থানই হতে পারে না।

আমাদের মুখোমুখি অত্যন্ত অপরিহার্য প্রশ্ন

[অসকার পিও ব্রটনার। পদার্থ বিজ্ঞানবিদ ও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ : এম, এস-সি, সি-এইচ, ডি, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২৬ থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে স্টেট কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। জৈবিক রসায়ন, সিনেকোনানের বিবক্রিয়ায় হার, কসফরাসের সরেল-এনালাইসিস ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ ॥

এই প্রবন্ধকারের বিশ্বাস, আমাদের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে জড় পদার্থের উৎপত্তির প্রশ্ন। আমরা জড় পদার্থের উৎপত্তি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা খুঁজে পাই তারই উপর যে কোন জীবন দর্শন স্থাপিত হয়ে থাকে।

আসুন, আমাদের আবাসভূমি এই গ্রহ বা পৃথিবীর দিকে একবার আমরা ভাল করে তাকিয়ে দেখি। কোন মানুষই সুস্থ মন নিয়ে এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে না—অস্বীকার করবে না অবশিষ্ট বিপুল নক্ষত্রে ভরা এই মহাবিশ্বকে। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করছি যা নিঃসন্দেহে 'বাস্তব'।

এই পৃথিবী ধারণাভীত রকমের বিশাল একটি পিও, যার ওজন মহাপদ্মকে ৬,৬০০ মহাপদ্ম দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যাবে প্রায় তত টন হবে। এক মহাপদ্ম বা মহাপদ্মকে মহাপদ্ম দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল দাঁড়াবে তার কথা দূরে থাক, এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ যে কত মানুষের মত তা অনুমান করতে কেউ পারে কিনা তাই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দিন বছর দৈনন্দিন কাজের শেষে সোন্ডাসে বলে, "আরেক দিনে আরেক ডলার, এক মিলিয়ন দিনে এইভাবে তার হবে এক মিলিয়ন ডলার।" কিন্তু হায়, সে একথা খুব কমই উপলব্ধি করে যে, এক মিলিয়ন দিন মানে হচ্ছে ২৭৪২ বৎসর এবং তার মধ্যে আবার একটি দিনও ছুটি নেই।

এই যে কল্পনাভীত ভাবী জড়পিও যাকে আমরা পৃথিবী বলি, তার সব জড় পদার্থ কোথা থেকে এসেছে?

আর তারপর, আমাদের সৌরজগতের অন্যান্য সকল গ্রহের জড়পিণ্ডের কথা একবার বিবেচনা করুন। সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সদস্য সূর্য পৃথিবীর চাইতে ৩৩০,০০০গুণ বেশী, মহাপদ্মকে ৬,৬০০ মহাপদ্ম দিয়ে গুণ করে তাকে আবার ৩৩০,০০০ দিয়ে গুণ করলে যে ওজন পাওয়া যাবে, তত টন ভারী। আমাদের ছায়াপথে কমপক্ষে এক মহাপদ্ম সংখ্যক সূর্য রয়েছে, যাদের গড়পড়তা ওজন আমাদের সূর্যের

গাইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী হবে। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদগণ আবার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের এই কথাই বলেছেন যে, আমাদের হারাপথের মত অন্ততঃপক্ষে একশ' হাজার হারাপথ রয়েছে। সে বাই হোক, এ কথা সত্য যে, অমৃত সংখ্যক বিশালাকৃতির আসমানি গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। এইসব জ্যোতিক মিলে মোট কত টন জড়পিণ্ড হতে পারে? এ সম্পর্কে কেবল চিন্তা করলেই হতবুদ্ধি আর স্তম্ভিত হতে হয়। তারপর কি-করে এইসব জড়পিণ্ড, এই অমৃত সংখ্যক বিশালকার সব জ্যোতিক জন্মান্ত করলো? এই সকল প্রশ্নের শুধুমাত্র দু'টি সম্ভাব্য জবাব হতে পারেঃ হয় এগুলি আবহমানকাল থেকে অবস্থান করছে, আর না হয় এগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রথম জবাবের ক্ষেত্রে, আমরা একটি মিথ্যা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হচ্ছি। জড়পদার্থের মৌলিক বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পদার্থের পরিবর্তন, বৃদ্ধি এবং উন্মুক্ত রয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিশ্চয়ই জড়পদার্থের সূচনা নির্দেশ করে। দ্বিতীয় জবাব সম্পর্কে বলা যায়, সৃষ্টি সম্পর্কে সকল মুণ্ডেই ব্যাপক মতবৈধতা বিদ্যমান রয়েছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বেসব মতবাদ, ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে, তাকে অতি সহজেই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

প্রথম, পৌরাণিক কাহিনী অবশ্য সম্পূর্ণ মানুষের কল্পমাত্রসূত। এতদসম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীগুলি এমনি নির্দেশ করে থাকে যে, মানুষের চেতনায় এমন কিছু আছে বা নাকি মানুষকে আদিম সত্যের দিকে, যে অতিমানবীয় ঐশ্বরিক শক্তি এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়, এর মূলে ঐতিহ্য রয়েছে। এতে রয়েছে বংশ পরম্পরায় মানুষের কাছে পৌছেছে এমনি সৃষ্টির ঘটনা সম্পর্কিত কাহিনী ও বিবরণ। যদিও এই বিবরণ খুব অবহেলা করে গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি একথা সত্য যে, এই সমুদয় বিবরণে অনেক তথ্য রয়েছে যা নাকি আমাদের কাছে জেনেসিস বা বাইবেলের শুভ টেটামেন্টের প্রথম পুস্তকে বর্ণিত রিপোর্ট সম্পর্কে জোর করে স্বপ্ন করিয়ে থাকে।

তৃতীয়, এই ভাগে রয়েছে দর্শন। মানুষের মধ্যে যারা গভীর চিন্তাশীল, তারা জড়পদার্থের উৎপত্তি সম্পর্কে দার্শনিক প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং প্রকল্প অনুসারে তাদের চিন্তাধারাকে কার্যকরী করেন। যদি কখনও তাদের এইসব প্রকল্প অন্যকোন চিন্তাবিদে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহলে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানাহরণের ব্যাপারে সেগুলি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার নির্ভরযোগ্য কল হিসাবে গৃহীত হয়। অগণিত হোটখাট বিদ্যান ও শিক্ষক সেই প্রকল্প অনুকরণ করেন।

চতুর্থ, এর মূলে প্রাকৃতিক ও জীববিদ্যা বিজ্ঞানও রয়েছে। আমরা জানি, প্রাকৃতিক ও জীববিদ্যা বিজ্ঞানে মানুষ ও প্রকৃতির কঠিনতম বিষয় নিয়ে কাজ-কর্মবার করে। তারা পরীক্ষা করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার জন্য খণ্ড খণ্ড করে কাটে, পরস্পরের

মধ্যে ডুলনা করে—তারা তাদের অপ্রোপচারের ক্ষুদ্র তারকাটি এবং উচ্চকমতা বিশিষ্ট লেনটি জড়পদার্থের অস্তিত্বের সবচাইতে আদিম রূপ-ভূণের গভীরে নিয়ে যায়, তারা পরিমাপ করে, হিসাব করে, এবং তাদের নাজুক, জটিল ও বিশালাকৃতি যন্ত্রপাতি মহাশূন্যে উঠে যায়, তারা প্রকৃতির ইতিহাস ও নিয়মাবলী কাজের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে এবং এইভাবে অন্য উপায়ে সকল জড়পদার্থ কি করে সৃষ্টি হলো সেই সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ সত্য বের করার জন্যে চেষ্টা করে।

পঞ্চম, বিশেষ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশে (বাইবেলের শেষ গ্রন্থ) রয়েছে, এক কথায় তারই নাম হচ্ছে বাইবেল। বিজ্ঞান এক স্বর্গীয় মনীষা এবং এক স্বর্গীয় ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সংগে সংগে এই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারে যে, কোন এক সময়ে একটি সৃষ্টিধর্মী কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। বিজ্ঞান একথাও প্রমাণ করতে পারে যে, মহাবিশ্বের সংগে সম্পর্কিত বিশাল ও জটিল সব নিয়ম-কানূনের এক স্বর্গীয় মনীষা ছাড়া অন্যকেউ প্রণেতা বা সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু একদ্বারা বাইবেল, এ স্বর্গীয় মনীষা ও ক্ষমতাকে আদ্বা বলে উল্লেখ করতে পারে.... যে আদ্বাহ্ সঙ্ক্ষে আমরা অধিকাংশই নেহারেড ছেলেবেলা থেকে জানতে আরম্ভ করেছি—যে আদ্বাহ্ অবিসংবাদিত ও সর্বশক্তিমান স্বীকৃত মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

মহাবিশ্বের বিশাল আকার এবং নক্ষত্রমণ্ডলী ও অগণন সংখ্যা ও কল্পনাভীত জড়পণ্ডের ওজন সম্পর্কিত আমাদের আলোচনার কিরে এসে এবং এই সকল নক্ষত্র ও গ্রহ পরিচালনাকারী আইনাবলীর বিধিত্বের কথা চিন্তা করে—যখন দেখি, আমাদের কমিউনিষ্ট বন্ধুরা, যাদের নিয়ে গোটা মানবজাতির একটা বিরাট অংশ গড়ে উঠেছে। তারা 'আদ্বাহ্ যে আছেন' এই চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, তখন সত্যিই অদ্ভুত লাগে নাকি? অকমিউনিষ্ট বিশ্বেরও শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ আদ্বাহ্কে অবজ্ঞা করে প্রকারান্তরে আদ্বাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছেন দেখলে তাও তেমনি অদ্ভুত লাগে নাকি?

সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আদ্বাহকে স্বীকৃতি দান এবং তার ফলে মহাবিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে আদ্বাহকে মেনে নেওয়ার মাত্র একটি অর্থ থাকতে পারে, তাহলো মানুষের প্রতি অমানুষী আচরণের পরিসমাপ্তি। এর অর্থ হবে, মানুষের মধ্যে নতুন প্রেরণা, একটি সংবেদনশীল বিবেক এবং একটি শুদ্ধ সিদ্ধান্তের অস্তিত্ব। এর অর্থ হবে, প্রেম আর পবিত্রতা।

নাট্যিকতার অর্থ হচ্ছে স্বপ্ন আর যুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি এর কোনটিই চাই না। কিন্তু হিসাবে আমি নাট্যিকতাকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করি। বাস্তব দিক থেকে আমার মনে ইহা যারাম্বক কৃতিকর।

শ্রেণী জড়বাদ চলবে না

ইরতিং উইলিয়াম নবলচ। প্রকৃতি বিজ্ঞানী : এম, এ, বাফেলা বিশ্ববিদ্যালয়।
পি-এইচ, ডি, আইওয়াস্টেট কলেজ। ইউ এস মৎস্য ও বুনো প্রাণী সার্ভিসের বিশেষজ্ঞ।
১৯৪৫ থেকে মিচিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক। উদ্ভিদের
সাইটলজি মরফলজী ও অ্যাপারটলজী বিশেষজ্ঞ ॥

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যারা তাদের নিজ নিজ বিষয়ের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় “তাড়িত হন”, তারা বিজ্ঞানকে সকল প্রকার সমস্যা সমাধানে সক্ষম বলে মনে করতে অভ্যস্ত হন, এ আর বিচিত্র কি! তাদের কাছে জীবন রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক আইনাবলীর কার্যকরণের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। যে সব প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ইতিপূর্বে অলৌকিক শক্তির ফলে সংগঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হতো, তাকে তারা একের পর এক করে সুন্দরভাবে জ্ঞাত করান ও তার ফল অনুযায়ী সাজিয়ে নিতেম। তাদের কাছে এই বিশ্বে কোন উদ্দেশ্য বর্তমান নেই এবং তা গতিবিদ্যা (হিট-মেকানিকস্)-এর দ্বিতীয় আইন মেনে নিয়ে এ বিশ্বের সব কিছুর পরিসমাপ্তি হবে, আমাদের সৌরজগতের সকল ভাণ বিকিরণ করে সবকিছু শীতল হয়ে নিশ্চুপ হয়ে পড়বে।

প্রকৃতির এই চরম জড়বাদী দৃশ্যকে বার্ট্রান্ড রাসেল সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, “মানুষ কারণের ফল। এইসব কারণ পরিশেষে যেখানে পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে উক্ত কারণসমূহের কোন পূর্বজ্ঞান নেই। অর্থাৎ মানুষের জন্ম, তার বৃদ্ধি, তার আশা ও ভয়, তার ভালবাসা ও বিশ্বাস ওধুমাত্র পরমাণুর আকর্ষিক বিন্যাস বই আর কিছু নয়। কোন দিনই আশুন, পরাক্রম, চিন্তা ও অনুভূতির গভীরতা কোন মানুষকে কবরের আকর্ষণের বাইরে রাখতে পারবে না। সকল বয়সের সকল শ্রম, সকল একনিষ্ঠতা, সকল শ্রেষণা, মানব প্রতিভার মধ্যাহ্নের খরদীপ্তি সবই সৌরজগতের বিশাল মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হতে বাধ্য। মানুষের জিন্মাকর্মের মহান সৌধ ধসে পড়বে এবং এই বিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নীচে তা চাপা পড়তে বাধ্য। এইসব ব্যাপার যদিও বিতর্কের অতীত নয়, তবুও এইগুলি এতই নিশ্চিত ব্যাপার যে, এদের অস্বীকার করে কোন দর্শনই দাঁড়াবার আশা করতে পারে না।” তবে সকল বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান মনে করেন না। মনে করেন না যে, ইহা সবকিছু পরিমাপ বা এর পিছনে কি কারণ আছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে; সত্য, সৌন্দর্য বা সুখের আসল-নকল পরীক্ষা করতে পারে। বিজ্ঞান জীবনকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিজ্ঞান জীবনের উদ্দেশ্য কি তার আবিষ্কার করতে পারে না। আত্মাহু আছেন বা আত্মাহু নেই, বিজ্ঞান এর কোনটাই প্রমাণ করতে পারে না।

বিজ্ঞানের সংগে শুধুমাত্র এর বিভিন্ন খণ্ডের উন্নতির সম্পর্ক বিদ্যমান। বিজ্ঞান খণ্ডের বাস্তবতা ও সত্যতায় পৌছানোর চেষ্টা করে; কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষা যতই অগ্রসর হয়, ততই সেগুলি আলোর মত দূরে সরে যেতে থাকে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ, উপলব্ধিও তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে অনিপুণভাবে নির্মিত, আমাদের সব যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ ও প্রাথমিক অস্ত্রার ওয়েনডেল-এর উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক সময় বলেছিলেন যে, জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ত্রুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সংগে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সজবনাময় করে তোলে।

অনেক জড়পদার্থের অতিশয় ক্ষুদ্র পরমাণু বিদ্যমান আছে বলে আমাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান সেগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে কোন প্রকার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দানে সক্ষম নয়। কিন্তু পরমাণু আর অণু প্রাণ সৃষ্টি করার জন্যে একত্রে মিলিত হয়েছে, কেবলমাত্র দৈব আইনের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান কিছুতেই তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এই খণ্ডের যুক্তিহীন একত্বের মী নিয়ে বলে যে, দৈব পরিব্যক্তি, পুনঃপ্রকটীকরণ এবং অতিক্রম দেহব্যব থেকে উদ্ভূতই বা দোআঁশলাজাত প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবনের সকল উন্নততর আকার তাদের বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে ও এই খণ্ডের মীনে নেওয়ার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন—যে বিশ্বাস অযৌক্তিকতাকে স্বীকৃতি দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যথার্থই বিজ্ঞান ঈমানের দাবীদার—যে ঈমান হচ্ছে ইব্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস, কার্যকরণ ব্যবস্থায় বিশ্বাস, কর্তৃত্বে বিশ্বাস এবং সজবনা বা দৈবের প্রতি বিশ্বাস। যদিও বিজ্ঞান তার নিজের আওতার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নিজস্ব বিশ্বাস বা ধারণাকে দমন করতে পারে, তথাপি একটি বিশেষ অর্থে এখানে বলা চলে যে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও ধর্ম একই ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান তার বিরামহীন আত্মসমালোচনা দ্বারা জ্বলের সজবনাকে এক রকম উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাস সমর্থিত ও সুদৃঢ় হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের মাধ্যমে, বাইবেলে উল্লিখিত অনেক উক্তিই—“আমাদের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে (ঈসা)” কে যথার্থ প্রতিপালন করা হয়েছে এবং আমরা যুক্তিযুক্তভাবেই অনুমান করতে পারি যে, আরো অনেক প্রত্যাশাই এমনভাবে সত্য বলে প্রমাণ করে। জ্যোতির্বিদ্যা সেই অতি দূরবর্তী অতীতের সূচনার দিকে নির্দেশ করে। এবং পদার্থবিদ্যা চরম ধ্বংসের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে যে, এই মহাবিশ্ব আবহমানকাল থেকে বিদ্যমান অথবা চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। এই মহাবিশ্বের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিজ্ঞান একটি এবং এই ব্যাপারে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পূর্ণ একমত।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজ্ঞান কখনো প্রকৃতপক্ষে আত্মাহুর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারে না বা আত্মাহুকে বুঝতে পারে না। তথাপি মহাবিশ্বের অনেক বিষয় নিরূপক জ্যোতির্বিদকে এইরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলেছে যে, অজানা কেউ অথবা সম্ভবতঃ থাকে কোন দিনই আনা যাবে না, এমনি কেউ এই বিশালত্ব আর এমনি আপাতপ্রতীকমান নিরূপ-শৃংখলার জন্যে দাঁড়ী। ক্যান্ড ওয়ালশ একবার বলেছিলেন, “আস্তিক বা নাস্তিক যে কোন ব্যক্তিকে বা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন দেখা যাবে, সে সব সময় সম্ভবনার ডুলাদও তার দিকেই বুক্ আছে, এইটিই দেখাতে চাইবে।” ইহা অবশ্য বিষয়টিকে শেখ করার জন্যে অবিবেচক পন্থায় সমস্যার প্রতি খামখেয়ালী করে সমাধানের জন্যে এসিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ধ্যাস মিলার করসীধ অনেকখানি যুক্তিযুক্ত পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁর চিন্তাধারা যেমন সুগভীর, তেমনি সুদূরপ্রসারী। তিনি বলেন, “আত্মাহুর অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ বা মানুষের মন বা কিছু জানতে পারে তা অবশ্যই আত্মাহু সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতার ফল। অভিজ্ঞতাকে প্রথমে আসতে হবে; জ্ঞান কেবলমাত্র সেই অভিজ্ঞতার বিশদ ব্যাখ্যা হতে পারে।”

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার নিজের কথা হচ্ছে, আমি কখনও দৈবের বিধান সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। তার কারণ, আমি এইসব বিধান, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক পর্যায়ে কার্যকরী হতে দেখি। জড়বাদকেও আমি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করি না। তারও কারণ হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকেরা যখন বিভিন্ন প্রণালের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন কেবলমাত্র তখনই কৃতকার্য হয়ে থাকেন।

তবে, আমি আত্মাহুতে বিশ্বাস করি। আত্মাহুকে যে জন্যে বিশ্বাস করি তার কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি না সর্বপ্রথম ইলেকট্রন বা প্রোটন অথবা প্রথম পরমাণু বা প্রথম অ্যানিমো-এসিড, অথবা প্রথম প্রোটোপ্লাজম অথবা প্রথম বীজ, অথবা সর্বপ্রথম মস্তিষ্কটির জন্মের জন্যে কেবলমাত্র দৈব দায়ী। আমি আত্মাহুতে বিশ্বাস করি তার কারণ, আমার কাছে এইসব কিছুর মূলে আত্মাহুর পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের খোঁদা : বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখা

জন সিও. অ্যাবারনেকী । রিসার্চ কমিটি : এম, এস-সি, পি এইচ, ডি, নর্থওরেটান বিশ্ববিদ্যালয় । হামবোল্ড টেট কলেজ ও ক্যালিকোর্নিয়া টেট পলিটেকনিক কলেজে শিক্ষকতা করেন, বর্তমানে ক্যালিকোর্নিয়া ফ্রেন্সো টেট কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, জার্নাল অব কেমিক্যাল এক্কেশনের এসোসিয়েট এডিটর । অনুবন্ধী স্বভাবের অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদার্থ কার্বোহাইড্রেড সাবস্টিটিউটেড বাইকেনিনেসের হালোজিনেশনে ওরিয়েন্টেশন প্রভাব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।

আমাদের এই আধুনিক কালে একবার সমস্যাযুক্তী স্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং অর্থপূর্ণ হওয়ার পর আমরা সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারে অত্যন্ত কুরখার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পছন্দ উদ্ভাবন করেছি । আমরা আরো জেনেছি যে, সেম্যাটিকস্ বা শব্দার্থ আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে । আমাদের প্রত্যেকে অবশ্য অপরিসীম কারণবশতঃ অন্ততপক্ষে মাঝারি রকমের পৃথক পৃথক পরিবেশে বাস করে, তাই অত্যন্ত চরম ক্ষেত্রে “বাড়ী” বলতে চিহ্নায়িত সিটির উপকণ্ঠের অধিবাসীদের ওহা অথবা ক্যালিকোর্নিয়ার সংবাদপত্রের “টাইকুন” শৈলবাসকে বুঝাতে পারে ।

“আল্লাহ্ আছেন কি?” এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আল্লাহ্ বলতে কি বুঝায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিতে হবে । আল্লাহ্ বলতে যদি আমরা মহাবিশ্বের আইন ও শৃংখলাকে বুঝি তাহলে আমাকে বলতে হয় যে, কমিউনিষ্টরা যাতে বিশ্বাস করে আমরা তারই কথা বলছি । তারা মহাবিশ্বের আইন ও শৃংখলার বিশ্বাসী । কিন্তু সেই সঙ্গে তারা একথাও স্বীকার করে যে, আপনারা বৈজ্ঞানিক পদার্থের পূর্ণাঙ্গ সারসারী কাছে আজীবন আরাধনা করতে পারেন, তা, সে আরাধনা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বতই আত্ম-প্রেরণামূলক হোক না কেন । এইসব বৈজ্ঞানিক পদার্থের কোনটাই স্বতন্ত্রভাবে বা একত্র মিলিত হয়ে আপনাদের সে উপাসনার জবাবে সাড়া দেওয়ার জন্যে নিজে থেকে সামান্য অত্যাশাও প্রকাশ করবে না ।

সেই জন্য আমি আল্লাহ্ বলতে আইন-শৃংখলাকেও বুঝি না, আবার দুনিয়ার প্রায় সব বড় বড় ধর্মের উদ্ভূত কল্পনারসূত্রে আল্লাহ্‌তেও বিশ্বাস করি না ।

একমাত্র সেই আল্লাহ্‌তে আমার এককণা পরিমাণ আস্থা থাকতে পারে, যিনি ইচ্ছাশক্তি-পূষ্টান ধর্মমতের খোঁদা—একমাত্র সেই স্বরংকৃত খোঁদা মহাবিশ্বের জ্বলনায় অভিশর স্রষ্টা আমাদের এই পৃথিবীর প্রত্যেকের জন্য সারাক্ষণ চিন্তিত ও আগ্রহান্বিত হতে পারেন ।

এই আল্লাহ কি সত্যি, না এক পৌরাণিক কল্পনামাত্র? তিনি কি কখনও পৃথিবীর মানবজাতির ইতিহাসের মূলধারায় নিজেই প্রকাশ করেছেন? এইসব প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে, “যীশু কি মানুষের চাইতে বেশী কিছু ছিলেন?” মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা সমস্যা, কিভাবে আমরা সর্বশেষ প্রশ্নটির জবাব দেবো, তারই উপর নির্ভর করে। এক স্বরংগে আল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত অথবা বাদ দিতে আমরা একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারি।

আমি যদি ধরে নেই যে, যীশু একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে যেসব অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে সবই পৌরাণিক কল্পনাপ্রসূত, তাহলে আমি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি মহাবিশ্ব গড়ে তুলতে পারি এবং কিভাবে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে দুঃসাহসিক সব অনুমান করতে পারি। অ্যাক্সিটলেন্স অবরোহী যুক্তিবিদ্যা (খৃঃ-পূঃ ৩৩৫) ও স্যার ফ্রান্সিস বেকনের আরোহী যুক্তিবিদ্যা (১৬২০ খৃঃ)-কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একত্রিত করেছে এবং পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ তাকে সংশোধনও করেছেন। অবরোহী যুক্তিবিদ্যার একটি মূল তর্কশাস্ত্রের প্রস্তাবও একটি সামুলী তর্কশাস্ত্রের প্রস্তাব থেকে আমি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল নিউট্রাল কার্বন অ্যাটমে (নিরপেক্ষ অঙ্গার পরমাণুতে) ছয়টি ইলেকট্রোন থাকে, ইহা একটি নিরপেক্ষ অঙ্গার পরমাণু। অতএব এই পরমাণুতেও ইলেকট্রোন আছে। আরোহী যুক্তিবিদ্যার আমি ঘটনা থেকে প্রকল্প দ্বারা (যাতে থাকে স্বতঃসিদ্ধতা বা অপরম বৈজ্ঞানিক সত্য) আইনে পৌছাই।

যদি এইসব ‘সত্য’ থেকে অবরোহণ যুক্তিসঙ্গত প্রতিপন্ন হয়, তাহলে প্রকল্প দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অবশেষে ইহা অনেক সময় খিওরী বলে অভিহিত হয়। জ্ঞাত ঘটনাবলী, পুনরায় প্রদর্শনযোগ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাসমূহের অথবা আনুষ্ঠানিক বা বৈজ্ঞানিক অর্থে পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ফিরিস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, পানি শতকরা ১১.১ ভাগ উদ্‌যান (হাইড্রোজেন) ও শতকরা ৮৮.৯ ভাগ অক্সিজেন (অক্সিজেন) দ্বারা যে গঠিত তা বর্ণার্থই সত্য। কারণ, নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা এই একই ফল পুনরায় প্রদর্শন করা যেতে পারে। আইনাবলী (বৈজ্ঞানিক) হচ্ছে, পরিজ্ঞাত ঘটনাবলী থেকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্দিষ্ট মিশ্রণের আইন এই সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করে যে, প্রতিটি নির্ভেজাল যৌগিক পদার্থ (পানি, টেবিল, স্ট, ইক্ষু, চিনি) যে সমুদয় যৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় ওজনের দিক থেকে তাতে সব ঠিক একই পরিমাণ যৌগিক উপাদান বিদ্যমান থাকে।

খিওরীগুলি হচ্ছে মানসিক ছবি যা আমাদের জানা আইনাবলী ব্যাখ্যা করে। আমাদের প্রধান প্রধান খিওরীর মধ্যে যা আধুনিক চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা হচ্ছে গভীর আগবিক খিওরী, আগবিক খিওরী, অভিব্যক্তিবাদ, আগেকাবাদ। আগবিক খিওরী প্রথমে নির্দিষ্ট মিশ্রণ এবং বহু সমানুপাত সম্পর্কিত আইনাবলীর উপর

ভিত্তি করে গঠিত হয়। ড্যালটনের ১৮'০৬ মূল খিওরীর বা প্রকল্পের ভপর সত্যকে সংশোধন করতে হয়। যখন দেখা গেল, পরমাণুকে উপ-পরমাণু কণিকায় (ইলেকট্রোন, নিউট্রন ইত্যাদিতে) বিভক্ত করা চলে এবং যখন আইসোটোপগুলি (ভার ও হাঙ্গা হাইড্রোজেন হিসেবে) আবিকৃত হয়, তখনই সংশোধন করতে হয়েছিল।

খিওরীগুলি বিজ্ঞান বলে অভিহিত রীতিবদ্ধভাবে সংঘবদ্ধ জ্ঞানের দিকে আমাদের পরিচালিত করে। বিজ্ঞানের সম্পূরণ, যা নাকি মানুষকে তার মহাবিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তাই দর্শন। যদি খৃষ্টধর্মকে তার ব্যাপক আকারে পৌরাণিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে দর্শনও জড়বাদী হতে পারে—সম্ভবতঃ একটি সীমাবদ্ধ, ক্রমশঃ বিলুপ্তি লাভকারী মহাবিশ্ব অথবা এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কোন কিছুকে জড়াতে পারে। তাহলে ভাল ও মন্দের যথার্থ কোন অর্থ থাকতো না, আপনি অথবা আমি কোন কিছুকে ভাল বলি বলেই তা ভাল হতো না। অন্য যেকোন প্রাণী অথবা যেকোন উদ্ভিদের মত মানুষের আচরণ নিরপেক্ষ হতো।

এবারে আমি খৃষ্টধর্মকে ষাঁটি ধর্ম হিসাবে ধরে নিচ্ছি। আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত, এ দুটি প্রমাণ করার জন্য বীভক বীয় পরিচিতির নির্ভরযোগ্য পাসপোর্ট দেখাতে হবে অর্থাৎ তাঁর স্বর্গীয় জন্ম হওয়া চাই, অবরোহী যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তাঁকে অবস্থান্তরের এক বিপরীত সৃষ্টি হিসাবে প্রতিপন্ন করবো। আর যদি তা না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে, তাঁর জন্ম অবৈধভাবে হয়েছে। কিন্তু অনেক সাক্ষীর পূর্ব প্রদর্শনযোগ্য অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যদিয়ে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। শুধুমাত্র সংজীবন দ্বারা নয়, অঙ্ককে আরোপ্য করে, বহুসংখ্যক লোককে ভরণ-পোষণ করিয়ে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে এবং ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ও স্বর্গারোহণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন—তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তাই তিনি যথার্থই দাবী করে গেছেন, “আমি সত্য ও জীবনের আদর্শ পথ, কোন মানুষই পবিত্র পিতার কাছ থেকে আসেনি, কেবল আমি ছাড়া।”

এ যদি এমনি হয়, তাহলে একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, আল্লাহ হচ্চেন প্রেম, এবং তিনি হচ্চেন আত্মা (৪৪:২৪)। কিন্তু আত্মার মাংস ও হাড় থাকে না (লুক ২৪:৩৯)। আপনি যদি ঈশ্বর হতেন এবং সম্পূর্ণভাবে সার্বিক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং অনন্ত সময় ছাড়া আকৃতিগত ধারণাহীন মানুষকে ধরুন, আপনি আধ্যাত্মিক বস্তু কি তাই বোঝাতে চাইতেন, তাহলে কি করতেন? আপনি মুশ্পট মডভেন্দসহ ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও চারটি আকৃতি (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও ভেদ)—এর পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক বস্তুর ব্যাখ্যা করতেন। স্বর্গ, বহু কাক্সন নির্মিত রাজপথ ও একেকটি করে মুক্তা বসানো বিশেষ তোরণসমূহ একটি নগরী অথবা অনেকগুলি ঔটালিকার সমন্বয়ে গঠিত কল্পনাভীত রকম বিশাল বুকা বাড়ী হতো। আল্লাহকে স্বরণ করার জন্যে ধর্ম বিশ্বাসী আন্তিকেরা যখন সমবেত হন তখন তারা বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তাদের মধ্যে রয়েছেন। তাদের এই বিশ্বাস একজন অতি ঘনিষ্ঠ

বহুর আকৃতির ইঙ্গিত করে যিনি দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করলেও কথাবার্তা বলা চলে এমনি দূরত্বে সারাক্ষণ বিদ্যমান রয়েছেন, নিঃসন্দেহে তাঁর উপস্থিতি এর চাইতে অনেক বেশী, সাধারণ ইন্দ্রিয়গত পরীক্ষার মাধ্যমে একে ধরা যায় না, কেবলমাত্র আত্মশিক বোঝা যায়। চক্ষু থেকে কর্ণ যেমন পৃথক, তেমনি পৃথক আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পরও যদি আরো দশটি ইন্দ্রিয় থাকতো, তাহলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যার কতই না পরিবর্তন হত।

জড়বাদী চিন্তাধারার ভাল-মন্দের কোন বতন্ত্র অর্থ নেই। স্বাভাব্য অর্থে, বোমা কেলে মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে তাতে কোনই তুল করা হবে না, কারণ সকল জীবন যেভাবেই হোক না কেন, সম্ভবতঃ যথাসময়েই শেষ হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ আমাদের জীবনের চাইতে উন্নততর জীবনসহ হাজার হাজার অথবা হরতো লক্ষ লক্ষ গ্রহ সারাক্ষণ উদ্ভূত হওয়ার, অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ার, শোচনীয়ভাবে শেষ হয়ে গেছে, অথবা সামান্যতম মহাজাগতিক তরঙ্গে চিরন্তরে বিলীন হয়ে গেছে।

অপরপক্ষে, যদি আল্লাহ্ সিনাই পর্বতের উপরে মূসার সঙ্গে কথা বলে থাকেন এবং ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যুগে অন্যদের সংগে কথা বলে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই ভাল ও মন্দের বতন্ত্র অর্থ আছে এবং বীভূত কর্তৃক পাপীদের উদ্ধার অবশ্যজবী। পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্যে বিজ্ঞানকে অবশ্যই এই সত্যিকার আল্লাহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কেউ বীভূত ছাদশজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে অন্যতম পলের চিন্তা না করে থাকতে পারেন না। তারসাসের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার অতি উচ্চ কেন্দ্রে তাঁর জন্য এবং সেই পরিবেশেই তিনি বেড়ে উঠেন। তারপর জেরুজালেমে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লাওভিসিয়া থেকে তার ধর্মপুত্র টিমোথীকে যে পত্র লিখেছিলেন, কারো পক্ষে সেই পত্রের কথা চিন্তা করার উপায় নেই। এই পত্রে তিনি তাঁর আদেশপ্রাপ্ত সকল ভাব প্রকাশের প্রগাঢ়তা দিয়ে পুত্রকে সতর্ক করে বলেছিলেন, “হে টিমোথী! ধর্ম বহির্ভূত বিষয় বাদ দিয়ে, ব্যর্থ জন্মনা বর্জন করেও মিছামিছি তথাকথিত বিজ্ঞানের বিরোধিতা না করে তোমার জিহ্বার বা রাখা হয়েছে, তাকে সবদে রেখে দাও।” (১ টিমোথী ৬ঃ২০) সম্ভবতঃ এই উক্তি যুগে ছিল ঈরিকসদের দর্শন ও বিজ্ঞান। পল তাঁর শিক্ষার প্রথম যুগে এই ঈরিকসদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বা গীঠস্থান তারসাসে জ্ঞানার্জন করেন এবং সম্পূর্ণ জড়বাদী মহাবিশ্ব সম্পর্কে ঈরিকসদের শিক্ষার কথাই প্রকাশান্তরে তাঁর মনে ছিল। ঈরিকস পন্থীদের কাছে জড়পদার্থ ও শক্তি হচ্ছে বিশ্বের চরম নীতি। তাদেরই অনুসারীরা অগণিত শিক্ষাকেন্দ্রে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, প্রেম, সমবেদনা, অনুকম্পার মত ‘অবাস্তব’ মনোভাবকে অবজ্ঞা করে মানুষকে এর উর্ধ্বে নিজেকে দাঁড় করতে হবে।

আমাদের “আধুনিক দুনিয়ায় তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বেরকে চেনার জন্যে খুব একটা অত্যাশ্রয়শীল মনের দরকার হয় না।”

এক ভরূপ অতীন্দ্রিয়বাদী স্ট্রট চিন্তাধারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

রাসেল লাত্জেল রিকসটার ।। প্রাণিতত্ত্ববিদ : এম, এস-সি, মিচিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়; পি-এইচ, ডি, ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়; হুইটন কলেজের প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞানের অধ্যাপক ও জ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, ইলিনয়েস একাডেমী অব সায়েন্সের সদস্য, আমেরিকান সায়েন্সিফিক অ্যাকিলিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, ১৯৫৪-৫৯ । বোগ কলার (কানেকটিকট টিসুর) ম্যাক্রোকেজেসে বিশেষজ্ঞ, ব্যাকহিলের মাকডুসা ও অবস্ফটন বিশেষজ্ঞ ।।

সাধারণতঃ পিতামাতার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনে সর্বপ্রথম আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করে । তাঁরা অত্যন্ত ভক্তি-প্রদর্শনকারী আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেন । কাজেই, তা শুনে শিশুও তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে শেখে । হোট বেলার সে যেমন তার আত্মার একটুখানি সহানুভূতি চায়, তেমনি তার প্রথম জীবনের হোটখাট প্রয়োজনে সে অত্যন্ত সরল মনে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে । এতে করেই সে ভূক্তি লাভ করে এবং অদৃশ্য 'পিতার' বিশ্বাস করে চলে ।

পরে বইয়ের কাছে সে তাঁদের সম্পর্কে অনেক পল্ল জানতে পারে যারা আল্লাহর সঙ্গে হেঁটেছেন । সে জানতে পারে যে, তাঁরা সিংহের মুখব্যালান বন্ধ করেছিলেন, আগুনের শেলিহান জিহ্বার সর্বস্বাসী সুখা নিবৃতি করেছিলেন, ভরবারীর তীক্ষ্ণধার তাঁদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনি । দুর্বল থেকে পরম পরাক্রমশালী হয়েছিলেন, তারা লড়াইয়ে মহাবিক্রমশালীকে পরাজিত করেছিলেন । তাঁদের এই শৌর্যবীর্যের কাহিনী পড়ে তার শিশুমন বারবার শিহরিত হয় এবং তাঁদের আদর্শ অনুসরণের জন্য তার মন উত্ত্বজ হয়ে উঠে । সে জানে, সত্যের পথে এগিয়ে যেতে তাঁর সাহায্যকারী আছে । সে অনুভব করতে পারে, তার জীবনের চলার পথে তাকে উৎসাহদানের জন্য অতীতের এইসব ব্যক্তিত্ব হচ্চেন তার সহচর এবং "একদল সাক্ষী" হিসেবেই তার সঙ্গে রয়েছেন তাঁরা ।

বুকের দিনগুলিতে তার বিশ্বাস যেমনভাবে গড়ে উঠে, তেমনি এই সময়েই তা আবার খান খান হয়ে ভেঙে যায় । সে জানতে পারে, তার দেশ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক কয়টি দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজ মাত্র এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বসমূহ এই দলের নেতৃত্ব করেছেন এবং সর্বোপরি একজন সভাপতি আছেন, যিনি সব কিছুই উদারকের মালিক; সকল ব্যাপারে তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁর সে সিদ্ধান্ত যাতে জনসাধারণ যেনে চলে সে ক্ষমতাও তিনি রাখেন । একজন হাতের কাছে আল্লাহ তখন সভাপতির মত সকল ক্ষমতার অধিকারী এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, যিনি অন্য সবাকার উপর কর্তৃত্ব করে চলেছেন । মানুষের উপর যেমন একজন শাসনকর্তা থাকা বৃত্তিমুক্ত, তেমনি সকল মানবজাতির উপর সর্বময় কর্তা এক দৈব ব্যক্তি থাকা খুবই বৃত্তিসম্মত ।

অপরপক্ষে মানুষের ভোটে বা সম্মতিতে যদি একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তাহলে শুধুমাত্র মানুষের কল্পনায়ও একজন আল্লাহ থাকতে পারেন— যে কল্পনায়, একমাত্র তাদের বন ছাড়া আর কোন বস্তুই অস্তিত্ব নেই। হতে পারে, তারা তাদের খোদাকে আবিষ্কার করেছে। এই চিন্তা আমাদের ছাত্রটিকে হতবুদ্ধি করে দেয়। সে বিশ্বাসীভূত হয়ে ভাবে, আদৌ খোদা আছেন কি না? কি করে সে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে?

এইসব কারণে সে বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত বাবড়ীয় অসুবিধা একধারে সরিয়ে রেখে, তার যে সব বন্ধু বেশিরকম চিন্তাভাবনা করে তাদেরকে বিরক্ত না করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সে অতীশ্রিয়বাদী হয়ে উঠে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ একজন আছেন, কারণ সে কারমনোবাক্যে তাই কামনা করে। তবে যখন সে তার যুক্তির প্রক্রিয়াকে বীর বিশ্বাসের সংস্পর্শে আসতে দেয়, তখন অনেক সময় অবশ্য সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারে না।

একদিন আমাদের তরুণ অতীশ্রিয়বাদী তার বাইবেলের পাতা উন্টিয়ে একটি ক্ষুদ্র অংশের সন্ধানী হয়, যে অংশ তাকে বলে যে, সত্যিকার ধর্ম হচ্ছে এমন একটি বিষয়— যা নাকি “যুক্তিযুক্ত”। এবং একটি টীকা থেকে সে জানতে পারে যে, “যুক্তি” শব্দটি এই আধুনিককালে “বিচারশক্তিসম্পন্ন” (রোমান ১২ঃ১) বলে অনুদিত হতে পারতো। এ তাকে ধমকে দেয় মনে হয়, এই ক্ষুদ্র অংশটি যেন তাকে বলছে যে, সর্বোপরি মানুষের মনের ধর্মপরায়ণ হওয়ার পেছনে কিছু একটা কারণ আছে। তারপর দীর্ঘকাল ধরে চলে পড়াশুনা আর গবেষণা। পরিশেষে তরুণ অতীশ্রিয়বাদী একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি, একজন ধার্মিক চিন্তাবিদে পরিণত হয়। সে ‘বিশ্বাস’ করে এবং ‘জানে’ যে আল্লাহ আছেন। তার আস্থা ও বুদ্ধিমত্তা একই সংশে পরিতৃপ্ত সুখে বাস করে। তখন সে বাইবেল সন্ধানী আদর্শ — “আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ, সকল ভাল কাজ যথাযথভাবে সমাপন করে সম্পূর্ণ হতে পারে।” একে বাস্তবিক করার জন্যে পরিশ্রম করতে প্ররোচিত হয়। এই লেখকের কাজই তাকে প্রকৃতি ও প্রকৃতির সংশে খোদার ঘনিষ্ঠ বোগসূত্র স্থাপন করে চলেছে। যুক্তিযুক্ত মন নিয়ে কেউ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

সে জীবিত উদ্ভিদ আর প্রাণীর এক বিশাল বৈচিত্র্যের সন্ধানী হয়; আরো প্রশংসা পায় যে, অগণিতসংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী ভীতকালে বাস করতো। এই দুনিয়ার সম্ভবতঃ প্রাণীর কমপক্ষে দশ লক্ষ প্রজাতি রয়েছে। আমি প্রজাতির কথা বলছি, প্রত্যেকটি প্রাণীর কথা বলছি না। পৃথিবীর সকল প্রজাতির সংখ্যা, জ্যোতিষীর সংখ্যায় শৌঁছেবে। এ ছাড়া পৃথিবীতে অতি সহজে দু’লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতি বের করা যেতে পারে।

এমনি বিন্যাসে—আবার নিয়ম-শৃংখলা আছে কি? সর্বত্রই নিয়ম-শৃংখলা বিদ্যমান। প্রাণিজগতের দশ লক্ষ প্রজাতির মধ্যে একটি মাত্র প্রজাতির কথা ধরা যাক। এমনি প্রজাতির প্রত্যেকটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আবার প্রত্যেকটি শাখাকে পুনরায় প্রশাখায় ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু যতই শাখা-প্রশাখায় আপনি বিভক্ত করুন না কেন, প্রজাতির যে সাদৃশ্য তা সবাইর মধ্যে মিলবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা চলে, একটি

স্বাক্ষরকারী পাখির যে বৈশিষ্ট্য তা সকল কাঠোঁকরা পাখির মধ্যেই মিলবে। ডাউনি দেখতে অনেকটা হেয়ারীর মত লাগে, কিন্তু স্যাপসাকারের সংগে যেন কিছুটা কম সাদৃশ্য রয়েছে এবং এমনি আরো রয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আকৃতিতে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা বিন্যাস বলে কিছুই নেই। অধিকন্তু গোটা প্রকৃতি জুড়ে কম-বেশী একটা পরিব্যাপ্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। যদি একটি মৌলিক পদার্থ মাংস, প্রোটোগ্লাজম অথবা জ্যান্ড কিছুতে অগণিত বতন্ত্র ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয় এবং যদি একই সঙ্গে হাজারো একটা বতন্ত্র শাখায় যে-এক্কেহা সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে একথা অবশ্যই সুনিশ্চিত যে, এদের সবকিছুর মূলে আল্লাহর সুনিশ্চিত পরিকল্পনা বিদ্যমান—যিনি মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মৌলিক পদার্থকে নিজস্ব সীমাহীন পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা আর নির্দেশ দিয়েছেন।

মৌলিক পদার্থগুলির আকস্মিক একত্রীকরণের অথবা পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা কম-বেশী একটি নির্দিষ্ট পদে পরিচালিত হয়ে মৌলিক পদার্থগুলির সংযুক্তির কলে কেমন করে এই বিচিত্র জ্যান্ড সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে এমনি ধারণার পরিবর্তে এখানে বর্ণিত সকল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে একটি “পবিত্র মন” প্রথমে চিন্তায় এনেছে, তারপর পরিকল্পনা ও রূপদান করেছে; ন্যায়শাস্ত্র আমাদিগকে এই কথাই অনুমান করে নিতে বাধ্য করে। একই-যুক্তিযুক্ত মন যখন লক্ষ্য করে যে, মানুষের মন সর্ব জটিল বিষয় সৃষ্টি করে, তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সকল জটিল জ্যান্ড বস্তু “সর্বশেষ মনের” সৃষ্টি। একটি জাতির সদস্যদের মধ্যে এই সকল জ্যান্ড বস্তুর যত পার্থক্যই থাক না কেন এবং এদের পরিশ্রিত পূর্বপুরুষদের সিকে দৃষ্টি দিলে জীবন ও জৈবাণুগের মধ্যে যত পরিবর্তনই আমাদের নজরে পড়ুক না কেন, একটি বিষয় কারো দৃষ্টি এড়াতে না, আর তা হচ্ছে, এদের পরিবর্তনের উপযোগী প্রাণী করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এরা ছিল এমনি প্রাণী যা একজন সৃষ্টিকর্তার উপযুক্ত সৃজনী ক্ষমতার স্বাক্ষর পরিচায়ক।

আল্লাহ মানুষ, পশু এবং উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন একথা যখন কেউ বাইবেল পাঠ করে, তখন সহগ সংগেই সে তা বিশ্বাস করতে পারে। কারণ, প্রকৃতিতে সে যা দেখছে তা এ বিশ্বাসের সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাইবেল বিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয় নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে যেসব নীতি রয়েছে, বাইবেলে তদসমুদয়েরই উল্লেখ রয়েছে। আর আমার কাছে চির উজ্জ্বলও কখনো নিশ্চিত হয় না এমনি সত্য হচ্ছে তাই, যে সত্য আজ পর্বত যত জুড়বাদী খিওরীর কথা কল্পনা করা হয়েছে এবং যত খিওরী উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার কোনটির কাছেই এতটুকু দীপ্তি হারায় না। বাইবেলে বর্ণিত আল্লাহ ও প্রকৃতির আল্লাহ একই সত্য।

বাইবেলের আল্লাহই পর্বত, আকাশ এবং সমুদ্রের মারকত আমার সংগে কথা বলেন। পাখির কলকাকলি আর প্রকৃতিচিন্তা নর্তন-কুর্দনে মুখরিত সজীব সবুজে ঢাকা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যদিয়ে সেই আল্লাহরই চাপা-হর আমার কান্নে মধু কর্ষণ করে।

উদ্ভিদ জগতের আল্লাহর স্বাক্ষর

জিয়াল টি ডেন হার্টক ।। রিসার্চ অ্যাথ্রনমিষ্ট : এম, এস-সি, পি, এইচ, ডি, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়; ইউ, এস, কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা সার্ভিসের তুলা ও অন্যান্য আঁশ শাখার রিসার্চ অ্যাথ্রনমিষ্ট; আমেরিকান অ্যাথ্রনমিষ্ট সোসাইটির সদস্য । তুলা প্রজনন, মাঠের ফসলের রোগ মাত্রিক উত্তরাধিকার ও জীবপরিসংখ্যার বিশেষজ্ঞ ।।

এই প্রবন্ধে মূলতঃ উদ্ভিদের উৎপাদন ও সুপ্রজনন বিদ্যা (বংশ প্রভৃতি) নিয়ে আলোচনা করা হবে । জেনেসিস-এর প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ভিদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রথম লিপিবদ্ধ পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ “ এবং (তারপর) আল্লাহ বললেন, পৃথিবী তার বৃকে ঘাস জন্মাক, লতাপাতা উৎপাদনকারী বীজের জন্ম হোক, ফলের গাছ একই রকম ফল উৎপাদন করুক, গাছের বীজ থাকবে মাটির উপরে ঐ গাছেরই ফলের মধ্যে । আর আল্লাহর কথামত কাজ হলো—মাটির বৃকে ঘাস জন্মালা, ফল উৎপাদনকারী বৃক গজিয়ে উঠলো, সে বৃকের বীজ সেই ফলের মধ্যেই লুকায়িত রইলো এবং আল্লাহ দেখলেন কাজটা ভালই হয়েছে ।”

আমাদের বিষয়টি সম্পর্কে কতকটা সম্পূর্ণভাবে গভীরে তলিয়ে যেতে পারলে আমরা জেনেসিস রিপোর্টের বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রমাণ করতে পারি । বাইবেলের বিবরণী সম্পর্কে আমাদের যে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস রয়েছে তার উপরেই এই প্রমাণ পাযো ।

১৯০০ সালে দ্যভরিস কোরেল এবং ভন-শারমাক পৃথকভাবে গবেষণা করে মেডেলের সূত্রকে পুনরায় আবিষ্কারের ফলে আধুনিক সুপ্রজনন বিদ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সূচনা হয় । ১৮৫০ ও ১৮৬০-এ পরিচালিত বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জি, জে, মেডেল পৃথক ভবন ও নিরপেক্ষ পাঁচমিশালী জিনিসের সংগ্রহ সম্পর্কিত মৌলিক আইন-সূত্রকে বিধিবদ্ধ করেন । এইসব আইন, ডব্লুসহ ১৯০৬ সালে ডব্রিউ, বেটসন ও আর, সি পাল্ট্রে কর্তৃক সংযোগ পদার্থ আবিষ্কার এবং ১৯১১ সালে টি, এইচ, মর্গান কর্তৃক বংশগতির ভিত্তি হিসেবে ‘ক্রমোসম’কে প্রতিষ্ঠা করার ফলে আধুনিক সুপ্রজনন বিদ্যার ভিত্তি গড়ে উঠে ।

মেডেল এক বা দুই কারণ সম্পন্ন যেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, প্রকৃত নীতি অনুসারে উদ্ভিদের উত্তরাধিকার তার চাইতে অনেক জটিল । তবে মৌলিক নীতিগুলি এখনও প্রযোজ্য । সকল জাতীর উদ্ভিদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ বৈশিষ্ট্যগুলির (প্রলব্ধ এবং বৈশিষ্ট্য) প্রকৃতি (বিভিন্ন রকমের প্রভাবসাপেক্ষ) বহুবিধ কারণ সম্পন্ন হয়ে থাকে । এছাড়া এতে প্রতিটি কারণের মাত্র আংশিক প্রাধান্য অথবা অসম্পূর্ণ

প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে। তদুপরি, পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা অনেক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ ভূট্টার (কসলের) ভায়ারসসেন্ট (সবুজ হয়ে যাওয়া) এর উল্লেখ করা যেতে পারে। চারা অবস্থায় এবং তাপমাত্রায় ভূট্টার পাতা হলদে দেখায়। তারপর উদ্ভিদটি যতই বাড়তে থাকে, পাতাগুলি ততই সবুজ হয় এবং স্বাভাবিক চেহারা ধারণ করে। অন্য রকম সব পারিপার্শ্বিকতায় যেমন উষ্ণ তাপমাত্রায় ভায়ারসসেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলি হয়তো বা প্রভেদযোগ্য করা যায় না।

উদ্ভিদের যে প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাকে বলে কেনোটাইপ। একটি শাখার সকল উদ্ভিদের বাহ্যিক প্রলক্ষণ, যা নাকি তার বৈশিষ্ট্য, তারই একটি মোটামুটি সমষ্টি হচ্ছে এই কেনোটাইপ। তিনটি উপাদানে কেনোটাইপ গড়ে উঠে : জেনোটাইপ (জন্ম ও উৎপত্তি বিষয়)-এর কলে, পারিপার্শ্বিকতার দরুন এবং জেনোটাইপ ও পারিপার্শ্বিকতার আন্তঃক্রিয়ার কলে। একমাত্র উদ্ভিদের জন্মগত উৎপত্তি বিষয়ক প্রকাশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ হয়ে থাকে এবং তাই সব সময় অপরিবর্তিত থাকে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কোন প্রকার নির্বাচন ছাড়া যদি এক শ্রেণীর বার্লি প্রথম বছরে মিনোসোটোতে জন্মানো হয়, এবং দ্বিতীয় মওসুমে আলাস্কায় ঠান্ডা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এবং তৃতীয় মওসুমে আবার মিনোসোটায় জন্মানো হয় এবং তারপর এই তিনটি বছর ধরে মিনোসোটায় যে অনির্বাচিত কসল উৎপন্ন হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়; তাহলে দেখা যাবে বার্লির শ্রেণীতে দু'টি কসলেই যে সামান্যতম কোন পরিবর্তন হয়েছে তার কোন লক্ষণই নেই। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, কেনোটাইপের জন্ম ও উৎপত্তি বিষয়ক প্রচ্ছন্ন শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক পারিপার্শ্বিকতায় উদ্ভিদ জন্মালেও অপরিবর্তিত থাকে।

উদ্ভিদের কেনোটাইপ যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাই নয়—জৈবিক পারিপার্শ্বিকতা দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে ওটসের আবাদ করতে যেয়ে অর্ধেক সময় কৃষি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বলতে শোনা যায়, ওটসগুলি 'শেষ হয়ে গেছে।' যখন কোন একটি "রাইট (এক প্রকার উদ্ভিদ রোগ)" প্রতিরোধক বিশেষ রকম ওটস বেশ কয়েক বছর জন্মানোর পর গুঁড়ি বা মাথায় রাইট দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সংবেদনশীলতা প্রকাশ করতে থাকে, তখনই এই উক্তি করা হয়। উৎপাদনকারীগণ অনেক সময় এই "শেষ হয়ে যাওয়া" বা অবনয়নকে উক্তগদের পরিবর্তন বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা হয়তো রাইটের জাতি শরীরবৃত্তিক জাতির (বংশের) প্রতিরোধকারী কারণগুলির মধ্যে এবং কিছু অজানা নতুন জাতির সংবেদনশীলতার কারণগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার কলে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া ওট রাইটের একের পর অন্য স্বাগতিকবৃন্দ, "বার্বেরিস ভালগেরিস

(গুঁড়ির রাষ্টের ক্ষেত্র) এবং “রায়মন্যাস ক্যাথারটিকাস (মাখায় রাষ্টের ক্ষেত্র)”—এর উপস্থিতিতে সংকরণের ক্ষমতা বিদ্যমান এবং এইভাবে রাষ্ট শরীরবৃত্তিক জাতির জন্ম দিয়ে থাকে।

উচ্চতর উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধের ধরন, জটিল ব্যাপার—‘দু’টি জটিল জৈবিক ব্যবস্থার’ স্বাভাবিক প্যাথোজেনের (রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্টের) মিথস্ক্রিয়ার ফলে এ সৃষ্টি। আমাদের গুটের দৃষ্টান্তে পদের বাহ্যিক যে পরিবর্তন নজরে পড়েছে, তা আসলে উচ্চ পদের বংশগত কোন পরিবর্তন না হয়ে, উদ্ভিদকে আক্রমণকারী রোগ সম্পর্কিত (রোগ সৃষ্টিকারী) স্থানীয় উদ্ভিদ, পদার্থের সংখ্যার পরিবর্তনের ফল।

ফরাসী উদ্ভিদ বিদ্যাবিদ দ্য-য়াসিয়া উদ্ভিদের প্রজাতি বলতে কি বোঝায়, তাই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, “ইহা প্রজনন দ্বারা চিরস্থায়ী একই রকম উদ্ভিদের বহুবর্ষজীবী পরপর অনুগমন মাত্র।” প্রজাতির মধ্যে হাজার হাজার চেনা যেতে পারে এমনি বংশগত বিভিন্ধতা সত্ত্বেও সর্বোপরি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে গুঁড়ি, পাতা এবং ফুলগত সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সব সময়ই বিদ্যমান থাকে। যে সব উদ্ভিদ আমরা আমাদের নিজস্ব করে নিয়েছি সেগুলিকে কয়েকশত বছর আগেকার যে পদ বিদ্যমান রয়েছে তা থেকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশের অধিকতর উপযোগী করার জন্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও মানবীয় নির্বাচন দ্বারা বাইয়োটাইপ লাভে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এই অগ্রগতি যে ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এরূপ ধারণা করারও যথেষ্ট কারণ আছে। সে বাই থেকে—এই একটি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সত্ত্বেও জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিকতায় পরিবর্তন অথবা জৈবিক শত্রুদের দ্বারা উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও সকল যুগের উদ্ভিদের প্রজাতির কোন পরিবর্তন হয় না; তা একই থাকে। জেমিসিস ১-এ সৃষ্টিকর্তার যে আদর্শের উল্লেখ আছে, তা আজকের দিনে পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে।

উদ্ভিদের প্রজাতির স্থায়িত্ব সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত গমের বীজ ও অন্যান্য উদ্ভিদজাত দ্রব্যের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রকাশ পেয়েছে। এতে দেখা যায়, এগুলি আজকের দিনের একই উদ্ভিদজাত দ্রব্যের মতই আছে এবং হাজার হাজার বছর পরেও তুলনামূলকভাবে অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। তুলার ইতিহাস সম্পর্কিত পুস্তকে জি-ওয়াট উল্লেখ করেন যে, খৃঃ পূঃ ৩৫০ সালে থিওফ্রাস্টাস আজকের দিনের পার্শ্ব উপসাগরের তীরে বর্তমানে বাহরাইন বলে অভিহিত স্থানে পশ্চিম উৎপাদনকারী বৃক্ষের জনের কথা উল্লেখ করে গেছেন। গাছ তুলা ‘গমিনিয়াম আরবোরিয়ার’ নামে পরিচিত ছিল এবং আজকের দিনের এই গাছ তুলার সংগে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

এ কথা সত্য, যদিও খুব কম ঘটে, তথাপি উদ্ভিদের জীবনের পরিবর্তন হয়ে থাকে; তা হচ্ছে বর্ণ সম্পর্কিত এবং বংশ সম্পর্কিত পরিবর্তন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রজাতি নিজে অপরিবর্তিতই থেকে যায়। বর্ণ সম্পর্কিত পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ বর্ণ হারিয়ে যায় বা

বাদ অথবা উল্টে পড়ে বা বর্ণের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। বংশ পরিবর্তন সাধিতও হয়ে থাকে। অনুরূপ পরিবর্তন মাত্র একটি স্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বহুসংখ্যক উদ্ভিদ পদার্থে এই পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। রজন-রশ্মিও পরিবর্তক বংশ দ্বারা মূলার ফল-মাছি, ড্রোসোফিলা মেলানেগাষ্টারের ১০০০ বা ততোধিক বংশের সমান সংখ্যক বংশ নিয়ে গবেষণা করেন এবং বলেন যে, পরিবর্তন বংশ সবই ক্ষতিকর অথবা নিদেনপক্ষে কার্যকারিতার দিক থেকে মূলবংশ জটিলতার অনুরূপ। এসব থেকে এবং একই রকম গবেষণা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতিতে কোন পরিবর্তন কখনও ছিল না।

নির্বাচন ও পরিবর্তনের স্থলে পরনিষেকর চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু হার্ডির সূত্র (আধুনিক কসলবিদ্যাবিদদের কাছে পরিজ্ঞাত একটি জটিল সূত্র) এ কথাই প্রমাণ করে যে, এতে করে জাতি সম্পর্কিত স্থিতিতে পৌঁছানো যায়। উদ্ভরাধিকারের যান্ত্রিকতা সব সময়ই প্রজাতিকে স্থিতিশীল করার এবং একে তার মূল পদের আওতার মধ্যে রাখার দিকেই বেশী চেষ্টা করে।

এই লেখক বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আছেন - যিনি উদ্ভিদ জগতের অপরিবর্তনীয় আইনসমূহে রহস্য আর বিশ্বয়ের মধ্যদিয়ে সারাক্ষণ নিজেই প্রকাশ করে চলেছেন তিনি নিম্নলিখিত পন্থায় নিজেই প্রকাশ করেনঃ

১। সুশৃংখলতা - কোষগুলি বর্ধিত হয়ে উদ্ভিদের যেভাবে বৃদ্ধি ও পুনঃ উৎপাদন হয় তার প্রক্রিয়া এবং কোষগুলির বিভাগ ও কাজের বিশিষ্টতা যেসকল সুশৃংখল, নিয়মিত এবং আশ্চর্য রকমের অপরিবর্তনীয় উপায়ে অগ্রসর হয় তার প্রক্রিয়া।

২। জটিলতা - একটি মাত্র সাধারণ উদ্ভিদের মধ্যে তার বৃদ্ধি ও পুনঃ উৎপাদনের যেসকল জটিলতা বিদ্যমান, মানুষের তৈরী কোন বস্তুই আজ পর্যন্ত তত জটিল হতে পারেনি।

৩। সৌন্দর্য - উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা এবং ফুলে যে স্বর্গীয় লালিত্যময় সৌন্দর্য বিদ্যমান, তা সব সময়ই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী শিল্পীর সৃষ্টিকে হার করে দেয়।

৪। উদ্ভরাধিকার—উদ্ভিদ আবার একই রকম উদ্ভিদ জন্মিয়ে থাকে, কোন কারণেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। এই উদ্ভরাধিকার বন্য, উদ্দেশ্যহীন, অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে অগ্রসর হয় না। গম গমই জন্মায়, বার্লি বার্লিই উৎপন্ন করে, জলপাই একই জলপাইবৃক্ষ জন্মায়—সব রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রজননের পর প্রজনন ধরে চলে আসছে এ একই নিয়ম।

এই সবই আমার কাছে অপরিণীত জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

এক করেটারের কিন্তুবুক থেকে সংগীত তথ্য

লরেন্স কন্টন ওয়ালশার ।। রিসার্চ করেটার, উদ্ভিদ শরীরবৃত্তবিদ : বি, এস, সি, পেনসিলভিনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়; এম, ফর, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, পি-এইচ, ডি, সিরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক কলেজ অব করেটারীর, স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ই, ই, এস, করেট সার্ভিসের সাবেক রিসার্চ করেটার; জর্জিয়া স্কুল অব করেটারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বন, শরীরবৃত্ত গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত অরণ্যবিদ্যার বর্তমানে অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক । বন-মৃত্তিকা, উদ্ভিদ শরীরবৃত্ত হাউডিড নিয়ন্ত্রণের সিলভিসাইড ও রেডিও আইসোটোপোলজী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।

“আল্লাহ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী নন (বাইবেল)।” অধিকন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতটাই সৃষ্টি করেছেন । তাঁর সৃষ্টির কাজগুলি এতই সুশৃংখলভাবে সম্পাদিত এবং সাজানো রয়েছে যে, তা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রম বলতে কি বোঝায় তাই প্রকাশ করে ।

মাঝে মাঝে অল্প মানুষ উপত্যকার নীচে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র পর্বতের উচ্চ চূড়া অবলোকন করে এবং তারপর পর্বতের উদারতার সঙ্গে আল্লাহর তুলনা করে ।

অথবা স্থলপথ শোভিত মাঠে নীরবতা ভংগকারী বাতাসের মর্মর শব্দের মধ্যে যেন আবার শুনতে পায় কে যেন বলছে : “সোলেমান তাঁর সমস্ত গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছে ও এর একটির মতও সুসজ্জিত হতে পারেননি ।”

সত্য কথা বলতে কি, এই অভূতপূর্ব সাজসজ্জা, সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতির শ্রেষ্ঠতম হাতের কাজের নিদর্শন । কিন্তু ব্যক্তিগত ঐশ্বরিক সৃজনশীল কার্যাবলীর প্রমাণের জন্য আর কোন চেষ্টা না করা, কাঠমিস্ত্রীর তৈরী সুদৃশ্য বাড়ী দেখে তার তারিফ করার মত । কতখানি নির্ভুলতা সহকারে কড়িকাঠগুলিকে সমতল করা হয়েছে, কোণগুলিকে চৌ-কোণা করে কেটে নেয়া হয়েছে, অথবা শুধুমাত্র হাতের সাহায্যে কি নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে মনোরম করে ভিত্তিকার সাজসজ্জা গড়ে তোলা হয়েছে, তার প্রতি এতটুকু চিন্তা-ভাবনা না করে কেবলমাত্র চারিদিকের রেলিংকে কি করে কাঠামোতে আটকানো হয়েছে শুধু তারই তারিফ করার মত ।

কলিঙ্গ পর্বতের পাললিক তলানী দ্বারা উপত্যকা প্রদেশের উর্বর চাষের জমি সৃষ্টি করার মধ্যেই যদি মহাবিশ্বে আল্লাহর সরকারের কাজ সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে বন সম্পর্কিত প্রাকৃতিক বিবরণবিদ অথবা শরীরবৃত্তবিদ কখনও আল্লাহর উদ্যম শক্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করতেন না । তাঁর পরিকল্পনা আর উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করতে ফুলে মাঠ ও বনের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বস্তুকে দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ উন্মীলন দ্বারা অত্যন্ত

তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তখনই প্রাকৃতিক দৃশ্য তার কাছে অতি প্রাকৃতি বা অলৌকিক রূপ পরিগ্রহ করবে; এবং অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহকে কর্মরত অবস্থায় বিশ্বাস করা।

কার্ল হেইম তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'খৃষ্টান বিশ্বাস ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' নামক বইয়ে একে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন:

“বিশ্বকাঠামোর চমৎকার গঠন নৈপুণ্য শুধুমাত্র একজন চিন্তাশীল সৃষ্টিকর্তার প্রভাবকে অনুমিতি দেয় না, সেই সঙ্গে অনুরূপ অনুমিতিকেও আমন্ত্রণ করে থাকে। শিক্ষা ও যুক্তিবাদের যুগের মানুষ প্রকৃতি থেকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছার জন্যে যে পথে অগ্রসর হচ্ছিলো, আকস্মিক যান্ত্রিকতা সেই পথ রুদ্ধ করে দেয়, কিন্তু আবার বিশ্বব্যাপী আকস্মিক যান্ত্রিকতা সম্পর্কিত মতবাদের ছেদ পড়ায় সে পথ বর্তমানে খুলে গেছে।”

মূলতঃ ইকোলজী (বৃক্ষ ও তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক) এবং বৃক্ষের শরীরবৃত্ত সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে একজন রিসার্চ ফরেটার হিসাবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি গহিন অরণ্যানীর মধ্যে যেসব বিষয় লক্ষ্য করেছি তারই কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি এখানে :

আরণ্যক সৃষ্টিকা পুনঃ সৃষ্টির অ্যাড্রিনডাক পর্বতে মূলতঃ হিমালী প্রবাহের ফলে গভীর বালুকারাশির সৃষ্টি হয়। এখানকার নিজস্ব অরণ্যের নীচের সৃষ্টিকা, দুর্বল থেকে মাঝারী রকম পডজেলিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলে। জৈবিক উপাদান যে অংশ ধরে রাখে তা ছাড়া মূল পোশাকগুলি, বিশেষ করে পটাশিয়াম, খনিজ বিয়োজন কর্তৃক যত তাড়াতাড়ি বিমুক্ত হয় ততই তাড়াতাড়ি সৃষ্টিকা থেকে অপসৃত হয়ে থাকে। এইসব “বালুকা প্রান্ত”-এ এককালে স্প্রাস, পাইন ও হেমলকের বন ছিল। কিন্তু অনুকূল ভূ-সংস্থান ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কৃষিকার্যকে সহায়তা করে। একশ' বছর ধরে ব্যাপকভাবে এ অংশে কৃষিকাজ হয়। ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস পায়। অবশেষে এসব প্রান্তর পরিত্যাগ করা হয় এবং পুনরায় বন সৃষ্টির জন্যে চারাগাছ লাগানো হয়।

স্প্রাস ও স্বেত এবং লোহিত পাইনের চারাগাছ লাগানোর কয়েক বছর পর, মাটিতে পটাশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ দেখা দিল। আরও তদন্তের পর দেখা গেল যে, সেখানকার কতিপয় বিশেষ ধরনের গুল্ম, যেমন ধূসর বার্চ এবং বুনো ব্লাকবেরী তাদের পত্রগুচ্ছে পটাশিয়াম কম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করেছে। এই অস্বাভাবিক বর্ণগ্রাহ্যকে ভবিষ্যতে বন লাগানোর জন্যে কোথায় উপযুক্ত স্থান হতে পারে, তাই নির্বাচনের কাজে প্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আল্লাহর সৃষ্টিধর্মী (আমি বর্তমানে, সক্রিয় অর্থে সৃষ্টিধর্মী শব্দটির ব্যবহার করছি) নিয়ম-শৃংখলায় মানুষের বিশৃংখলাকে পুনরায় সুশৃংখলাবদ্ধ করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। শুধু যে

কোথায় শ্রাস, লোহিত ও শ্বেত পাইন সাগানো চলবে না, তিনি তারই উপযুক্ত নির্দেশের ব্যবস্থা করেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি আরও জামিয়ে দিচ্ছেন, জমির পটাশিয়ামের পরিমাণ কম থাকলে সেখানকার উপযোগী অর্বকরী বৃক্ষ — কচ, ওজ্যাক, পাইন সেখানেই জন্মানো যেতে পারে। আরও দেখা গেছে, আত্মো পোগান ঘাস, বুনা ট্রবেরী কতিপয় গুল্ম এবং এমনকি শ্বেত পাইনের পত্র-গুচ্ছকে জমির উর্বরশক্তি নিরূপণের জন্যে আংশিক হিসাবে বিশ্লেষণ করা চলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শ্বেত পাইনের সূচীতে যখনই শতকরা ০.৫% কে (পটাশিয়াম) —এর কম হয় তখনই ঘাটতির লক্ষণগুলি পাইন প্রকাশ করে থাকে। এই পূর্ণকের মৃত্তিকায় পরিবর্তনশীল 'কে'-র ৩০ পি পি এম-এর সঙ্গে সম্পর্ক বিদ্যমান।

এছাড়া আরও একটি প্রপঞ্চ পর্যবেক্ষণ করা যায়। শ্বেত বার্চ সাধারণতঃ এক আগাছা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, যত্রতত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ ছড়ায় এবং বেশ কষ্ট করে সমস্ত জমিতে জন্মে থাকে। কিন্তু এইসব নার্স রুগী শ্বেত বার্চের পত্রপল্লবের মুকুটের নীচে সাদা পাইনও বীজ ছড়ায় এবং বার্চের ছায়ায় পাইনের অসংখ্য চারা জন্মায়। বার্চের চারদিকে পাইন গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, কিন্তু তা শুধু বার্চের মুকুটের চারদিকে; মুকুটের নীচে কোন চারা গাছ রুকা পায়না। তারপর এইসব বৃক্ষের মাথায় পটাশিয়াম ঘাটতিরও কোন লক্ষণ নজরে পড়ে না। মৃত্তিকা ও পত্রগুচ্ছ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পরিভ্রমণশীল পটাশিয়াম খোলা জায়গার মাটির চাইতে বার্চ পাইনের তলার মাটিতে তিনগুণ বেশী এবং পত্রগুচ্ছ মৌলিক পদার্থের পরিমাণের তারতম্য উভয় অবস্থার জন্যে পরিসংখ্যানের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব দেখা যাচ্ছে, শ্বেত বার্চের খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা কৃষির পক্ষে অনুপযুক্ত-মৃত্তিকায় পোষক পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করতে সক্ষম এবং তাই করছে, এবং খনিজ পোষক “মৃত” অজৈব জড়পদার্থও প্রাণ জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর বা আগ্নাহর সেতুবন্ধ।

অনুরূপ অংকুরণের প্রভাব কানেকটিকাৰ্চ উপত্যকায় পরিলক্ষিত হয়। সেখানে ইষ্টার্ণ রেড-সিডার, অতি নীচপ্রাণী কেঁচোর সহযোগিতায় জমিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করে থাকে। রেড-সীডারের পাতা বনের তলদেশে (মাটির উপর) ক্যালসিয়াম জড়ো করে। অবশ্য রেড-সীডারের পাতা, অংশ হিসাবে উপরেই থাকে। যাই হোক, পত্রগুচ্ছের অত্যধিক চুনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেঁচো তাড়াতাড়ি সব পাতা খেয়ে হজম করে কেলে এবং হজম করতে গিয়ে উদ্ভিদ জন্মাবার জন্যে তৈরি পোষক হিসাবে ক্যালসিয়াম দেহ থেকে বের করে দেয়।

রেড-সীডারের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র জমির পোষক যে প্রভাবান্বিত হয় তাই নয়, অধিকতর মাটির যে সকল বৈশিষ্ট্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী যেমন— হিঙ্গ্রময়তা, অনুপ্রবেশ হার, বার্চের ক্ষমতা, উচ্চতার পরিমাণ, সকল বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয়।

কিন্তু হারানো মাটি পুনরুদ্ধারের জন্যে যে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা রয়েছে, তৎসম্পর্কে অনেক কথা বলা যেতে পারে। (এখানে কি মানুষের সাদৃশ্য আছে?) মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চিরস্থায়ী অবস্থায় অরণ্য বিরাজমান। আর এর যথার্থ দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাউথল্যান্ডের ওক-হিকোরীর বন এবং আলীয়েনীজের বীচ-বার্চ-ম্যাপল বন। মানুষ, আন্তন বা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে আবহমানকাল ধরে এই অরণ্য বিদ্যমান থাকতো। মানুষের প্রভাবে কাঠের জন্যে উপযোগী যে বন, তা অদৃশ্য হয়ে সেখানে ফসলের ক্ষেত অথবা চারণভূমি গড়ে উঠে। এতে করে বৃক্ষের আর মাটির উভয়ের ক্ষতিসাধিত হয়। তার পরই বন্যা দেখা দেয়।

মানুষ বড় বড় বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে, বহু অর্থ ব্যয় করে বাঁধ তৈরী করে বন্যার ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার প্রয়াস পায়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা, শুধুমাত্র এক বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে সাময়িক বাধাবরূপ— যে শক্তির মুখে কোন প্রকার পাথরের, কংক্রিটের প্রাচীর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সত্যিকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, সমস্যার উৎস থেকেই তার সমাধানের প্রয়োজন। সে সমাধান বাঁধ তৈরী করে নয়— সমাধান হতে পারে জমিতে বৃক্ষ রোপণ করে। অবাধে এমনিভাবে বন লাগিয়ে জমি উদ্ধার করা যেতে পারে। বন্যাপ্রাণিত মাঠ পরিভ্যস্ত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই সেখানে ঘন হয়ে ঘাস, লতাশুল্ল, বোপ-ঝাড় এবং চারাগাছ মাটি ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং নিজেদের পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ করে। অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের পেডমেন্ট প্রদেশের নিম্নাঞ্চলে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে জমির উপরে নতুন সুস্পষ্ট সবুজ দিগন্তের সৃষ্টি হয়। এমনকি শীতপ্রধান জলবায়ুতে, যেখানে জৈবী-পচন অতিশয় ধীরে ধীরে হয়ে থাকে, সেখানেও এমন সবুজে ঢাকা দিগন্ত কিরে পেতে পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় লাগে না; যদিও এই মাটি বন্যা প্রতিরোধে সক্ষম পূর্বেকার অক্ষত জমির মত শক্তিশালী হতে পারে না, তবুও এর উদ্ধারকার্য এক মহৎ কাজ।

গোটে বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ ‘প্রকৃতিতে ঈশ্বরের কোন অবকাশ নেই। সব সময়েই সত্য গভীর আর কঠোর। প্রকৃতি সব সময় সত্য পথে থাকে, যদি কোন গলদ বা ভুলত্রুটি হয় তবে তা আমাদেরই প্রাপ্য। অব্যোধ্যতাকে সে সব সময় অবজ্ঞা করে, কিন্তু যথার্থ উপযুক্ত, সত্যপ্রিয় ও খাঁটি ব্যক্তির কাছে নিজের সকল গোপন রহস্য মেলে ধরে।’

বনের আঁধার পুনঃসৃষ্টি : বর্তমান শতকের প্রথম দুই যুগে যখন ‘এনডোথিয়া’ নামক চেষ্টনাট বৃক্ষের এক প্রকার রোগ খুব ক্ষিপ্ৰতার সংগে বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, তখন বনের উপরিভাগের সবুজ আচ্ছাদনে অনেক ফুটো পরিলক্ষিত হলো এবং ধারণা জন্মালো, এ সব ফুটো আর কখনও বন্ধ হবে না। মার্কিন চেষ্টনাট যে অনবদ্য স্থান দখল করেছিল, অন্যকোন প্রজাতির কাঠের পক্ষে সে স্থান লাভ করা একেবারেই

ছিল অসম্ভব। এ থেকে অত্যন্ত উঁচুদরের পচন প্রতিরোধ কাঠ, কাঠের মণ্ড, কাথ, সুপুঁরি ও ঘন ছায়া পাওয়া যেতো এবং এর সবই প্রায় ব্যবহারে লাগতো। চেষ্টানাট একাধারে পর্বতের অনূর্বর উপরিভাগে আবার উর্বর উপত্যকার সমতলভূমিতে বিপুল পরিমাণে জন্মাতো। আনুমানিক ১৯০০ সালে এশিয়া থেকে এনডোথিয়া রোগ পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত কোন বিছুই চেষ্টানাটকে আক্রমণ করেনি। চেষ্টানাট যথার্থই বনের রাজা ছিল। এখন বনের বৃক্ষ হিসাবে চেষ্টানাট প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। একদিন যে বিশাল কাণ্ড মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো, এখন সে কাণ্ডের ছেদিত অংশ থেকে গজিয়ে উঠা সামান্য অবশিষ্ট ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না—পরম পরাক্রমশালী মানুষ তথা বৃক্ষ যে কি শোচনীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছতে পারে, এ যেন তারই পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু বনের আঁধারে এভাবে যে ফুটোর সৃষ্টি হয় ক্রমশঃ তা আবার ভরে যায়। কারণ, টিউলিপ বৃক্ষগুলি সূর্যের কিরণ নীচে পর্যন্ত পৌঁছার জন্যে বনের সবুজ আচ্ছাদনে এমনি ফাঁকেই অপেক্ষা করছিল। টিউলিপ বৃক্ষ হচ্ছে ছায়া অসহ্যকারী বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর পূর্ব পর্যন্ত এগুলি বনের মধ্যে সামান্য অংশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। তবে এখানে ওখানে দু'একটা আলোবাতাস পেয়ে মূল্যবান কাঠের মইরূপে পরিণত হয়েছিল। এখন অবশ্য, যেখানে টিউলিপ বৃক্ষের গহন বন সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে চেষ্টানাট বৃক্ষ কদাচিৎ মানুষের দৃষ্টি এড়ায়। অনেক সময় টিউলিপ বৃক্ষ বহুরে এক ইঞ্চি ব্যাস আর উচ্চতায় ছ'ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হলেও চেষ্টানাট সে বনে অদৃশ্য নয়। টিউলিপ চেষ্টানাট থেকে শুধু যে তাড়াতাড়ি বাড়ে তাই নয়, উঁচুদরের কাঠও টিউলিপ থেকে পাওয়া যায়। বোটারী কাঠ আন্তরগণের গন্ধে খুবই উপযোগী। প্রকৃতির মহাপরিকল্পনা কি একাধিক ঘটনাবলী সমন্বয়ে কার্যকরী হয়ে থাকে?

চেষ্টানাট বনের রোগাক্রান্ত এলাকা সম্পর্কে কি করা যায় সে সম্পর্কে একজন প্রবীণ ন্যাশনাল ফরেস্ট রেনজারের সংগে আমি আনন্দের সংগে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতাম। তিনি সারাক্ষণই বনের চাষ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তবলীকে ভুল বলে উল্লেখ করে সবাইকে ভৎসনা করতেন এবং প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্যে প্রকৃতি-পুস্তক চোখের সামনে মেলে ধরার উপদেশ দিতেন।

আইজাক ওয়াটস্ হৃদ্যবদ্ধভাবে তাকে প্রকাশ করেছেন :

খোলা পুস্তক হাতে প্রকৃতি রয়েছে দাঁড়িয়ে
তার সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা দিতে ছড়িয়ে।

প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিদ্যাবিদ আসাঞ্চে ১৮৮০ সালে তাঁর ইয়েন লেকচারে এ কথাই আভাস দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “কোন খৃষ্টান আন্তিক এ কথা স্বীকার করবেন না যে, বিজ্ঞান অতিপ্রাকৃত থেকে প্রকৃতিতে যা কিছু অসাধারণ করে তা আন্তিকতায় ইরিয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির গতির সংগে তার গতি মিলিয়ে নেয়ার

সংগে, প্রকৃতির সংগে তার গতি ব্যাহত হওয়ার সংগে নয়..... এ হচ্ছে বিজ্ঞানের কাজ ও বিশেষ অধিকার..... ঘটনা ও প্রপঞ্চের উল্লেখ করা; তবে প্রথমে নয়, বরং পবিত্র ইচ্ছার কাছে সর্বশেষ অবলম্বন হিসাবে আশ্রয় গ্রহণের জন্যে।”

মূল সৃষ্টির উপর নতুন আলোকপাত : উদ্ভিদের মধ্যে হর্মণ রয়েছে। যা নাকি বিভিন্ন উপায়ে কাজ করে থাকে। অনুরূপ যৌগিক পদার্থের একটি মাত্র মিশ্রণ ২-৪-৫ টি বিলাতী বেগুন পাকানোর কাজ করে, শুদামজাত গোল আলু থেকে অংকুরোদগমে বাধা সৃষ্টি করে, সজ্জাজাত কলম থেকে শিকড় গজাতে উৎসাহিত করে এবং সম্ভবতঃ অনাবিকৃত আরও অনেক বিপাকীয় কার্যাবলী এর রয়েছে। এ হর্মণ বা সঠিকভাবে বলতে গেলে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক—যেহেতু এ হর্মণের মতই আচরণকারী সাংশ্লেষিক জৈবিক মিশ্রণ; এ নিয়ে তাই বর্তমানে আমাদের গবেষণাগারে পুংখানুপুংখভাবে গবেষণা হচ্ছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সাংশ্লেষক যে অণু প্রস্তুত করে, মানুষ যখন তার খুব কাছাকাছি পৌঁছার ভান করতে পারে মাত্র তখন এ থেকে একধাই প্রমাণ হয় যে, এ সৃষ্টি, প্রকৃত নিয়মবদ্ধ সৃষ্টির স্বাক্ষর।

আমরা বিশেষ করে, বনের বৃক্ষসমূহে এ যৌগিক পদার্থের তেজস্ক্রিয়তুল্য পদার্থের ধর্মে আশ্চর্যহীন। পদার্থ শ্রেণীতে যে শেষ কার্বন বা অংগারক (সি- ১২)-এর প্রদর্শিত হয়ে থাকে, তা দুর্বল বেটা এমিটার আইসোটোপ (সি-১৪) এর সংগে সাংশ্লেষিকভাবে পরিবর্তিত হয়। সি- ১৪ কে আটকানো নির্দেশক হিসাবে নিয়ে পাতা থেকে কাণ্ডে—তার পর মূলে পথ ও গতির বেগ সহজেই পাওয়া যায়। একজন আন্তেরবাদীর কাছে এ শুধুমাত্র ম্যাজিক মনে হলেও আমাদের কাছে কিন্তু এ আল্লাহর নির্দেশকারী ক্ষমতার পরিচায়ক।

এ গবেষণায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বৃক্ষের মধ্যে দৃশ্যতঃ ভাগ্যে যাই থাক না কেন উক্ত যৌগিক পদার্থ ২-৪-৫ টি হিসাবেই থাকে। রাসায়নিক বিনিময়ের দ্বারা এ যৌগিক পদার্থ অন্যান্য যৌগিক পদার্থের শতকরা দশভাগের কম অংশে পরিণত হয়। সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, পাতার উপরিভাগে মাত্রা যাই হোক না কেন, বৃক্ষ তার সামান্যই গ্রহণ করে থাকে। উদ্ভিদ বাহ্যতঃ বিপাকীয় স্রোতের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে প্রবিশ্ট হবার প্রয়োজন কেবলমাত্র তারই জন্য ভিতরে প্রবেশের পথ করে দেয়। এ কলাকৌশল যে প্রশ্নের অবতারণা করে তা যারা মহাবিশ্বের অনাবিকৃত বিরাট গভীরে এক সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী সৃষ্টিকর্তার নিয়ম ও শৃংখলাবদ্ধ সমগ্র প্রকৃতিতে জবাব খোঁজে তাদের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ।

কাগজের বর্ণ চিত্রগ্রহণ (সমাবেশিত বর্ণের ওজ্জ্বল্য) সম্পর্কিত কলাকৌশল দ্বারা আমরা ২-৪-৫ টির জন্য পরীক্ষা করি। এ পদ্ধতিতে একটি পরিস্রাবক কাগজের ডোরার শেষে, খুব কাছে অজানা পদার্থের একটি ফোঁটা ফেলা হয়। এ অংশটি তারপর

‘ডেভেলপার’-এর পাতা রাখা হয় এবং অপর প্রান্তটি পাতার বাইরের দিকে উপর দিয়ে ঝুলতে থাকে। ক্যাপিলারিটি (অণুর, জড় পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকার পারস্পরিক আকর্ষণের) দ্বারা ডেভেলপার সম্পূর্ণ শুষ্ক যায় সেই সংগে উক্ত ফোঁটায় যে সব পদার্থ ছিল তাও শুষ্ক যায়।

বর্ণ-চিত্র গ্রহণ সম্পর্কিত মানচিত্রে, একটি বিশেষ স্থানে প্রতিটি জৈবিক উপাদান জমা হয়। ক্যাপিলারির বাষ্প প্রক্রিয়া যতই এগোয় ততই সেখানে আর কোন মিশ্র পদার্থ দেখা যায় না। হয়ে গেছে, ছবি এবারে শেষ। এবারে কাগজের উপর দিয়ে একটি গেইগার কাউন্টার অতিক্রম করে যায় এবং সি-১৪ কোথায় তা নির্দেশ করে।

এখানেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, প্রকৃতিতে আকারের ক্রমিক ও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা এবং হেলিস কর্ডক অভিজিত ‘পূর্ণতার মূলতত্ত্ব’ হচ্ছে এই।

এখানে জৈবিক অণু সি-১৪ পরমাণু এবং পরিশেষে কাগজের উপরকার পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বাদ দেওয়ার পর ততে প্রত্যাদেশ সম্পর্কে যথার্থ অনুসন্ধিৎসুর জন্যে এ দৃষ্টান্তই মেলে ধরে যে, বিজ্ঞানের মারকত মিঞ্জের মধ্যে কোন বাস্তব দৃন্দ থাকতে পারে না। আল্লাহ বিজ্ঞান ও আল্লাহতে মানুষের কাছে প্রকাশ করেনঃ এখানে বর্ণিত এমন সব মহান কাজের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। মহান ঋষি-দার্শনিক পলের ভাষায়ঃ ‘তিনি (বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রকাশপ্রাপ্ত আল্লাহ সব কিছু সামনে রয়েছে; এবং সব কিছুই তাঁর দ্বারাই গঠিত।)’-পেটার্স টু ইয়ং চার্চেস-এ ফিলিপ অন্য এক জায়গায় এই পলকে মুক্ত সাবলীল অনুবাদ করতে যেয়ে সহজতম ভাষায় বলেন : যথার্থই তিনি সত্যকে সহজ করে তুলে ধরেছেন। কারণ, দুনিয়া সৃষ্টির সূচনা থেকে আল্লাহর যেসব অদৃশ্য গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন তাঁর অনন্ত ক্রমতা ও ঈশ্বরত্ব প্রভৃতিতে— তিনি যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সাধারণত দুনিয়ায় যা কিছু দেখা ও জানা যায়, সব কিছুতেই তিনি অত্যন্ত সহজভাবে ও অনায়াসে বোধগম্য। (কল ১ঃ) ১৭; রোম ১৭ঃ রোম ১ ২০।

ফলবাগানের মালিক-পুত্র যা শিখেছিল

[ওয়ার্ল্ড'স এডওয়ার্ড ল্যামার্টস। সুপ্রজননবিদ্যাবিদ : বি,এস,সি,পি,এইচ,ডি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। আমন্ত্রিত নাসারিজ, অক্টেব্রিও; ক্যালিফোর্নিয়ার সাবেক রিসার্চ ডিরেক্টর; শোভাবর্ধক উদ্যানবিদ্যার অধ্যাপক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লসঅ্যাঞ্জেলেস; দেসকানজো গার্ডেনস লা কানাডা, ক্যালিফোর্নিয়ার রিসার্চের ডিরেক্টর; ১৯৪৫ থেকে দেসকানজো ডিটিবিউটস, জামেইনস অ্যান্ড আমলিং— দ্য ভর নাসারিজ, লিভারমোর, ক্যালিফোর্নিয়ার গোলাপ সম্পর্কিত গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক। শোভাবর্ধক উদ্ভিদ, বিশেষ করে গোলাপের প্রজননে বিশেষজ্ঞ।]

সব্বত “কেন আমি খোদাকে বিশ্বাস করি?” এ প্রশ্নের খাঁটি জবাব হবে, “কারণ আমার আকা-আন্না আমাকে তাই বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন।” পবিত্র আত্মা এমনি বাস্তবিকভাবেই কাজ করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা সে সংগে আমাকে স্যাঁটা কুজ্ঞ অর ইটার বানিজ-এও বিশ্বাস স্থাপন করতে শিখিয়েছেন। বড়ই দিন বেতে লাগলো, যদিও আমি ছেলবেলাকার এসব চিন্তাকর্ষক রূপকথার কাহিনীর মধ্যদিয়ে দেখছিলাম, তথাপি আল্লাহর সৃজনী জ্ঞান আর ক্ষমতায় আমি অধিকতর বিমুগ্ধ হই।

ফলের বাগানকারীর ছেলে হিসাবে বিভিন্ন ধরনের আপেল গীচ ও নাশপাতির ব্যবহার এবং কেন্নে উইকের পূর্বে ওয়াশিংটন অঞ্চলের শূন্য ডিগ্রীর নীচে আরো ২০° তাপমাত্রায় আংশিকভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি আমাকে মস্তমুগ্ধ করে দিতো। সারা শীতকালে মনে হতো যেন এসব গাছ একেবারে মরে গেছে; তারপর প্রতিটি বসন্তের সমাগমের সংগে সংগে তারা থোকা থোকা অঙ্কুরকমের সুন্দর সুন্দর ফুলে যখন সাজতো তখন সেই মনোরম দৃশ্য আমাকে করে তুলত রোমান্সিত। কিন্তু যেহেতু এসব ফলের গাছ আমাদের জলবায়ুতে সম্পূর্ণ সহনশীল নয় তাই বিলম্বিত তুষার অনেক সময় এ ফুলকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দিতো এবং সেবার বাগানে আর ফল ধরতো না। পরিণামে আমাদের ছোট উপত্যকাটির মানুষকে তখন বড় কষ্টে কালাতিপাত করতে হতো।

এসব দেখে হরহামেশা গোড়া থেকেই আমার মনে এমনি একটি চিন্তা দোলা দিত—আম্মা আল্লাহ যদি ভালই হবেন তাহলে তিনি কেন বার বার এমনিভাৱে ফসলের ক্ষতি হতে অনুমতি দেন? শিগগীরই এ প্রশ্নের জবাব মিলল : এতে আল্লাহর দোষ নেই; দোষ মানুষের। আমাদের কেন্নে উইকের জলবায়ু যেসব ফলের ভাল করে সহ্য হয় না, আমরা সেগুলিকে জন্মাতে চেষ্টা করছি। যেসব স্থানে মূলতঃ এ ফল জনে

সেখানে তুষারের ভয় শেষ হবার পর, শীতের শেষে গাছে ফুল ফোটে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যদিও সব ফলই নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে জন্মায় তা হলেও প্রতিটি পদের ফলের এ জলবায়ুর সহনশীলতা অত্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং একমাত্র এ কারণেই কেবলমাত্র সতর্কতার সঙ্গে বৃক্ষ জন্মানো এবং তাদের নির্বাচনের মাধ্যমেই পরিবর্তিত জলবায়ুতে তারা সহনশীল হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে নিশ্চয় করে বলা চলে যে, সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কেবলমাত্র তাদের মূল পরিবেশের জন্যই সৃষ্টি হয়নি, অধিকন্তু জন্ম বা উৎপত্তিবিষয়ক স্থৈতিক পরিবর্তন—কমতার অসম পরিমাণসহ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে, যাতে করে উদ্ভিদ ও প্রাণী অন্যকোন পরিবর্তিত জলবায়ুতে নিজেদের সহনশীল করে নিতে পারে, তারই জন্য এ ব্যবস্থা বিদ্যমান। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতাকে পর্যবেক্ষণ করাকেই জাতি বিশেষের জন্ম ও বংশ সঞ্চরীয় বিদ্যা বলে অভিহিত করা হয়। তারপর পীচের বীচির চারার জাতি প্রকারান্তর জন্মাতে যেয়ে, ছেলেবেলায় যেসব পল্লীকা-নিরীক্ষা করেছি এবং গবেষণা করেছি, তাই আমাকে এ সম্পর্কে যত বেশী পারি জানার জন্য আগ্রহী করে তোলে।

পীচ বৃক্ষের ও রকমারী ফুলের বর্ধিষ্ণু বীচির চারা ছাড়াও আমি বিভিন্ন শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ খুব আগ্রহী ছিলাম। বিশেষ করে পর-পরাগ ঝোণ সাধনের জন্য দারী মৌমাছি ও তাদেরই ক্ষুদ্রাকৃতি মক্ষিকা-মাছি (বোম্বি লীডি) ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম। কি করে এ সমান্তরাল পরিবর্তন সাধিত হলো। কীট-পতঙ্গের সহজাত প্রকৃতি ও তাদের সামাজিক জীবনের জটিল সব ধরন সম্পর্কে জন হেনরী ক্যাব্রে তার চিন্তাকর্ষক সব বইয়ে প্রকৃতির অত্যন্ত আশ্চর্যজনক সব পরিকল্পনার আরো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

এ সবের ভিতর দিয়ে এটা সমানভাবেই সুস্পষ্ট যে, কোন একটা বিপরীত শক্তি মানুষকে দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যবহার এমনভাবে বিপণ্যময়ী করছে অথবা নিদেনপক্ষে বিকৃত করছে, যার ফলে অনেক সময় কোথাও অতিরিক্ত শিপড়া অথবা অপব্যাপ্ত সংখ্যক মৌমাছি হয়, কোথাও ফল জন্মে না, আবার কোথাও এত বেশী ফল হয় যে, আমরা বিক্রি পর্যন্ত করতে পারি না। মাটি, যার উর্বরা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণে আগাছারূপী কসল জন্মিয়ে চলেছে। কিন্তু কেন এমন হবে? এর জবাব অবশ্য প্রকৃতি দেয় না, জবাব পাওয়া যায় বাইবেলে। মাটির বুকে মানুষের (আদমের) পতনের দিন থেকে এ মৃত্তিকা ও প্রকৃতির উপর সাধারণভাবেই ঐশ্বরিক একটা অভিলাপ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আত্মাহর আশ্চর্য ক্ষমতা ও মণীষাকে সুস্পষ্টভাবে আমাদের দেখিয়ে দেওয়ার জন্য সৃষ্টির মূলের অন্তর্নিহিত কল্যাণ এখনও যথেষ্ট অবশিষ্ট রয়েছে এবং যাতে করে পৃথিবী তার সাবক সৌন্দর্য আর পূর্ণতা ফিরে পায়, সে জন্য যতটা আমাদের ক্ষমতায় কুলোয় ততখানি সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

আমি যখন কলেজে ভর্তি হই তখন আমার এই ছিল দর্শন। কলেজে এসে আমি জড়বাদী অভিব্যক্তিবাদের সংস্পর্শে আসি। আল্লাহর সৃজনী ক্ষমতার প্রমাণ হিসাবে প্রকৃতির যাবতীয় পরিকল্পনায়, বিশ্বাসের স্থলে একমাত্র এই জড়বাদী অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত দর্শনই নতুন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথার্থই চেষ্টা করে। পরিণামে দীর্ঘ কয়েক বছর আমারও চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ কতিপয় গ্রাজুয়েট ছাত্রের মধ্যে মানসিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। কতকগুলি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এই যেমন— জাতি বিশেষের জন্ম ও বংশ সম্পর্কিত চার্লস ডারউইনের বিজ্ঞান (প্রজাতির উৎপত্তির) এর দু'টি মৌলিক অঙ্গীকার। (১) প্রত্যেকটি বংশের তরুণ জীব, সবদিকে সারাক্ষণ তাদের পিতা-মাতা থেকে সামান্য একটু পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা করছে এবং (২) পরবর্তী বংশ উত্তরাধিকার হিসাবে অনুকূল পরিবর্তন লাভ করে এবং যে পর্যন্ত ব্যাপক পরিবর্তন গড়ে না উঠে, ততদিন তা জোর দিয়ে প্রকাশ করে— এতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে কোন প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণ করে না।

বস্তুতঃ পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান ও খৃষ্টান-বিশ্বাস নামক আমাদের বইয়ে ডব্লিউ, জে, টিংকল ও আমি, বিস্তারিতভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি যে, নির্বাচিত প্রজনন দ্বারা তাড়াতাড়ি যেকোন উদ্ভিদ বা পশুর পরিবর্তন ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছানো যায়। উদ্ভিদে আত্ম-পর্যায় যোগ অথবা পশুতে অতি ঘনিষ্ঠ জন্তু কর্তৃক প্রজননের ফলে পরিবর্তন খুব কম তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়। আকস্মিক পরিবর্তন ছাড়া এভাবে প্রজননের ফলে একই রকম উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম হয় এবং এতে করে ডারউইন কর্তৃক স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া সম্ভব্য সকল দিকে ক্রমশঃ অমিল সৃষ্টি হয় না। তবে তাদের সে আকস্মিক পরিবর্তনকেই বিবর্তনবাদীগণ অত্যন্ত অগ্রহ সহকারে অবঘাতনের বস্তুতাত্ত্বিক ভিত্তি বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সত্যিই কি এগুলি অবঘাতনের বস্তুতাত্ত্বিক ভিত্তি অনেক জীবের উপর এদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার ফলে, বিশেষ করে ফলের মাছি— ড্রোসোফিলা মেলানোগ্যাটারে, এরূপ আভাস দান করে যে, অধিকাংশ পরিবর্তনই হচ্ছে প্রাণঘাতী। অপ্রাণঘাতীগুলির মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ পরিবর্তন অথবা নিদেনপক্ষে নিরপেক্ষ; যা নাকি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে একত্র করে এবং যা স্বাতন্ত্র্যের সাধারণ রূপতাকে হ্রাস করে। অতএব, এমনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিবর্তনগুলি একত্রিকরণের ফলে, প্রজাতি গঠনের জন্য যে ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন, তা কমই পাওয়া যায়।

কদাচিৎ ফলের মাছির “ইভারেস্ট” নামে অভিহিত ডানায় পরিবর্তনের ফলে অবশ্য অধিক ভায়াবিলিটি (বাঁচবার ক্ষমতা) -১০৪%, ৭৫-৭০ ফারঃ-এ দেখিয়ে থাকে, কিন্তু ডানার গঠন সৃষ্টি করতে পারে, এমনি অন্যের সঙ্গে এর মিলনের ফলে যেসব মাছি জন্মায়, তাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাঁচার ক্ষমতা কম হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তা ধরা যায় যে, ১০% ভাগ সুবিধা দান করে পরিবর্তন কদাচিৎ হতে পারে, তাহলে কথা থাকলো যে, একটি প্রজাতিতে কত তাড়াতাড়ি তার একত্রিত হতে পারে? প্যাটাও

(অভিব্যক্তিবাদের গাণিতিক বিশেষণ) দেখিয়েছে যে, একটি জাতির প্রজনন সভ্য হতে হলে, এই নতুন পরিবর্তনের জন্য প্রায় ১০০০,০০০ বংশের প্রয়োজন হবে। জুত্ববিদগণ যে বিরাট সময়ের কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিয়েছেন, যদিও বা এমন পরিবর্তনের জন্য সেই দীর্ঘ সময় দেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয় করে বলা যায় যে, ষোড়শ মত তুলনামূলকভাবে আধুনিক প্রাণীর পক্ষে ইওকীন যুগ হতে এ সময়ের মধ্যে কল্পিত পাঁচ খুর বিশিষ্ট কুকুরের মত চেহারার পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমানের রূপ নেওয়া কত কঠিন।

সবশেষে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জটিল সব কাঠামোর গবেষণার কলে, যাকে বর্ণের সাহায্যে নিরূপণ বিদ্যা (ক্রমোসমস) বলা হয়ে থাকে এবং যাতে দেহের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণকারী কারণগুলির অবস্থান নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তাতে তাদের গঠন ও নমুনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ধরা পড়ে। এমনকি, ড্রসোকিলা মেলানোগ্যাস্টার ও ড্রসোকিলা সিটোডোঅবস্কিউরা (ফলের মাছি)-এর মত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রজাতি দু'টির মধ্যেও এ পরিবর্তন দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে ডবজানসকী তাঁর “জেনেটিক্স অ্যান্ড দি অরিজিন অব স্পেসিস” (সুপ্রজনন বিদ্যা ও অভিব্যক্তিবাদ)-এ বলেছেন: “উপর্যুক্ত উল্ট-পালট ও স্থান পরিবর্তন দ্বারা কতিপয় ক্রমোসম অংশ এতই ভালভাবে পুনরায় গঠিত হয়েছে যে, লালা ক্রমোসমে তাদের চাকতির নমুনার মধ্যে আর পরস্পর পরস্পরের কোন সাদৃশ্য মেলে না।” তাহাড়া ফলের মাছিতে, এ পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে উৎসাহিত হয়ে অথবা স্বাভাবিকভাবে সংগঠিত স্থান পরিবর্তন সম্পর্কে যত গবেষণা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে, যখন তারা সম-আকৃতির (প্রয়োজনীয় একই চরিত্র ও আকারের) হয়, তখন তাদের সবাই জীবনধারণে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাহলে কি করে ক্রমোসমের ব্যবস্থার এসব আকর্ষণীয় পার্থক্য এলো।

যদি প্রবন্ধের কলেবর নির্দিষ্ট না থাকতো, তাহলে এ সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য পরিবেশন করা যেতো। প্রমাণ করা সম্ভব হতো যে, আমরা প্রাণিজগতে যেসব পরিবর্তন দেখি, জড়বাদী অভিব্যক্তিবাদ সাধারণভাবেও তার কোন ব্যাখ্যা করতে পারবে না। এসব পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে একজন বর্ষা বিজ্ঞ স্ট্রিকটার দিকে নির্দেশ করে, যিনি জীবিত প্রাণিকে সামান্য একটু পরিবর্তনের ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। যে ক্ষমতার বলে প্রথমে তারা যে পরিবেশে জন্মলাভ করেছিল, তার চাইতে অনেক প্রতিকূল পরিবর্তিত দুনিয়ায় নিজেদের সামান্য পরিবর্তন করে বেঁচে থাকতে পারে।

সে যা হোক, প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করলে, সে কেবল নিজের স্ট্রিকটার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু এসব কিছুই মূলে স্ট্রিকটার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে, সে প্রশ্নের জবাব দিতে সে অক্ষম। যীশুর অন্যতম সহচর পল য়থার্থ বলেছেন, “এখন আমরা কাচের মধ্যদিয়ে আবছা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যখন সামনাসামনি হবো;— এখন আমি অংশ বিশেষ জানতে পারছি, কিন্তু তখন আমি জামব যে, আমি সেখানে অত্যন্ত পরিচিত।”

শত-পর্য্যাপ্ত প্রাণচঞ্চল দেহকোষ তাদের বার্তা শোনাচ্ছে

[রাসেল চার্লস আর্টিষ্ট । জীবতত্ত্ববিদ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ : বি, এস- সি, বাটলার বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এস-সি নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পি-এইচ, ডি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় । সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্কুরেট । ফ্রাংকফুর্ট অন দি মেইন, জার্মানী, কলেজের কয়েক বছরের অধ্যাপক; ১৯৫৩ থেকে নাশভিল, টেন-এর ডেভিডলিপস কব কলেজের জীবতত্ত্বের অধ্যাপক ও জীবতত্ত্ব বিভাগের প্রধান । ইভিয়ানা, টেনেসী ও টেকসাসের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সদস্য । জীবতত্ত্ব সম্পর্কিত কতিপয় প্রকরণ গ্রন্থ প্রণেতা ।]

প্রাণচঞ্চল দেহকোষগুলি অভিনিবেশ সহকারে পর্ববেক্ষণ করা, এক বিষয়কর অভিজ্ঞতা বলা যায়। সামান্য জলজ আগাছা 'ইলোভিয়ার' একটি পাতার অগ্রভাগ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার জন্যে বখান্ধানে রাখুন এবং তাকে খুব শক্তিশালী লক্ষ্যের নীচে নিয়ে আসুন। এক অতি মনোরম ও অত্যন্ত সুশৃংখল জীবনের প্রকাশ নজরে পড়বে। প্রত্যেকটি কোষ একেকটি জাঁক-জমকশালী কাঠামোরূপে দেখা যাবে। এ উদ্ভিদের পাতার অগ্রভাগে সাধারণতঃ দু'স্তর পুরু কোষ থাকে। কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ফোকাস করলে, দৃষ্টি সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি কোষের সীরা রেখা নজরে পড়বে। প্রত্যেক কোষ মনে হবে; স্বতন্ত্রভাবে একেকটি ইউনিট। মনে হবে প্রত্যেকটি কোষ বাহ্যতঃ তারই মত অন্যসব কোষের সাহায্য ছাড়া, স্বাধীনভাবে জীবনের কার্যকারবার চালিয়ে নিতে সক্ষম। প্রত্যেকটি কোষের পৃথককারী প্রাচীর যেমন ঋজু, তেমনি সম্পূর্ণ পাতাটি এমনি বহুশত কোষ দিয়ে ইটের পর ইট দিয়ে গাঁথা প্রাচীরের মত গড়ে উঠেছে।

বারবারই পরমাণুর গহ্বরের কেন্দ্রীয় পদার্থ স্তম্ভভাবে দেখা যেতে পারে। মনে হবে, কোষের গহ্বরের কেন্দ্রীয় শূন্যতার মধ্যে একটি অত্যন্ত পুরু ধূসর বস্তু যেন স্তম্ভ হয়ে বেরিয়ে আছে। তবে তা এর একেবারে ভিতরকার প্রান্তের চার দিক বিস্তৃত সিটোপ্লাজমের হালকা আবেষ্টনীর মধ্যে আটকে থাকে। আমরা জানি, কোষের পরই রয়েছে অত্যন্ত পাতলা ও ততোধিক নাজুক ঝিল্লী। সাধারণ অবস্থায় এটি দেখা যায় না। কারণ, কোষের মধ্যকার পানি বা কোষরস কঠিন চাপ দিয়ে একে কোষের প্রাচীরের সংগে মিশিয়ে রাখে। তবে যখন তীব্র শোনা পানিতে লাইড ডুবিয়ে দেওয়া হয়, ঝিল্লী তখন সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়ে। কারণ, পানিকে যখন বাইরের দিকে আকর্ষণ করা হয়, তখন ঝিল্লীর কোষের মধ্যকার সবকিছু সংকুচিত হয়। আমরা তখন বলি-যে কোষকে রক্তরসসিক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এখানেও গতি রয়েছে। একটি উদ্ভিদের পাতা বাইরে থেকে এ রকম কঠিন মনে হয় যে, তারই ভিতর এমনি গতির অবস্থিতি চিন্তা করাই এক রকম কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোষের সবচাইতে ভিতরকার প্রান্তে সিটোপ্লাজমিক ফিলের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নামে অভিহিত অতি ক্ষুদ্রকায় সবুজ বস্তু বিদ্যমান। একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে এমনি ক্ষুদ্রকায় প্রাণির মত ক্ষুদ্র এসব সবুজ বস্তু নিজেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাফেরা করায় না। তবে নদীর স্রোতে ভাসমান ডিংগী নৌকার মতো ভেসে বেড়ায়। এগুলি হচ্ছে জলীয় প্রোটোপ্লাজম, যা নাকি জীবিত ও চলমান। গতিমান জীবনের তাহলে এখানেই দেখা যাচ্ছে সাত্তিকভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই বিশেষ উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টের গতি একটি অভিব্যক্তি অবিচ্ছিন্নের সুস্পষ্ট পছা বলে মনে হয়। যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা জীবনকে চিনতে পারি তারই একটি গতি।

যে শক্তি বা শক্তির সমন্বয় এ চলমান প্রোটোপ্লাজমের স্রোতবিশীল মূল কাজ করে চলেছে, নিঃসন্দেহে আমরা তার কিছুই জানি না—না পারি আমরা আমাদের বর্তমান সীমিত জ্ঞান দ্বারা এ প্রণয়কে ভালভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে। কিন্তু প্রাণবস্ত বস্তু জগতে, সর্বত্র উদ্ভিদের কোষে ও প্রাণীর জীবকোষে এ প্রণয় পরিদৃষ্ট হয়। এ প্রণয়কে বলা হয় প্রোটোপ্লাজমিক স্রোতবিশীল অথবা অনেকের মতে আবর্তন বা সাইক্লোসিস। বিশেষ করে ইলোডিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক কোষ ও প্রাচীরের মধ্যে সবুজ প্রাসটিডগুলিকে চারদিকে ঘুরতে দেখে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত প্রোটোপ্লাজমের আবর্তনকারী স্রোত স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠে।

এবারে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উত্তম ব্লাইডের উপর অ্যামিবা জীব আছে এমনি প্রোটোজোন কালচারের ব পরীক্ষাগারে উৎপন্ন জীবাণুর বৃদ্ধিসাধন ব্যবস্থা থেকে একটি বিন্দু রেখে দিয়ে দেখুন, প্রোটোপ্লাজমের সেই একই আচর্যজনক প্রবহণ চোখে পড়ছে। অ্যামিবা জীব সাঁতার কাট না; নিষ্ক্রিয়ভাবে পানির বিন্দুর মধ্যে বা উপরে ভাসে না, আসলে এ যথার্থই প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদকোষের মতো, এই অতিশয় ক্ষুদ্র মুক্ত প্রোটোপ্লাজমের যা নাকি আসলে একটি প্রাণী, কোন ঋজু প্রাচীর নেই, আছে শুধু সীমিতকারী একটি ঝিল্লী। কলে এ প্রবাহিত হওয়ার কালে আকার পরিবর্তন করে এবং এর দেহের অংশ বৃদ্ধি পায়। এ প্রবাহিত হওয়ার কালে যেহেতু এর দেহ প্রথম একদিকে ও তারপর অপরদিকে বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত দেহাংশের সংগে যেহেতু কিছুটা কাল্পনিক সাদৃশ্য রয়েছে, তাই একে বলা হয় সিউডোপোডিয়া বা নকল পা। অণুবীক্ষণযন্ত্রে খুব বড় করে দেখলে দেখা যাবে, এ প্রাণিটি যখনই এগিয়ে যায়, তার সংগে পদার্থের আসল কণিকাকণ্ডলিও ঐ নকল পায়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এই সংগে প্রোটোপ্লাজমের পৃথক ঘনত্বের দু'টি অঞ্চল সনাক্ত করা যেতে পারেঃ একটি ভিতরকার অধিকতর হাল্কাগীন বা জলীয় অংশ, যা নাকি সারাক্ষণ গতিমান এবং অপরটি বাইরের আধা জড় বা জেলীয় মত অংশ বা প্রথম অংশকে প্রায় আবৃত করে রেখেছে। কতিপয়

বৈজ্ঞানিকের ধারণা, এ দু'টি ঘনত্ব একটা গতির সৃষ্টি করতে সাহায্য করে; বাইরের প্রাসমাসল ভিতরের জলীয় প্রাসমাসলকে চাপ দেওয়ার ফলে এটি প্রবাহিত হয়ে সিউডোপোডিয়া (নকল পা)-র মধ্যে ঢুকে যায়। আবার অনেকে মনে করেন যে, উপরিভাগের পোষণের ফলে এ গতির উৎপত্তি।

প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে যেয়ে প্রতিবছর গোড়াতেই প্রতিটি ছাত্র এ প্রপঞ্চকে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু আমরা তাদের বলতে পারি না, কেন এমন হয়। অ্যামোবয়েড গতির (প্রোটোপ্লাজমের সোলেশন ও জিলেশনের) প্রকৃতি ও কারণ হিসাবে যদি বা আমরা আগের খিওরী মেনে নেই, তাহলে আমাদের অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, আমরা আসলে শেষের বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুই জানি না— যা নাকি এর কারণ হতে পারে।

তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে, দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের কোষ রয়েছে : একটি হচ্ছে, সবুজ উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট এবং অপরটি, একটি স্বতন্ত্র প্রাণী- অবয়বী। অনেক দিন থেকে প্রত্যেকটি একটি সাধারণ কোষ বা ইউনিট। অনেক প্রাণিতত্ত্ববিদ অ্যামিবাকে সকল প্রাণীর মধ্যে আদিম প্রাণী বলে অভিহিত করেন এবং যথার্থই প্রাণী জগতে গমনের সকল উপায়ের চাইতে এর প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহ সর্বাপেক্ষা সহজতর। ইলোডিয়া যদিও একটি ছোট ফুলের গাছ, কিন্তু অনেক উদ্ভিদে যেমন সুস্পষ্টরূপে পৃথক করার উপযোগী কোষ থাকে, তেমনি এর কোষগুলি পৃথক করার উপযোগী নয়। অবশ্য আমরা বলতে পারি যে, সেগুলি হচ্ছে সাধারণ কোষ। তথাপি প্রত্যেকটি কোষ অত্যন্ত সুশৃংখলাবদ্ধ উচ্চারণের ব্যবস্থা দ্বারা স্ব-স্ব উপায়ে জীবনের প্রয়োজনীয় আর জটিল কাজগুলি সম্পাদন করে চলেছে এবং একই সংগে জীবনের অত্যন্ত সাধারণ যে গুণ— প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহ দ্বারা তা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে। প্রত্যেকটি কোষ এ কাজগুলি এমনি সুশৃংখলভাবে সম্পাদন করছে যে, সর্বাপেক্ষা সুন্দর ঘড়ির চলমান যান্ত্রিক কলা-কৌশল বা কল-কজার সংগে যদি তার তুলনা করা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি বা ঘড়ি অত্যন্ত কুৎসিত লাগবে।

ঘড়ির কথা যখন উঠলো তখন নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলা চলে, অনেক সুন্দর সুন্দর ঘড়ি রয়েছে। অনেক ঘড়ির আবার স্বয়ংক্রিয় চাবি দেবার ব্যবস্থা আছে- যে ঘড়ি একবার চলতে আরম্ভ করলে; যিনি সে ঘড়ি হাতে ধারণ করেন, তার হাতের নাড়াচাড়া আপনা থেকেই চলতে থাকে। ঘড়ির মত এমনি নিয়মনিষ্ঠ যন্ত্র যে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ, কোন সুদক্ষ কারিগরের মনে ও হাতের নৈপুণ্য ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, এ কথা সাফল্যের সংগে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এমন কি, স্বয়ংক্রিয় চাবি দেবার টাইমেও একথা বলা চলেনা যে, কেউ একে চালু না করে দিতেই, এটি চলতে শুরু করেছে। জীবন্ত কোষ সম্পর্কে যখন আমরা প্রশ্ন করি : “কি করে এই

অণুবীক্ষণিক অথচ অত্যাশ্চর্য কার্যকর ইউনিট আজকের এ রূপ নিল?" অথবা "কি করে এর গতি আরম্ভ বা সূত্রপাত হলো?" তখন আমরা এর সূচনা কি করে হলো এবং এর বিরামহীন স্বাভাবিক কাজের মূলে কি আছে, তার জবাব দিতে যেয়ে যদি যুক্তি-তর্ক দিয়ে একথা স্বীকার না করি যে, অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি মন; এর সব কিছুর অস্তিত্বের মূলে রয়েছে, তাহলে আমাদের এ বিষয়টির জন্যে ভয়ানক, এমনকি অজেয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এসব, এ সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষাই হচ্ছে খোদা- যার সঙ্গে অচিন্ত্যনীয় জড়জগতের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

নিশ্চিতভাবে বলার জন্যে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহকে প্রভাবান্বিত করে বলে মনে হয় পারিপার্শ্বিকতায়, এমনি বাইরের এবং বাইরোটিক কোন একটি শক্তি রয়েছে। কতিপয় গবেষণাকারী তাদের রিপোর্টে বলেন যে, বিচিত্র রকমের উত্তেজক- এই যেমন : তাপমাত্রা, সম্ভবতঃ আলো, অথবা অস্রাবনিক চাপ (সমাহরণের তারতম্যের ফলে সৃষ্ট চাপ) জ্যাক্স বস্তুর 'সোলেশন' ও 'জিলেশনকে' প্রভাবান্বিত করে, তবে তারা খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চয় করে বলে যে, প্রবহণ বিশেষ করে আবর্তন (চক্রাকার গতি) বাহ্যতঃ কোন প্রকার বাইরের উদ্দীপন ছাড়াই অনেক কোষের মধ্যে বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে। অতএব, মনে হয় এ অন্ততঃপক্ষে আংশিক প্রোটোপ্লাজমের নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন। শুধুমাত্র কেবল বাইরের সব উত্তেজকের সাড়া ছাড়া, এ কোষে আরো অনেক কিছুই আছে বলে মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরো জানি যে, একটি বিচ্ছিন্ন কোষ- যার মধ্য থেকে অনুব্যবচ্ছেদ দ্বারা নিউক্লিয়াস সরানো হয় তা শিগগিরই মরে যায়। একে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কোষের পরিচালনাকারীই যখন মরে গেছে, তখন কোষ কেমন করেই বা বেঁচে থাকতে পারে। ঠিক তেমনি কোষ সৃষ্টির জন্যে, এ মহাবিশ্বের সংগঠনকারীর প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে মূল কারণ সন্ধানকারী যুক্তিবাদী মানুষের মনের জন্যে।

কোষের প্রোটোপ্লাজমের সম্বন্ধীয় কাজের এ প্রপঞ্চকে বর্তমানে আমি জানি না অথবা বুঝতে জানি না বলেই যে আল্লাহ 'আছেন' আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি - তা নয়। অবশ্যই অনেকে এ যুক্তির সম্ভাবহার করে থাকেন যে, যেহেতু বিজ্ঞান জানে না কাজেই আমাদের আল্লাহ মেনে নিতে হবে। আমি কিন্তু এ যুক্তি মেনে নিচ্ছি না। যদি বা আমরা কোনদিন এ প্রবাহমান বস্তুর বর্তমান রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি এবং প্রাণবন্ত কোষ সম্পর্কে আরো নির্ভুলভাবে জ্ঞানলাভ করি, তাহলেও বুঝতে হবে, সূচনায় একে যিনি চালিয়ে দিয়েছেন এবং এর কার্যকরতা অব্যাহত রেখেছেন; আমরা কেবলমাত্র সেই বৃহত্তম মনকে আমাদের বুদ্ধিদ্বারা অনুধাবন করছি মাত্র - আর কিছু নয়।

জড়পদার্থ থেকে জীবকোষ প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় অনেক খিওরী উত্থাপিত হয়েছে। অনেক গবেষণাকারী দাবী করেন যে, নোটোজেনীয় (পল্টী পরিণতির) মাধ্যমে অথবা ভাইরাসের মাধ্যমে অথবা বৃহৎ প্রোটিন অণুর সমষ্টিকরণের ফলে -জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের দাবী থেকে এ ধারণাই থেকে যায় যে, অবশেষে জড় আর প্রাণবস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান তা একত্রে বাঁধা হয়েছে। যদিও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, জড়পদার্থ থেকে জীবন্ত পদার্থ সৃষ্টির সকল প্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আরও ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যিনি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন, তিনি প্রত্যেক প্রমাণ দ্বারা অপেক্ষমাণ বিশ্বকে এ কথা প্রমাণ করতে পারছেন না যে, পরমাণু ও অণুর সমষ্টিকরণের পরিবর্তনের নামই হচ্ছে জীবন এবং এখানে বর্ণিত কোষগুলি যেমন নিজেদের সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করতে পারে, তেমনি ক্ষমারও অধিকারী। একেবারেই একথা প্রমাণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তিনি এটি বিশ্বাস হিসাবেই ধরে নিয়েছেন। আমাদের সকলের কাছে সেসব ঘটনা স্পষ্ট প্রতীয়মান হোক, সে সম্পর্কে এ তার নিজস্ব ব্যাখ্যা মাত্র এবং তা হচ্ছে এই যে, আকস্মিক মিলনে প্রথম কোষটির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু যে মনীষা একে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিশ্বাস না করে; এ হচ্ছে তার চাইতে বৃহত্তর অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাস করার মত।

আমি মনে করি যে, প্রত্যেকটি কোষ (প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা) এত জটিল আর নাজুক যে, এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম এ পর্যন্ত গবেষণা থেকে বাদ পড়ে গেছে এবং আমাদের পৃথিবীর শত-পর্যায় প্রাণচক্রল দেহকোষ নিশ্চয়ই একটি যুক্তিসম্মত অনুমিতি পেশ করে, মনের বা মনীষার অথবা কল্পনা-শক্তির এ অনুমিতি -যাকে আমরা আল্লাহ বলে অভিহিত করে থাকি। বিজ্ঞান এ অনুমিতিকে স্বীকারও করে, আবার মেনেও নেয়।

তাই আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বিশ্বাস করি -আল্লাহ আছেন।

আন্তিকতায় যুক্তিযুক্ততা

[জর্জ হার্বার্ট ব্রাউন ।। কলিতপদার্থ বিজ্ঞানবিদ : বি, এ, লসএ্যানজেলস, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এস, সি ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনলজী, লস- অ্যালামস পদার্থ বিদ্যাগোষ্ঠীর সাবেক টাফ সদস্য; দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কেন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুর গতি পরীক্ষা বিভাগের প্রধান যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে গরেন্ট মুভ বেনডিকস এভিয়েশন ফ্যাসেলিটির বিশ্লেষকগোষ্ঠির প্রধান ।।

আমি আত্মাহুতে বিশ্বাস করি । এর চাইতেও বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমি আত্মাহূর উপর নির্ভর করি । কারণ, দেবত্বের ধারণা আমার কাছে শুধুমাত্র দার্শনিক ভিত্তি নয়; এ হচ্ছে প্রধান ব্যবহারিক বিচার । আত্মাহ আমার দৈনন্দিনের কামনা-বাসনার একটি অংশ ।

অনেক প্রথম শ্রেণীর চিন্তাবিদেদের সংগে আমার এ মতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত । যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বড় বড় মনীষা, তাদের দুনিয়া থেকে আত্মাহকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা খুব কম নয় । তারপর যেহেতু আন্তিকতায় বিশ্বাসও এর প্রচারক ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কাজেই আত্মাহর এ রংগভূমি থেকে প্রস্থান; বিরাট অভিনন্দন লাভ করে । তাই আন্তিকতা সম্পর্কীয় পরিস্থিতির পচাতে যে যুক্তিযুক্ততা রয়েছে, তাকে সর্বসমক্ষে শেখ করার একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে । এ দায়িত্ব কার্যকরী করণে সাহায্য করার প্রচেষ্টা হিসাবে, আমি আমার নিজস্ব কতগুলি স্টিমিত চিন্তাধারার নির্দেশ করতে চাই । প্রথমে আমি আন্তিকতার পক্ষে ও বিপক্ষে যেসব মূল প্রমাণ রয়েছে, সেগুলির কয়েকটি বিবেচনা করার ইচ্ছা রাখি । কেন যে একজন যুক্তিবাদী মানুষ আত্মাহুতে বিশ্বাস করতে পারে এবং কেন বিশ্বাস করা উচিত, এসব বিষয়ের বিবেচনা দ্বারা তা বোঝায় অনেকখানি সুবিধা হবে । তারপর আমি বলতে চাই, কেন মানুষ যথার্থই আত্মাহুতে বিশ্বাস করে ।

আত্মাহর সম্পর্কে এসব প্রমাণের সঙ্গে, ব্যক্তিগত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই । অধিকন্তু, সেগুলিকে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে । যুগ যুগ ধরে আলোচনার ফলে সার্বজনীন প্রমাণগুলির তাৎপর্য, খ্রীষ্টান ধারণার উদ্ভূত শিখরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং তারপর আরেক দল সব কিছুকে স্পেশালের “অপরিজ্ঞাত”-তে সংক্ষিপ্তাকারে গুটিয়ে আনে । সাধারণ প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অপরূপ মতবাদেদের অনুরূপ সূরের অমিল-আদর্শ বলেই মনে হয় ।

চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব

দার্শনিক চিন্তাধারা বিপুল পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সার্বজনীন প্রমাণগুলি -যাকে আল্লাহ বলে অভিহিত করা যায়, আমাদেরকে সে দিকেই টেনে নেয়। তবে বলা চলে, বাইবেলে বর্ণিত আল্লাহর প্রয়োজনের দিকে আমাদেরকে ধাবিত করে না। দর্শনের ব্যাখ্যাকারীদের হাতে এ প্রমাণের দুর্বলতা অবশ্য বাইবেলের আল্লাহর সম্বন্ধকে কখনও তিরোহিত করে না। একথাও প্রমাণ করে না যে, অস্পষ্ট এ প্রতিচ্ছবি শুধুমাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণহীনতারই মূল। সম্ভবতঃ যেসব প্রমাণ মেলে, তার চাইতে অধিকতর সুচারু সমন্বয় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সাধন করা সম্ভব। কিন্তু একথা সত্যি যে, এসব সাক্ষ্য অবিসম্বাদিত প্রমাণের কোন ব্যবস্থা করে না।

এসব সাক্ষ্যের সত্যিকারের মূল সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যে এবং আমার মতে এসবের উপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে যেয়ে, গণিত শাস্ত্রে ঠিক একই ধরনের যে পরিস্থিতি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে, আমি তাই স্বরণ করতে চাই।

জ্যামিতিতে এগুলি বিশেষভাবেই সুস্পষ্ট যে, সামান্য কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয়ে, ব্যাপক বিজ্ঞান গড়ে তোলা যেতে পারে। বৈধতার কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই স্বতঃসিদ্ধকে স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে। নির্ভরশীল বিজ্ঞান, তাদের তাৎপর্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য স্বতঃসিদ্ধকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকে। যে কোন সম্পাদ্য প্রমাণ করতে যেয়ে, বিষয়টি পরিশেষে স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করে। তবে কোন সময়েই সম্পাদ্যগুলিকে একত্রিকরণের ফলে, স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বতঃসিদ্ধের মূল্য নিরূপণ করার ব্যাপারে অসামঞ্জস্যের পরীক্ষা ও প্রাকৃতিক অনুবন্ধকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি সম্পাদ্য কার্যকরী প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈধ প্রমাণিত হলে এবং কোন সম্পাদ্যই অসামঞ্জস্য নয়, এটি নির্দেশ করা সত্ত্বেও তা স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ হিসাবে অনুপযুক্ত। অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে; তখনও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত -একথা থেকে যায়। অনুরূপভাবেই, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করা হয়। জ্যামিতির ব্যাখ্যার সংগে সার্বজনীন প্রমাণগুলির সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা মৌলিক স্বতঃসিদ্ধগুলিকে প্রমাণ করে না, অধিকন্তু স্বতঃসিদ্ধকে অনুসরণ করে। আমরা যেমন জানি, যদি তেমনি হাতে-কলমে প্রমাণ করার ও বাস্তবতার মধ্যে কোন অনুবন্ধের উপস্থিতি পাওয়া যায়; তাহলে বোঝা যায় যে, নির্দিষ্ট স্বতঃসিদ্ধের বৈধতার ব্যাপারে প্রমাণ বিদ্যমান। আন্তরিকতাবাদী স্বতঃসিদ্ধগুলি সত্য হলে, যুক্তিসংগতভাবে যা আশা করা যেতে পারে; তার সংগে পরীক্ষা দ্বারা সত্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ মারফত, -এ প্রমাণ গড়ে উঠে। এসব প্রমাণ, বিশ্বাসের মৌলিকত্বকে বিনষ্ট করে না; অধিকন্তু অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যবস্থা করে। প্রমাণগুলিকে কতিপয় সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সেগুলি : (১) সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় (২) উদ্দেশ্যবাদ সম্পর্কিত এবং (৩) নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণ।

আন্তিকতায় যুক্তিযুক্ততা

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তি পরিবর্তনশীল। অতএব, দৃশ্যতঃ অ-নিত্য বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তাতে করে উদ্ভূত শাস্ত্র বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হয়। উদ্দেশ্যবাদ সম্পর্কীয় চিন্তাধারা বিশ্বে পরিকল্পনা দেখতে পায় এবং তাই একজন পরিকল্পনাকারীর কথা বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণগুলি মানুষের নৈতিক স্বভাবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। ব্যবহারিক নৈতিক বাধ্যবাধকতা একটি অবিমিশ্র আদর্শের আনুমানিক ব্যাখ্যা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং উদ্ভূত আইন প্রদানকারীর দাবী করে থাকে।

আমার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী, প্রাকৃতিক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই আমি হরহামেশাই এতে আন্তিকতাবাদী যেসব প্রমাণ দেখতে পাই, তা উদ্দেশ্যবাদ সম্পর্কীয়। একথা খুবই খাঁটি যে, প্রপঞ্চের জটিলতার মূলে যে আইনাবলী বিদ্যমান, তা নির্ধারণ করতে হলে; এতে যে কোন এক প্রকারের ক্রম বিদ্যমান আছে, -এ কথাটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এ ক্রম কোথায়, তা খুঁজে বের করাই হচ্ছে বিশ্লেষণকারীর কাজ।

বিশ্লেষক, প্রপঞ্চের একটি 'মডেল'-এর দ্বারা এ অন্বেষণ সমস্যার সমাধানে উপনীত হওয়ার কাজ আরম্ভ করে। এ মডেল হচ্ছে, যথার্থ পরিস্থিতির গাণিতিক অথবা প্রাকৃতিক সন্নির্কর্ষ। প্রথমে মডেল হচ্ছে, পদার্থ বিজ্ঞানবিদের অনুমান। যতটা সাধারণ হওয়া সম্ভব ততটা সাধারণ হবে বলে একে বাছাই করা হলেও যাতে করে উল্লেখযোগ্যভাবে বাস্তবতার সংগে প্রায় মিলে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। তারপর পরিস্থিতির পেছনে যেসব আইন রয়েছে, তা নির্ধারণের জন্য উক্ত মডেলকে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। যদি মডেল থেকে ব্যাপক বাস্তব পাওয়া যায় এবং আইনাবলীর সংগে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে মডেলটি ঠিক ঠিক বাছাই করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

যেকোন প্রাকৃতিক সমস্যার জন্যে পরিশেষে একটা মডেল পাওয়া যাবেই, -এ কথা যে মনে হয়, তা কিছু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে এ কথাই মনে হয় যে, বাস্তবতার অংশ হিসাবে কোন-না কোন প্রকারের নিয়ম-শৃংখলা বা ক্রম বিদ্যমান (কিভাবে ক্রম ও বাস্তবতাকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ডেৎকাগীন মানসিক পরিস্থিতির কাজ)। উক্ত ক্রম শূন্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে অথবা সম্ভবতঃ আকস্মিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে বলে প্রস্তাব করা কতটা মানুষের যুক্তির সংগে অ-প্রশংসাসূচক হয়ে থাকে এবং সে জন্যেই একজন মানুষ, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি যা কিছু দেখেন, তার মূলে বিশ্বের একজন পরিকল্পনাকারী রয়েছেন বলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেন। তার জীবনে প্রবাসতা বলে যে সকল বিষয় রয়েছে, তার মধ্যে আত্মাই প্রধান অংশ হয়ে উঠবে। আত্মাই বাস্তবতার মডেলে গৃহীত হন। সিদ্ধান্ত ও অভিজ্ঞতার অনুবন্ধ, স্বতঃসিদ্ধের প্রাকৃতিক বৈধতার সাক্ষ্য (কিছু প্রমাণ নয়)। যে মডেলে পরিকল্পনাকারী আত্মাকে অন্তর্ভুক্ত করে,

যদি তা সত্য হয়, তাহলে ক্রম অবশ্যই বাস্তবতার অংশ হবে। অভিজ্ঞতায় যে ক্রম তা এই-ই নির্দেশ করে যে, বর্তমান অভিজ্ঞতা পর্যন্তই মডেল বৈধ।

প্রত্যেকটি নাস্তিক বিশ্বাস করে যে, সেও যুক্তিসংগত। আর যুক্তিবিদ্যা সম্ভবতঃ নাস্তিক্যকে অস্বীকার করবে না; কারণ একধার উপর বসেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব সাক্ষ্য রয়েছে তা প্রমাণ নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক মাত্র।

অনিশ্চয়বাদী সাক্ষ্যগুলির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেগুলি অস্বীকারসূচক। আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমাণের অভাবকে এ অর্থে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ সম্পর্কে যে সাক্ষ্য রয়েছে, তাও অপ্রতুল বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত যুক্তিকে এ বলে খণ্ডন করা হয়ে থাকে যে, পদার্থ ও শক্তির অংশের বিনিময়ের মধ্যে অবস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাই আমরা যেমন জানি তেমন বাস্তবতার কোন সূচনা নেই। প্রকৃতিতে যে নিয়ম-শৃংখলা বিবেচিত হয় না এবং আপাত-প্রতীয়মানক্রমকে মানসিক কল্পনার অতিশয় উচ্চগুণ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সত্যতার একটি মানের ব্যাপারে সামান্য প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রকৃতির সকল দিককে অর্থনৈতিক বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অতএব, নাস্তিক যে সাক্ষ্য দেখতে পায় তা হচ্ছে সাধারণভাবে এই যে, আন্তিকতাবাদী সাক্ষ্যগুলি তেমন উপযুক্ত বাধ্যতামূলক নয়।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় স্পষ্ট দুর্বলতা বিদ্যমান এবং অপরপক্ষে আল্লাহ সম্পর্কে অবিসংবাদিত দার্শনিক প্রমাণের যে অভাব এ দু'য়ে মিলে মধ্যবর্তী একটি অবস্থায় উপনীত হয়। তবে এ খুবই স্পষ্ট যে, বাস্তব অর্থে নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী উভয়ে একই শিবিরের। উভয়েই দাবী করেন যে, তারা যে বিশ্বকে জানেন, সেখানে আল্লাহ নেই। অজ্ঞেয়বাদীরা আরও মনে করেন, হয়ত বা অপর একটি মহাবিশ্বের আল্লাহ একজন থাকতে পারেন। কিন্তু তাদের এরূপ ধারণায় নাস্তিকদের সামান্যই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। এ তর্কশাস্ত্রীর কলাকৌশল প্রকৃত প্রশ্নের সংগে সংঘর্ষকে এড়ানোর উপায় ভিন্ন আর কিছু নয়। আল্লাহ সম্পর্কিত এ ধারণা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যা বোঝা যায়, তা হচ্ছে : এমন কোন আল্লাহ্ আছেন কি, যার প্রভাব সৃষ্ট জগত আমাদের নিজস্ব কার্যক্রমের জগতের অন্ততঃপক্ষে কিছু অংশকে সমাচ্ছন্ন করে রাখে? কাজেই যিনি স্থির অজ্ঞেয়বাদী মতবাদে বিশ্বাস করেন; তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক বলে নিজেকে জাহিরকারী ব্যক্তিরই সমান। এ ব্যাপারে প্রকৃত প্রস্তাবেই সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : যে ব্যক্তি পথ খুঁজছে তার পক্ষে অ-স্থিরকৃত অবস্থায় থাকা সম্ভব, কিন্তু যে ব্যক্তি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন মধ্যপথ নেই।

আল্লাহর পক্ষে ও বিপক্ষে যেসব সাক্ষ্য রয়েছে তৎসমুদয়ে তুলনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, কোন পক্ষেরই সুনিশ্চিত প্রমাণ হাতে নেই। আন্তিক মতবাদের চাইতে, নাস্তিক

মতবাদের জন্য অধিকতর বিশ্বাসের প্রয়োজন। অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আন্তিকদের বিশ্বাস অনেক বুদ্ধিদীপ্ত আর নাস্তিকদের বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস বই আর কিছুই নয়। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, যুক্তি আন্তিকতার বন্ধু। অবশ্য যখন কেউ মৌলিক সাক্ষ্যের বাইরে বিচরণ করে, তখন তার পক্ষে সকল প্রকার অনিশ্চয়তার মোকাবিলা হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য দার্শনিকগণ ভাল-মন্দের যে ব্যাপক গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করেছেন, আমি তার যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করছি না। তবে আন্তিকতায় প্রাচীন কালের ধারণাও যুক্তিযুক্ত। যদি কেউ এ যৌক্তিকতার সাক্ষ্য দেখতে না পারে, তাহলে বলতে হবে যে, সে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই এটি সম্ভব।

আন্তিকতার যৌক্তিকতায় দৃঢ়বিশ্বাস এবং নাস্তিকতার অতি সূক্ষ্মতা সাধারণতঃ নিজ থেকে একজন মানুষের কার্যকরী আন্তিকতা মেনে নেওয়ার কারণ হতে পারে না। একটা সহজাত সন্দেহ, এর মধ্যে বিদ্যমান বলে মন হয় এবং তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহকে স্বীকৃতি দিলে এমন করে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা অপরূপ হবে। যেসব শিক্ষাবিদ বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত স্বাধীনতাকামী, তাদের কাছে সংক্ষিপ্ত আজাদীর যেকোন প্রকার চিন্তা বিশেষভাবে উদ্ভাবন ব্যাপার এবং স্বাধীনতা হারানোর ভয়ও ভিত্তিহীন নয়। ধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তির সহজরূপ হয়ে থাকে এবং আসলেও তাই। এমনকি খ্রীষ্টান ধর্মের বড় বড় শাখায় বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত একনায়কত্বের অভ্যাস করা হয়ে থাকে। তবে ধর্মের এ বৈশিষ্ট্য যথার্থই মানুষের প্রতিচ্ছবি। দার্শনিক, বৈরাচার -আল্লাহর ধারণায় প্রয়োজনীয় গুণবাচক শব্দ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাইবেলের খ্রীষ্টান ধর্মের আল্লাহ নতুন ও বৃহত্তর আজাদী আনছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের আদেশ হচ্ছে : “প্রভু বললেন! এখন আস এবং এসো, আমরা যুক্তিকে একত্র করি।”

কিন্তু মানুষ যে যথার্থ আন্তিকতাকে স্বীকার করে, প্রকৃতপক্ষে তার মূলে কোন ‘সত্য’ নিহিত রয়েছে। আমি মনে করি, মানুষের পক্ষে তার বন্ধুর অস্তিত্বকে স্বীকার করার মূলে যে কারণ বিদ্যমান, এ তা থেকে খুব তফাৎ নয়। মানুষ যখন আল্লাহর সাক্ষাত পাবে, তখনই সে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে।

আমি আল্লাহকে এতবার দেখেছি এবং এখনও দেখি যে, তার জন্যেই তাঁকে বিশ্বাস করি। বাস্তবতায় আন্তিকতা সর্বাঙ্গী মডেল যুক্তিযুক্ত বলে আমি খুবই সন্তুষ্ট; কিন্তু এ যুক্তিযুক্ততার পরিমাণ এবং বিশ্বাস জন্মানোর ব্যাপারে এর বাধ্য করার ক্ষমতা মাধ্যমিক : আমি আল্লাহর সাক্ষাতলাভ করেছি। এ অবশ্য খুবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং যদি কখনও আপনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে থাকেন, তাহলে প্রমাণ হিসেবে আমি একে আপনার সামনে উপস্থাপিত করছি না; আপনাকে নিজেরই আল্লাহর সাক্ষাতলাভ করতে হবে।

ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নির্দেশপত্র

[ডোনাল্ড রবার্ট কার ।। ভূ-রাসায়নিক : বি, এস-সি, রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়; এম, এ, পি, এইচ-ডি, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-রাসায়নিক শাস্ত্রের সাবেক রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও এ্যাসোসিয়েট রিসার্চ ফেলো, শেলটন কলেজের এ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক, স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরামর্শদাতা, নিউজার্সির আইসোটোপস ইংক-এর ১৯৫৫ থেকে ডিরেক্টর ও সহকারী সভাপতি, জে, এল, কাল্লের সংগে “ডেটিং উইদ ন্যাচারাল রেডিও অ্যাকটিভ কার্বন,” “ভ্যাকুয়াম সিস্টেমে আরগনের ধর্ম নিরূপণে এ ৫৭-র ব্যবহার,” “জিওক্রোনোমিটারির পটাশিয়াম আর্গন মেথড” এবং অন্যান্য পুস্তক প্রণেতা। ভূতাত্ত্বিক যুগ নির্ণয়, স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ; বায়ুমন্ডলীয় ও ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ আণবিক প্রক্রিয়াবলীতে পারদর্শী ।।

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার পক্ষে খোলামান নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব। এটা অপর পক্ষে অবৈজ্ঞানিক শোনাবে। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন এবং তারপর আমি খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত ধরনের কতিপয় মন্তব্য করবো।

আমাদিগকে যখন আমাদের বিশ্বাসের যুক্তি প্রদর্শন করতে বলা হয়, আমরা তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে এমন প্রমাণ দাঁড় করাতে পারি, যেসব প্রমাণ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব বেশী রকমের সম্ভাবনা স্থাপনে আমাদের সাহায্য করে—যদিও বাইবেলে উল্লিখিত আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতেই যে সাহায্য করে তা নয়। বাইবেলে উল্লিখিত আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে একটি উদাহরণ দাঁড় করানোর জন্যে আমরা একে অতিক্রম করে যেতে পারি। কিন্তু এ সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ব্যাপার। এ তখন “আমাদের আত্মার সংগে সম্পর্কিত পরমাত্মার উদাহরণে পরিণত হয়ে থাকে।” (রোমান্স ৮ঃ১৬)

আল্লাহর রহমতে আমার এ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তা আল্লাহর অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমার চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। আমার বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তিসমূহ সে কারণে বস্তুতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হতে পারে এবং এ কারণে আমাকে অতীন্দ্রিয়তা দ্বারা অভিযুক্ত করা যেতে পারে। তবে যারা এমন নির্দিষ্ট অর্থের শব্দ ব্যবহার করেন, যদিও এটা ‘কুপ দ্য গ্রেস’ তথাপি সৃষ্টি-সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক কি করে অন্য রকম হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের কৈফিয়ত দেওয়া উচিত।

আমার বিশ্বাস স্থাপনের এবং আল্লাহর যীশুতে আস্থা প্রতিষ্ঠায় ও যীশু কর্তৃক আমার প্রয়োজন বা অভাব পূরণের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক আত্মপক্ষ সমর্থনকারী লেখা বা কথা

সামান্যই আছে। অভাব সম্পর্কে শক্তিশালী উপলব্ধিই সম্ভাবনশক্তি সম্পন্ন কারণের মূলে বিদ্যমান ছিল। ভূ-রসায়নবিদ্যায় পরবর্তী গবেষণা, আত্মাহু যে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এ সভ্য বিষয়টি অনুধাবনে অনেকখানি সহায়তা করছে এবং সাক্ষ্যে অতিরিক্ত ধারা খুলে দিয়েছে। কাজেই প্রকৃতিতে যে, আমি আত্মাহুর হাতের স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখতে পাই, তা খুবই স্বাভাবিক।

ভূ-রসায়নবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় যে দু'টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিসরে প্রকৃতি সম্পর্কিত খুঁটান দর্শনের প্রত্যেক সংযোগ বিদ্যমান তা হচ্ছে : (১) মহাবিশ্বের সূচনা কবে হয়েছিল সে সময়ের নির্ধারণ এবং (২) ভূ-তত্ত্বে প্রযোজ্য এক রূপকতাবাদের নীতি! (পরবর্তী অনুচ্ছেদে এক-রূপকতাবাদের ব্যাখ্যা দেখুন।)

'যুগ' নির্ধারণ অথবা বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন, উল্কা সঙ্কলিত জড়পদার্থ সৃষ্টির সময় নিরূপণের জন্যে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ সম্পর্কে কাজে লাগিয়ে আধা পরিমাণবাচক ভিত্তিতে পৃথিবীর ইতিহাসের পূর্ণগঠনের চেষ্টাকে সম্ভবপূর্ণ করেছে। বিভিন্ন মানের যথার্থতার সাহায্যে বর্তমানে যুগ নিরূপণের জন্যে বেশ কিছু সংখ্যক স্বাধীন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তবে সাধারণতঃ সম্ভোষজনক এক্ষয় সহকারে এদিকে এগোতে হয়। জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা, মহাবিশ্বের বয়স সম্পর্কে একই প্রকার সিদ্ধান্তের দিকে যে টেনে নিয়ে যায়, এ বিষয়টি -মহাবিশ্ব পাঁচ মহাপন্থ বছর আগে জন্মলাভ করেছে বলে যে অভিমত পোষণ করা হয়ে থাকে, তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। এ যুক্তিকে সম্প্রসারণ দ্বারা আবহমান কাল থেকে এ মহাবিশ্ব অবস্থান করেছে বলে যে মতবাদ বিদ্যমান, তাকে নস্যাৎ করা যেতে পারে। যে মহাবিশ্বের কোনদিন সূচনা হয়নি, অথচ চিরকাল ধরে বিদ্যমান, সেখানে কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ টিকে থাকতে পারে না। একে তাপ-গতিবিদ্যার দ্বিতীয় আইনের একটি অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একবার সম্প্রসারণ ও পরবর্তী সময়ে সংকোচনশীল আবর্তিত মহাবিশ্বের ধারণাকে অতিরিক্ত বিজ্ঞানসম্মত বলে অভিহিত করা চলে এবং তাই অপ্রমাণিত প্রকল্প বা অনুমান বলে বাদ দিতে হবে। মহাবিশ্বের একদিন সূচনা হয়েছিল -এ সিদ্ধান্তের সাথে বাইবেলে বর্ণিত অভ্যন্তর অসাধারণ উক্তির পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে : "প্রথমে আত্মাহু আসমান ও জমিনের সৃষ্টি করেন।" বাইবেলের এ উক্তির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাপগতিবিদ্যার সম্পর্ক, জ্যোতিঃবিদ্যার সম্পর্ক এবং ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্ত দৃঢ়তার সংগে সমর্থিত হয়ে থাকে।

একরূপকতাবাদের নীতি, ভূ-তত্ত্বের সবকিছুর সংগে স্বতঃসিদ্ধ সভ্যসঙ্কলিত। এ নীতির অর্থ হচ্ছে -এ কথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানে যে সকল ভূ-তত্ত্ব সঙ্কলিত ও ভূরাসায়নিক প্রক্রিয়া কাজ করে যাচ্ছে, অতীতেও সে প্রক্রিয়াগুলি সক্রিয় ছিল এবং সে

কারণে এসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসের ব্যাখ্যার একটি ভিত্তি ব্যবস্থা করে। প্রকৃতিতে নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধ ধর্ম আর “প্রাকৃতিক আইনাবলীর” অস্তিত্বই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রস্তর।

বৈজ্ঞানিকদের নিকট শৃংখলাবদ্ধ মহাবিশ্বেরই একান্ত প্রয়োজন এবং এ দেশেই আমরা বাইবেল বর্ণিত আল্লাহ সম্পর্কিত অভিমতকে মেনে নেই—মেনে নেই আল্লাহকে শুধু সৃষ্টিকর্তা নয়, সেই সংগে মহাবিশ্বের রক্ষাকর্তা হিসাবে। তা না হলে একটি বিশৃংখলবিশ্ব বীভৎস দ্বাদশ অনুচরের অন্যতম বিজ্ঞপলের ‘দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তাঁর অদৃশ্য স্বভাব’ অর্থাৎ, তাঁর অনন্ত ক্ষমতা ও খোদায়িত্ব, যে সকল বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে তার সব কিছুই মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা হয়েছে (রোমান্স ১ঃ২০) বলে যে উক্তি রয়েছে তার সংগে অর্থহীন হতো।

নিয়ম-শৃংখলা ছাড়া অলৌকিক ঘটনাবলীকে চেনা যেতে পারে না। যীশু যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন, এ সত্যকে প্রমাণ করার জন্য যীশু যেসব কাজ করেছেন, তাতে তাঁরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই এবং বস্তুতঃপক্ষে পুনরুত্থান পর্যন্ত, একমাত্র নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধ মহাবিশ্বেরই সব কিছুই যথোপযুক্ত মূল্য নিরূপণ সম্ভব। কারণ, এ বিশ্বে অনুরূপ ঘটনা খুব বেশী সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। মহান ভূ-তত্ত্ববিদ জে. ডব্লিউ. ডসন বেশ কয়েক বছর আগে তাই উল্লেখ করেছিলেন : “প্রকৃত প্রস্তাবে, এবাদতের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, আইনের প্রতি বিশ্বাস একান্ত আবশ্যকীয়। যদি এ মহাবিশ্ব শুধুমাত্র আকস্মিকতার একটা বিশৃংখল রূপ হতো অথবা যদি এটি অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োজনানুসারে জন্মলাভ করতো, তাহলে বুদ্ধিদীপ্ত এবাদতের কোন স্থান সেখানে হতো না, কিন্তু যদি এ বিশ্ব একজন আইনকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে—যে আইনকর্তা জ্ঞানী আর দয়াবান, কেবলমাত্র জড় পৃথিবীর যন্ত্রপাতির ম্যানেজার নন, অধিকন্তু সবারই খাঁটি পিতা, তাহলে আমরা আমাদের অনুরোধ বা প্রার্থনা দ্বারা এমন এক সন্তার কাছে যেতে পারি। অবশ্য এ বিশ্বাস নিয়ে নয় যে, আমরা তাঁর মহান পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে পারি অথবা যদি কাছে যাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহলে তা থেকে কোন প্রকার সুবিধা হাসিল হতে পারে। অধিকন্তু আমরা বুঝতে পারবো, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁর অসীম জ্ঞান আর আমাদেরই প্রতি প্রেমের ফলে এসব পরিকল্পনা করা হয়েছে।”—(দি অরিজিন অব দি ওয়ার্ল্ড অ্যাকর্ডিং টু হিডিউলেশন অ্যান্ড সায়েন্স।)

অবশেষে আমি আমার নিজস্ব বিজ্ঞানের শাখাটি সম্পর্কে বলতে চাই যে, ভূ-রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ব্যাপক আকারে সব বস্তুর প্রতি নজর দিতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের কোটি কোটি বছরের প্রতি একবার চিন্তা নিবদ্ধ করতে, যে মহাশূন্য মহাবিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, আরেকবার তার দিকে এবং সর্বশেষে বিশ্বব্যাপী

আবর্তনের যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান তাকেও অবলোকন করতে শিক্ষা দেয়। সবকিছুর বিশালত্বই মানুষকে আল্লাহর মহত্ত্বকে নতুন করে উপলব্ধি করতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে মানুষ সে দিকেই অগ্রসর হয়। সবকিছু দেখে অ-বিশ্বাসীগণ অন্ততঃপক্ষেই বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়বে এবং পরিশেষে এ কথাই মনে নিতে হবে যে, “আসমান আল্লাহর মহত্ত্ব প্রচার করে এবং নক্ষত্র-খচিত আকাশ সে আল্লাহর হাতের কাজ প্রদর্শন করে।”

এ বিষয়টির ভাবার্থ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, বিজ্ঞানভিত্তিক স্বীকারোক্তির সারমর্ম; “তোমার শিল্প নৈপুণ্য কত মহান” এ মোনাজাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে— যে মোনাজাতটি সাম্প্রতিক নিউইয়র্ক নগরীর ধর্মীয় জেহাদে লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে অভিভূত করেছিল। সম্ভবতঃ হালের কয়েক বছরে আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে একের পর এক দ্রুত আর সীমাহীন অনুগমন সম্পর্কিত বিষয়কর আবিষ্কারের ফলে এই বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে মোনাজাতটি শুনছেন এবং এ আবিষ্কারই সম্ভবতঃ মোনাজাতের বিশ্বজনীন আবেদনকে সুস্পষ্টাকারে ব্যাখ্যা করেছে। মোনাজাতটি হচ্ছেঃ

ওগো প্রভু আমার আল্লাহ, যখন আমি বিশ্বয়াবিষ্ট হয়ে

তোমার সৃষ্ট সারা জাহানের দিকে তাকাই,

আর দেখতে পাই নক্ষত্ররাজি, তখন পাই বজ্রের নির্ধোষ,

সারা দুনিয়া জুড়ে তোমার অসীম শক্তির প্রকাশ ঘটে—

তখন আমার আত্মা, হে আমার রক্ষাকর্তা আল্লাহ তোমাকে

স্মরণ করে গেয়ে উঠেঃ

তুমি কত মহান,

তুমি কত মহান!

আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোতে 'জেনেসিস-১'

[পিটার ডব্রিউ টোনার ।। গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যাবিদ : এম,এস, সি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পি,এইচ, ডি-র জন্যে গ্রাজুয়েট হিসাবে দু'বছরের গবেষণাকারী। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপনা শাখার কর্মচারী, তারপর পাসা সিটি কলেজের অংক ও জ্যোতিঃশাস্ত্র বিভাগের এবং ওয়েস্টমন্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান। বিভিন্ন জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ও নভোবস্তুবিদ্যা সম্পর্কীয় ধিওরীগুলির ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।]

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছাত্র থাকাকালে, চীনা ছাত্রদের এক রবিবারের ক্লাশে আমাকে পড়াতে বলা হয়। সরকারী উদ্যোগে এই তরুণ ছাত্ররা আমেরিকায় অধ্যয়ন করছিল। বার্কলের কাঠ প্রেসবিছটারিয়ান চার্চের ধর্মযাজকের কাছে তাদেরই প্রায় বারজন ছাত্র যেয়ে হাজির হয় এবং বলে যে, সত্যি কথা বলতে কি - যদিও তারা খৃষ্টান হতে চায় না, তবুও খৃষ্টান ধর্ম কতখানি এবং কি পরিমাণে মার্কিন সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করেছে; সে সম্পর্কে তারা জ্ঞানলাভ করতে চায়। এবং এ জন্যে একটি রবিবারের ক্লাশের ব্যবস্থা করার জন্যে ধর্মযাজককে তারা অনুরোধ করে। ধর্মযাজক মনে করেন, এ বিশেষ ক্লাশটির ব্যবস্থা আমারই করা উচিত এবং পড়ানোর কাজটাও কতকটা আমিই করবো, তাই তিনি আমাকেই তদনুযায়ী নির্দেশ দিলেন। আমি কতকটা দ্বিধাসংকোচিত চিন্তে সম্মত হলাম।

সংগে সংগে আমি একটা সমস্যার সম্মুখীন হলাম এবং তা হচ্ছেঃ এ ধরনের ছাত্রের সামনে কি পেশ করা যেতে পারে? যেহেতু, এ তরুণদের বাইবেলে কোন বিশ্বাস ছিল না, কাজেই মামুলী বাইবেল শিক্ষা তাদের কাছে নিষ্ফল মনে হলো। তারপর আমার মনে একটা চিন্তা হলো। আমি আমার আডার গ্রাজুয়েট ক্লাশে অধ্যয়নকালে জেনেসিস বা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদের সংগে বিজ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং এ দলটির সামনে সে ছবিটি তুলে ধরবো বলে স্থির করলাম।

এ ছাত্রগোষ্ঠী এবং আমি স্বভাবতঃ এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলাম যে, জেনেসিসে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে তার সবই মহাবিশ্ব, পৃথিবী আর পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত যাবতীয় প্রাণী সম্পর্কে আজকের দিনে বিজ্ঞান যে জ্ঞান ও ধারণা আহরণ করেছে, তারও হাজার হাজার বছর আগে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আমরা উপলব্ধি

আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোতে “জেনেসিস-১”

করেছিলাম যে, মুসা (আঃ)-এর সেই অতীতকালের মানুষের অনেক শিক্ষা এবং তারপরেও তার হাজার হাজার বছরের শিক্ষাকে যখন আধুনিক জ্ঞানের আলোকে, যে জ্ঞানের আলোক এ ছাত্রগোষ্ঠীর কাছেও পৌঁছে, নিরীক্ষা করা হয়, তখন তা খুবই অযৌক্তিক মনে হয়। সে বাই হোক, আমরা দৃঢ়চিত্ততা সহকারে বিষয়টি ‘আলোচনা’ চলাই।

আমরা গোটা শীতকাল জেনেসিস-১ নিয়ে কাটিয়ে দেই। এ ছাত্রগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বিশেষ কাজ নেয় এবং তারপর এমন পূর্ণাঙ্গ সব প্রবন্ধ রচনা করে যে, একমাত্র তা শিক্ষকদের স্বপ্ন-সাধনার বস্তু হতে পারে। শীতের শেষে ধর্মযাজক আমাকে তার অফিসে আমন্ত্রণ করে নিয়ে জানান যে, সব ক’টি ছাত্রই তার কাছে যেয়ে এ কথাই জানিয়েছে যে, তারা খুঁটান হতে চায়। তারা জানায় যে, তাদের এ বিষয়টি প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে, বাইবেল আল্লাহর প্রেরণায় উদ্ভূত কথার সমষ্টি এবং তারা আরো বিশ্বাস করেছে যে, তাদের নিজস্ব সব ধর্মীয় পুস্তক তা নয়।

আমি এখন খুবই খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবো। এ সময় পর্যন্ত আমি নিজে একজন খুঁটান ছিলাম, কিন্তু অন্য অনেকের মত আমি বাইবেলকে এবাদত কি করে করতে হয়, তারই নির্দেশাবলী সম্বলিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় হুকুমনামা সন্নিবেশিত একটি পুস্তক হিসাবে বিবেচনা করতাম এবং আরও মনে করতাম যে, হয় তো বাইবেলের অনেক অংশই নির্ভরযোগ্য নয়। ছাত্ররা যেমন বিশ্বিত হয়েছিল, তেমনি আমিও আমাদের আবিস্কৃত তথ্যাবলী দেখে মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম। সে দিন থেকে (১৯১০ সাল থেকে) আমি বিজ্ঞানের প্রতিটি অগ্রগতি অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে, কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে আসছি এবং তার সংগে জেনেসিসের বর্ণনার তুলনা করেছি।

জেনেসিস ১-এর সর্বপ্রথম পঙ্ক্তির কথা ধরা যাক : “সর্বপ্রথম আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন।” চীনা ছাত্রদের নিয়ে যখন আমার ক্লাশ চলছিল সে সময়ে আমরা বিশ্বাস করতাম যে, জড়পদার্থের ধ্বংস নেই। আমরা এর আকার পরিবর্তন করতে পারতাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা একটি জড়পদার্থই থেকে যেতো এবং ঠিক একই পরিমাণেই থাকতো। তার ফলে বর্তমানে এ ধারণা জন্মায় যে, প্রাকৃতিক বিশ্বের কোন সূচনা হয়নি এবং কোনদিন এর শেষও হবে না। জেনেসিসে বর্ণিত বিবৃতির সঙ্গে আমাদের একমাত্র সম্ভাব্য এ সমঝোতা ছিল যে, যদি সত্যিকারের কোন সূচনা থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই এ সৃষ্টির মূল আল্লাহকে স্বীকার করবে। অন্যকোন শক্তিই এ জন্যে যথেষ্ট ছিল না।

কিন্তু এখন আণবিক শক্তির আবির্ভাব হয়েছে এবং আমরা সবাই জানি যে, জড়বস্তুকে ক্ষতিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে এবং শক্তিকে জড়পদার্থে। তাই বর্তমানে সৃষ্টি

ধারণাটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞান বর্তমানে অনেক বিষয়ের জন্য আনুমানিক সময়কাল নির্দিষ্ট করেছে। তার কয়েকটি হচ্ছে: (১) পৃথিবীর বয়স (২) উদ্ভাপিতের বয়স (৩) পৃথিবী চন্দ্র ব্যবস্থার বয়স (৪) সূর্যের বয়স (৫) আমাদের ছায়া পথের বয়স (৬) মহাবিশ্বের বয়স এবং (৭) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ, তাদের বিভাগ ও পরিমাণ সৃষ্টি হতে যে সময় লাগে তার পরিমাণ। এসব কাল প্রায় একই সময় নিরূপণ করে এবং তা হচ্ছে প্রায় ছয় মহাপঞ্চ বছরের কাছাকাছি সময়। এ পরিস্থিতি এতই বর্ণনীয় যে, অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ এখন অবাধে প্রথম সৃষ্টির দিনের কথা বলে থাকেন এবং তারা আজ থেকে প্রায় ছয় মহাপঞ্চ বছর আগে সব সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এ ভাষ্য অবশ্য চীনা ছায়া এবং তাদের শিক্ষকদের জানা ছিল না।

জেনেসিস ১-এর দ্বিতীয় পংক্তিটি আমাদের ক্রমশে পড়ার জন্যে অত্যন্ত কঠিন ছিল : “এবং পৃথিবী ছিল আকারহীন এবং শূন্য; পতীরের মুখে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ছিল।” ১৯১০ সালে “নীহারিকা প্রকল্প” বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে। এ প্রকল্পে সৌরজগতকে ধারার আকৃতি বলে আশ্বাস করা হয়; জেনেসিসে একে আকারহীন, অথবা কোন প্রকার রীতি সিদ্ধ আকারহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রথম দৃষ্টি প্রদর্শন করা হয় যে, সৌরজগত পতীর বা ঘন গ্যাস ছিল; জেনেসিসে একে শূন্যতা বা খুবই দুর্বল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে এমনি ধারণা জন্মানো হয় যে, সৌরজগত অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল এবং তা থেকে মাস্তক রকম তাপ বিকিরণ হচ্ছিল; জেনেসিসে উল্লেখ রয়েছে যে, সব অন্ধকার ছিল। ১৯১০ সালে আমরা এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারতাম না যে, কেন পার্থক্য বিদ্যমান আমরা তা আদৌ বুঝতে পারছিলাম না। তবে এ ধারণা ছিল যে, সম্ভবতঃ কোন একদিন এ বৈষম্য দূরীভূত হবে।

আমাদের ধারণা অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি পরিবর্তন এলো। যখন ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র কাজে লাগলো, তখন ডঃ ই, পি, হাবল্ কুডলিত নীহারিকামণ্ডলী সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করলেন। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, কুডলিত নীহারিকামণ্ডলী ঘন ধারাকৃতি উত্তপ্ত গ্যাসের তৈরি বস্তু হবে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুরছে এবং তার ফলে এর বাইরের অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একত্রিত হয়ে গ্রহ সৃষ্টি করেছে একটি সূর্য। কাজেই নয়া সৌরজগত ঠিক আমাদের সৌরজগতের মতোই আদ্য-প্রকাশ লাভ করবে।

ডঃ হাবল্ প্রত্যক্ষ করলেন যে, এসব কুডলিত জ্যোতিষ্ক, আমাদের নিজস্ব ছায়াপথে আদৌ গ্যাসীয়ও জ্যোতিষ্ক নয়, অপরপক্ষে এগুলি হচ্ছে নক্ষত্র পুঞ্জের বিরাট সমাবেশ। প্রকৃত প্রস্তাবে, আমাদের নিজস্ব ছায়াপথের অনুরূপ এবং মহাশূন্যে বহুদূরবর্তী ছায়াপথগুলি এতই দূরে অবস্থিত যে, সেগুলি দেখতে উত্তপ্ত গ্যাসের ধারাকৃতি জ্যোতিষ্ক বলে মনে হয়। ডঃ হাবলের এ আবিষ্কার, নীহারিকা প্রকল্পকে মারাত্মক আঘাত হানে। এসব কুডলিত নীহারিকার আলোকচিত্রের উপর ভিত্তি করে এ প্রকল্প মূলতঃ গড়ে উঠে।

প্রতিটি নীহারিকা থেকে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে, সব গ্রহ সৃষ্টি করছে এবং নিচর কেন্দ্রীয় অংশগুলি আমাদের সূর্যের মত নক্ষত্র সৃষ্টি করবে, এটা প্রায় দেখতে পোতাম।

এর অল্প পরেই এটি হ্রীকৃত হয় যে, যদি ধারণাকৃতি উত্তম গ্যাসীয় কোন পদার্থ বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, তাহলে তা থেকে আমাদের সৌরজগতের মত একটা জগত সৃষ্টি না হয়ে প্রায় দু'টি সমান অংশে বিভক্ত হওয়া সম্ভব। সবগুলি গ্রহকে একত্র করলেও তা সূর্যের এক শতাংশের দশভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হয় না। হেনরী নরিস রাসেল তার “সৌরজগত ও তার উৎপত্তি” নামক বইয়ে নীহারিকা প্রকল্পের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। অতএব, প্রকল্পের অবসান হলো। এরপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে গ্রহমণ্ডল সম্পর্কিত থিওরী ও জোয়ার-ভাটার থিওরী জনপ্রিয় করে। তবে এ দু'টি থিওরীর আয়ুষ্কাল অত্যন্ত কম ছিল।

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তখনও থেকে যায় : জেনেসিস ১-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে কি সম্পর্কে বলা হচ্ছিল? সুদূর আকাশে আকারহীন, বিরল এবং অন্ধকার ছাড়া আজ পর্যন্ত কি অন্যকিছু পাওয়া গেছে? কোন জ্যোতির্বিদেরও প্রশ্নের জবাব নেই; আমরা এমন কোন জ্যোতিক সম্পর্কে কিছুই জানি না। যেখানে আমরা ধারণা করেছিলাম কোন নক্ষত্রই থাকবে না, সেখানে আমরা কাল বিন্দু দেখতে পাই। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা শুধু বহিরলুন্যে কেবলমাত্র কাঁকা স্থান অবলোকন করছি।

ডঃ হাবল গবেষণার রত হলেন। তিনি এসব গর্ত নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। তিনি দুনিয়ার কাছে প্রকৃত আলোকচিত্র দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, এগুলি আসলে গর্ত নয় অধিকন্তু গাঢ় নীহারিকামণ্ডলী। তিনি প্রমাণ করলেন যে, এগুলি খুবই বিরল এবং অত্যন্ত হালকাভাবে গঠিত। নিঃসন্দেহে এগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এদের আকৃতিও গ্রীষ্মের আকাশে অন্তর্যমান বিচিত্র আকারের মেঘের মতই বিভিন্ন প্রকারের। তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। জেনেসিস—১-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে এ অন্ধকারাচ্ছন্ন নীহারিকারই উল্লেখ রয়েছে।

বর্তমানে জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কীয় থিওরীগুলিতে আমাদের সৌরজগতকে “পরিব্যাপ্ত নীহারিকা” থেকে সৃষ্ট বলে অনুমান করা হয়েছে এবং অধিকাংশ পরিব্যাপ্ত নীহারিকা অন্ধকার। উজ্জ্বল নীহারিকা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন নীহারিকার তফাৎ শুধু এই যে, উজ্জ্বল নীহারিকার একটি প্রথম যুগের মত নক্ষত্র বিদ্যমান আছে, যা নাকি নীহারিকার এতটা কাছে অবস্থান করে যে, তা থেকে আলো বিক্ষোৰণ খুব সহজ হয়।

এজন্যে দ্বিতীয় পংক্তিটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। বিজ্ঞান প্রথম অন্ধকারাচ্ছন্ন নীহারিকা অবিকারের হাজার হাজার বছর আগে, তাহলে কি করে মুসা জানতে পারলেন যে, অন্ধকার নীহারিকা রয়েছে? এবং কি করেই বা তিনি জানলেন যে, পৃথিবী একটি অন্ধকার নীহারিকা থেকে সৃষ্টি হয়েছে?

জেনেসিস—১-এর পরবর্তী কয়েকটি পংক্তিতে কিভাবে নীহারিকা থেকে আমাদের সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছে, তাই বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত বৃহত্তর অংশ একত্রিত হয়ে সূর্য হয়েছে এবং তারপর সে সূর্য ক্ষুদ্রতর অংশ পৃথিবীর উপর আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে দিবারাত্রি সৃষ্টি করে। আজ আমরা জানি যে, পৃথিবী এককালে নক্ষত্র ছিল না। কারণ, পৃথিবী আয়তনে খুবই ক্ষুদ্র। সূর্যের বিরাট পিণ্ডের ৩৩০০০০ ভাগের মাত্র এক ভাগ হচ্ছে এ পৃথিবী। সবচেয়ে যেটি ক্ষুদ্রতম নক্ষত্র, তা সূর্যের এক শতাংশ অপেক্ষা বৃহত্তর। তবে আমরা আরও জানি যে, পৃথিবী উদ্ভক্ত হবে এবং অধিকাংশ মুক্ত পানি বাষ্পাকারে উদ্ভিত হবে। ফলে আবহাওয়া খুবই আর্দ্র হয়ে উঠবে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সংগে সংগে বায়ুমণ্ডলে অধিকাংশ জলীয় বাষ্প পুনরায় সম্পৃক্ত হয়ে আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ছাপিয়ে ফেলবে, (ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী তার সৃষ্টির গোড়ার দিকে পানিতে ডুবে ছিল।) পরে পানির মধ্য থেকে ভূ-ভাগ মাথা উচু করে আত্মপ্রকাশ করবে।

জেনেসিসে বর্ণিত বিবরণ নিঃসন্দেহে আধুনিক বিজ্ঞানের সংগে মিলে যায়। ১৪ থেকে ১৮ পংক্তিতে যে মেঘ থেকে বৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা উপযুক্ত ভূ-তাত্ত্বিক কালে সংগঠিত হয়। পৃথিবীর বুকে এ ক্রম অনুসারে প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে এবং উদ্ভিদ, মাছ, মুরগী, স্তন্যপায়ী ও মানুষ পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে আসে। বিজ্ঞানও সম্পূর্ণভাবে ক্রমকে অনুমোদন করেছে। কিন্তু যদি মূসা বা অন্য কেউ পৃথিবীর সূচনা সম্পর্কে লেখার চেষ্টা করতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাতে অসংখ্য ভুল থাকতো। কিন্তু এখন আমাদের কাছে সকল সত্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে এবং আজকের দিনে আমরা সেসব তথ্য জেনেছি, জেনেসিসে বর্ণিত বিবরণের যে কোন একটি বিষয়ের সংগে তার কোনই অসামঞ্জস্য নেই। জাতির নিকট ভাবাবিদ বলে সুপরিচিত মনীষীদের কাছে থেকে আমি জেনেসিসের এ পরিচ্ছেদটির বিভিন্ন অংশের অধিকতর খুঁটিনাটি ও সুবিস্তৃত অনুবাদ সংগ্রহ করেছি এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সংগে সমঝোতার আরও উন্নতি হয়েছে।

আত্মাহুত বাস্তবতা আর পবিত্র বাণী বা বাইবেলের উপর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আমি বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মধ্যে মাত্র একটি উদ্ধৃতি দিলাম। যুগ যুগ ধরে জেনেসিস—১ সম্পর্কে নাস্তিকেরা সমালোচনা করে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত জেনেসিস—১, অকলংকিত ও সুমহান স্থান লাভকরে বিদ্যমান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথচ ভ্রান্ত থিওরীপন্থীদের ভবিষ্যতে যে কোন হামলার মোকাবিলা করতে এ সম্পূর্ণ সক্ষম।

মহান পরিকল্পক

ব্রাহ্ম, এম, হ্যাথাওয়ে ।। কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার : বি, এস-সি ই-ই, এম, এস, সি কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী, কেনেকট্যাডী, নিউইয়র্ক এর কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরীর সাবেক প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। ল্যাংলী ফিল্ডের বিমানচালনবিদ্যা সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির জন্যে “ইলেকট্রনিক ব্রেণের” নমুনাকারক। বর্তমানে হ্যামিলটন ওয়াচ কো’র হ্যাথাওয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট ডিভিশনে গবেষণা ও উন্নয়নের চেয়ারম্যান। সিগমা এক্স, আই, ট-বেটা পি-আই এ, আই ই, আই আর-ই’র সদস্য। বৈদ্যুতিক পদার্থবিষয়ক পরিমাপ ও পরিমাপক যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ ।।

আত্মাহুতে বিশ্বাস সম্পর্কে আমার যুক্তিসঙ্গত কারণ সমূহ সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আমি বলতে চাই যে, আত্মাহুতে আমার যে বিশ্বাস তার অধিকাংশই জীবনের এ বয়সে যাকে অভিজ্ঞতা বলে উল্লেখ করা যায়, তার উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যে প্রত্যয় জন্মায়, তার খুব বেশী আমাদের হেঁটে ফেলে দেওয়া উচিত নয়—উচিত নয় আমাদের পক্ষে সেগুলিকে অধৌক্তিক বলে শ্রেণীবিভাগ করা। কারণ, এমনি করলে আমরা প্রকৃতিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই অবিশ্বাস করবো। এ ধরনের বিশ্বাসকে “অতিরিক্ত যুক্তিসংগত” বলা চলে।

যদিও, প্রথম জীবনে আত্মাহু সম্পর্কে আমার জ্ঞান অধিকাংশই যুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল; তথাপি এখানে সে যুক্তিরই আমি অবতারণা করবো। বর্তমানে সে জ্ঞান, অন্তর থেকে তাঁকে জানানোর অভিজ্ঞতার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। এ অভিজ্ঞতা যুক্তিযুক্ত যুক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ, আর না হয়, তাকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন করে তোলে। যারা এ সকল অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত তাদের পক্ষে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অবিশ্বাসজনক হতে পারে, কিন্তু যারা অভিজ্ঞ, তাদের নিকট এগুলি যথার্থ যুক্তিসংগত। আমি দেখেছি যে, আত্মাহু, খৃষ্টান ধর্মের আত্মাহুই একমাত্র চিন্তাধারা; যার সংগে মানুষের আত্মার অদ্ভুত রকমের পরিণামের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অগাষ্টাইনের ভাষায়, “তুমি আমাদেরকে তোমারই জন্যে সৃষ্টি করেছ। আমাদের আত্মা তাই যতক্ষণ না তোমাতে আশ্রয় লাভ করে, ততক্ষণ অশান্ত থাকে।”

এখন, এক অলৌকিক আত্মাহুতে আমার বিশ্বাসের যুক্তিসংগত ভিত্তি প্রদর্শনের জন্যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করছি। আমি প্রথমে সহজ-সরল অনবীকার্য সত্য ঘটনার উল্লেখ করবো এবং যা নিঃসন্দেহে এ পুস্তকে বেশ জোর করেই বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনার জন্যে একজন পরিকল্পকের প্রয়োজন। আত্মাহুতে আমার বিশ্বাসের এ মৌলিক যুক্তিযুক্ত কারণটি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেকখানি সমর্থিত হয়েছে। জটিল যন্ত্রপাতির কলাকৌশল অর ইলেকট্রনিকসের পরিক্রমতার উন্নতিবিধান ও পরিকল্পনা

নিয়ে সুদীর্ঘ কয়েক বছর কাজ করার পর কোন পরিকল্পনার পরিচয় পেলে, সে সংগে তাকে যথাযথ হৃদয়ংগম করায়ও দক্ষতা আমার জন্যে গেছে। অতএব, এমনি অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের চারিদিকে দুনিয়ায় যে কল্পনাভীত পরিকল্পনা ছড়িয়ে আছে, তা দেখে এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসীম মনীষার অধিকারী পরিকল্পকের কাজ ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তাই আসতে পারে না। নিঃসন্দেহে এ একটি পুরানো যুক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ এমন এক যুক্তি, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর অখণ্ডীয় করে তুলেছে।

একজন ইঞ্জিনিয়ার ক্রমে গুণাবলী বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করেন এবং একটি আকাংক্ষিত উদ্দেশ্য যাতে হাসিল হতে পারে, তার জন্যে বিভিন্ন শক্তি, জড়পদার্থ আর প্রাকৃতিক আইনাবলীকে একত্রিকরণে পরিকল্পনার পিছনে কি-যে সব অসুবিধা রয়েছে, তা যথার্থ হৃদয়ংগম করতে পারেন। পরিকল্পনার সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়ে তিনি পরিকল্পনাকে উপলব্ধি করতে শেখেন।

বেশ কয়েক বছর আগে যি-মাত্রিক চাপ শিওরীর মাধ্যমে উপস্থাপিত জটিল সমীকরণকে যাতে দ্রুত সমাধা করা যেতে পারে, তার জন্যে একটি ইলেকট্রনিক গণনাকারী যন্ত্রের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। শত শত ভ্যাকুয়াম টিউব, ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল পম্পা এবং জটিল পরিক্রমতা দ্বারা সমস্যার আমি সমাধান করি এবং তিনটি বৃহদাকার পিয়ানোর ক্যাবিনেটের চেয়ে বড় ক্যাবিনেটে এ যন্ত্রটির 'মস্তক' স্থান লাভ করে। ল্যাংলী ফিল্ডের বিমান চালনাবিদ্যা সম্পর্কিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক এখনও যন্ত্রটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ গণনাকারী যন্ত্র নিয়ে এক বা দু'বছর কাজ করার পর এবং এর পরিকল্পায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হতো— সেগুলি মোকাবিলা ও সমাধান করে নিয়ে এমনি একটি উপায়, একজন বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পকের এজেন্সীর মারফত না হয়ে অন্যকোন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এরূপ ধারণা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এখন কথা হচ্ছে যে, আমাদের চারদিকে যে পৃথিবী তা হচ্ছে, পরিকল্পনা বা ক্রমের ব্যাপক সমাবেশ। সবই স্বাধীন কিছু আবার পরস্পরের সংগে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং আমরা “ইলেকট্রোনিক ব্রেণ” অপেক্ষা প্রাচীনতম ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপকাকারে অধিকতর জটিল। যদি আমার গণনাকারী যন্ত্রের জন্যে একজন পরিকল্পকের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার দেখ— বা নাকি তার চাইতে অনেক জটিল। শরীর-রাসায়নিক জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত যন্ত্র তার জন্যে এবং আবার যে অসীম মহাবিশ্বের ফুলনায় এ দেহ অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সে মহাবিশ্বের জন্যে কত বেশী পরিকল্পকের প্রয়োজন রয়েছে?

পরিকল্পনা ক্রম, ব্যবস্থা, একে আপনি যাই বলুন না কেন, কেবলমাত্র দু'টি কারণ থেকে উদ্ভূত হতে পারে : দৈবক্রমে অথবা পরিকল্পনা দ্বারা। ক্রম যত জটিল হবে দৈব সংঘটনের সম্ভাবনা ততই দূরে সরে যাবে। আমরা যে অসীম পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছি, তাতে আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ আমি যে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে চাই তা হচ্ছে যে, মহাবিশ্বের পরিকল্পককে অবশ্যই অলৌকিক হতে হবে। আমি যদি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ অলৌকিক। কারণ, আমার দর্শন অলৌকিককে স্বীকার করে এবং যেহেতু পদার্থ বিজ্ঞানবিদ হিসাবে আমি এক অলৌকিক 'প্রথম কারণের' প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেই। আমার দর্শন অলৌকিককে স্বীকৃতি দেয়। কারণ, অংক দ্বারা অলৌকিককে নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয় দিয়ে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখানো চলবে না। অতএব, বিজ্ঞান যেহেতু একে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখতে পারছে না; কাজেই একে অস্বীকার করার জন্যে প্রস্তুতি তিকা গুণ্ডার মতই হবে। তদুপরি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আমাদের আরও দেখাচ্ছে যে, প্রকৃতি নিজেকে আপনা থেকে কোন ক্রমের মধ্যদিয়ে নিয়ে যেতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

স্যার আইজাক নিউটন মেনে নিয়েছেন যে, বিশ্ব শৃংখলা থেকে বিশৃংখলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি এ রকম তাপমাত্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছে; এবং এ থেকেই তিনি প্রারম্ভিক একটি হুঁকুমের ব পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাপ সম্পর্কে গবেষণার ফলে তার এ উক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে। এ গবেষণার ফলে লভ্য শক্তি ও অপ্রাপ্য শক্তি বা এন্ট্রপির মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, তাপ সম্পর্কিত যেকোন প্রকারের রূপান্তরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের তাপ প্রাপ্য অবস্থা থেকে অপ্রাপ্য অবস্থায় সরে যায়, কিন্তু এই প্রসরণ কোন সময়েই প্রকৃতিতে বিপরীতগামী হয় না। তাপগতিবিদ্যার এটি দ্বিতীয় আইন।

বোল্টজম্যান এ প্রণয়ের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠেন এবং প্রতিটির প্রাকৃতিক পরিবর্তনে ক্রমে অভাবের সৃষ্টি সম্পর্কিত সাধারণ যে নিয়ম ভারই কেবলমাত্র বিশেষ ঘটনা হচ্ছে, দ্বিতীয় আইনের ব্যক্ত লভ্য শক্তির হ্রাস। তাপের ক্ষেত্রে, লভ্য অবস্থা থেকে অপ্রাপ্য অবস্থায় তাপ শক্তির বদলী হওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আগব ক্রমের ক্ষতি বা পরিকল্পনায় বিষটন মাত্র সহজ ভাষায় বোল্টজম্যানের "তাপ গতিবিদ্যার পরিবর্তিত দ্বিতীয় আইনে" বলা হয় যে, প্রকৃতি নিজে থেকে পরিকল্পনা করতে পারে না। কারণ, প্রতিটি প্রাকৃতিক বিষটনের সংগে পরিকল্পনায় ক্ষতি হতেই হবে। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্রম অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ অগ্রগতি কেবলমাত্র অন্য কোথাও বৃহত্তর ক্রমের ক্ষতির বিনিময়েই সম্ভব।

এ মহাবিশ্ব ক্রমের এক মারাত্মক 'জড় পদার্থ' (পদার্থ বিজ্ঞান)। কাজেই দ্বিতীয় আইনের অধীন এক মহান প্রধান কারণ বা আল্লাহর প্রয়োজন রয়েছে; তাই তার পক্ষে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হওয়ারও প্রয়োজন আছে।

বিদ্বজ্জনোচিত সাক্ষ্য আর কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

মার্লিন থ্রাফ্ট নীথ ।। গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যাবিদ : এম,এ পি,এইচ,ডি, ইলিনয়ের বিশ্ববিদ্যালয় । নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন নিয়মিত শিক্ষক । গ্রীনভিল কলেজের গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক স্ত্রিং আরবার জুনিয়ার কলেজের প্রেসিডেন্ট ; ১৯৩৩ সাল থেকে রবার্টস ওয়েসলিয়ান কলেজের প্রেসিডেন্ট এবং গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক । গ্রীনভীল কলেজের অনারারী এল,এল, ডি, ও সীয়াটল প্যাসিফিক কলেজের ডি, এস,সি । অন্তরকলন ও এক মাত্রিকতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব, মানুষের সংগে তার আপনজনের এবং তার আল্লাহর, 'অবশ্য যদি তেমন কেউ থেকে থাকেন'-প্রতি তার দায়িত্ব পালনের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । কাজেই জবাব কি হবে তা স্থিরকরণের ব্যাপারে অসম্ভব রকম ব্যস্ত নিতে হবে । যদি আল্লাহ একজন কেউ থাকেন, তাহলে তিনি যে কেবল আমাদের সৃষ্টিকর্তা তাই নয়—তিনি আমাদের সর্বময় কর্তাও বটে এবং তিনি যে রকম আচরণ বা চরিত্র কামনা করেন ঠিক সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করতে হবে, জানাতে হবে তাঁর এবং আমাদের সকল মানুষকে উল্লেখ করে ।

তুলনামূলকভাবে আধুনিক যুগের অধিকাংশ চিন্তাবিদ, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান করেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমি তারই কয়েকটির এখানে উদ্ধৃতি দিতে চাই ।

স্যার জেমস জীনস বলেছেন, “আমাদের মহাবিশ্ব একটি বিশালাকার মেশিনের চেয়ে একটি বিরাট চিন্তার মত মনে হয় । আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত সত্য হিসাবে না বলে অনুধ্যান হিসেবে বলতে চাই যে, মহাবিশ্ব আমাদের সকল মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং সকল মনের সমন্বয়সাধনকারী কোন এক মহান বিশ্বজনীন ‘মনের’ সৃষ্টি... মনে হয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেন সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে ।”

ইম্যানুয়েল ক্যান্ট লিখেছেন, “দু’টি বিষয় আমি যতই দীর্ঘকাল ধরে এবং অধিক মনোযোগের সংগে চিন্তা করি, ততই আমাকে ক্রমবর্ধমান প্রশংসামুখর আর বিশ্বয়াবিস্ট করে তোলে এবং তা হচ্ছে বাইরের নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ এবং অন্তরের নৈতিক আইন ।”

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর অ্যালেকজিস ক্যারেল বলেছেন, “এর মারাত্মক রকম বিশালত্ব সত্ত্বেও জড়পদার্থের জগত মানুষের জন্যে খুবই সংকীর্ণ । তার অর্থনৈতিক ও

সামাজিক পরিবেশের মত—এটি তাকে মানায় না। গাণিতিক বিমূর্তন দ্বারা তার মন ইলেকট্রন এবং নক্ষত্রের উপলব্ধি করে। বজুর পর্বতমালা, মহাসাগর আর নদীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু ভাষা সত্ত্বেও, সে অন্য জগতের অধিবাসী; সে জগত যদিও তার নিজের ভিতরেই সীমাবদ্ধ—তথাপি মহাশূন্য মহাকালের ওপারে ছড়িয়ে রয়েছে।”

অভিজ্ঞ জীববিদ্যাবিদ জর্জ রোমানোস বলেছেন যে, প্রাণী জগতের প্রতিটি বিভিন্ন প্রজাতি, তার বিভিন্ন পরিবেশে যে ধরনের প্রাণের অধিকারী, সেরূপই পৃথক পৃথকভাবে প্রতিক্রিয়া করে থাকে। যারা খুঁটের কাছে আত্মনিবেদন করেছেন বলে দাবী করেন, সেরূপ পুরুষ ও মহিলাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তারা একটি পৃথক ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকেন। ফলে তিনি একজন একনিষ্ঠ খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন এবং এ বলে পরিসমাপ্তি করেন যে, মানুষের জীবনে এরূপ অলৌকিক সাধন একমাত্র আত্মাহুত পক্ষেই সম্ভব।

উইলিয়াম জেমসের কথা শেষে বলছি। এক মহান মার্কিন দার্শনিক ও মনঃস্তম্ভবিদ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন : আমাদের এবং আত্মাহুত পরস্পর পরস্পরের সংগে কাজ করেছে এবং এ কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় যে নিয়তি বা অদৃষ্ট, তাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সচরাচর বলা হয়ে থাকে, যেখানেই কোন ফল পাওয়া যাবে; নিশ্চয়ই সেখানে তার মূলে কারণ থাকবে। বৈজ্ঞানিকেরা অবিরাম সে কারণসমূহের সন্ধান করছেন, সন্ধান করেছেন এসব কারণের পশ্চাতে একটি প্রথম কারণের। কতক ক্ষেত্রে সহজেই কারণগুলি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে, অন্য অনেক ক্ষেত্রে আপাতঃপ্রতীয়মান কারণ প্রকৃত কারণগুলিকে বিদূরিত করে, খুঁজে বার করার জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বিজ্ঞানসুলভ গবেষণার প্রয়োজন হয়। এ পরবর্তী পদ্ধতি দৃষ্টান্তের আকারে ঔষধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাল্পিট্রিক জ্বর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রে সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ও আরোগ্যের জন্যে খুবই চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে মনে হয় জীবনের আশা অনেকটা বেড়ে গেছে। উদ্ভিদ ও পতঙ্গজগতের কার্যক্রমে উন্নতি বিধানের জন্যে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে আরও অন্যান্য গবেষণা চালানো হচ্ছে। নতুন সর্ব আইন ও তাদের প্রয়োগ আবিষ্কারের ফলে রসায়নবিজ্ঞানে অনেক অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেছে। ফলে আণবিক কণিকাসমূহ প্রকল্পে কর্মশক্তির ক্ষেত্রে কল্পনাভীত ওরুদ্ভ লাভ করেছে। নব নব যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে ও নতুন আণবিক তথ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। আর সেই সংগে যে সীমাহীন প্রাকৃতিক বিশ্বের ক্রিয়া ও বিক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার সর্বোচ্চ শিখরে আমাদের মন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ সমুদয় এবং আরও অনেক কিছুই— যেসব ফলাফল প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, তার মূলে কোন সব কারণ বিদ্যমান, তাই খুঁজে বের করার জন্যে যে বিজ্ঞানমহীন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হচ্ছে—তার মূলে রয়েছে কারণ, আর তার ফলাফল অবিলম্বে। ফল ও কারণ মূলতঃভাবে প্রত্যক্ষ করলে দেখা বাবে এক।

মানুষ হিসাবে আমরা আর আমাদের চারদিকের বিশ্ব, সব মিলিয়ে হচ্ছে ফলের গড় এবং এ গড়ের পক্ষে রয়েছে অদৃশ্য, প্রথম থেকে বর্তমান 'কারণ'—যাকে আমি আত্মাহুত বলে অভিহিত করে থাকি।

কারণ ও ফলের “আইন” ছাড়া আমরা অন্য আইন সম্পর্কেও কথা বলে থাকি। সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্দিষ্ট আইনাবলী অনুসারে কাজ করে চলেছে। সে সংগে নতুন আইনও আবিষ্কৃত হচ্ছে। উপ-আণবিক আইনাবলী রয়েছে এবং অতিরিক্ত ছায়াপথীর জ্যোতিষ্কের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত সব আইন রয়েছে। এসব আইন আবিষ্কারের জন্যে অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তির সম্মিলিত সাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা শুধু এসব আইন আবিষ্কার করছি মাত্র। আমাদের এ মত যে, এসব আইনাবলীও অতি প্রাচীন। মহাবিশ্বের জড়পদার্থের সম্পর্কিত সূত্র থেকে এসব আইনাবলী সম্ভব হয়েছে বলে যে খিওরী বিদ্যমান, আমরা কি তা স্বীকার করে নেবো? এসব আইনের বহুত্ব, তাদের মধ্যে সু-সম্বন্ধ, তাদের নিজস্ব প্রকৃতি—একরূপ চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব করে তুলেছে। যে মহাবিশ্বে এসব আইন কার্যকরী হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক উন্নতর উৎস থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে। আমার সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মনে, এর একটি বুদ্ধিপূর্ণ জবাব পাওয়া যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে—সমুদয় আইন একজন আইনকর্তার বিশ্বাসের দাবী করে, যে আইনকর্তাকে আমি আবার আত্মাহুত বলে অভিহিত করি।

আমার কথা হচ্ছে, এ আত্মাহুত কোন এক অনিবার্চনীয়, চঞ্চলমতি স্বর্গীয় বা ইথারীয় সত্তা নয়। অনেক যুগে আর অনেক স্থানে অতি-উৎসাহী সব মন থেকে উদ্ভূত কাল্পনিক সাজানো গল্পের চেয়ে অনেক সুসামঞ্জস্য সত্তা। অধিকন্তু এ আত্মাহুত হচ্ছেন বাইবেল বর্ণিত আত্মাহুত— যাকে সকল পরগণ্যর ও তাদের বাণীর প্রচারকগণ বিশ্বাস করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন; আর ক্রিষ্টিয়ান চার্চের প্রধান মতানুসারীগণ যাকে স্বীকার করে নিয়েছে। বাইবেল হচ্ছে আত্মাহুতর বার্তা, মানুষের কাছে প্রেরিত আত্মাহুতর পত্র। এতে একরূপ উক্তি করা হয়েছে যে, মানুষকে আত্মাহুতর প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ আত্মাহুতর প্রতিনিধি হওয়ায় তাই তার পক্ষে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আত্মাহুতর বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়েছে। একারণেই আত্মাহুত মানুষের সংগে কথা বলতে পারেন। মানুষও পারে আত্মাহুতর সংগে কথা বলতে এবং সর্বপ্রথম যে পরম সংবাদটি আত্মাহুত পাক মানুষকে বলেছিলেন তা হচ্ছে : তিনি হচ্ছে তার (মানুষের) এবং তার চারদিকে অবস্থিত বা বিরাজমান সীমাহীন অপূর্ব অনন্ত মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।

এসব কিছু ছাড়া মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে সকল যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ— অশিক্ষিত সরল অথবা জ্ঞানী আর বৈজ্ঞানিক এ সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন যে, তারা যথার্থই তাদের অন্তরাঙ্গার আল্লাহর উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। আমরা সে সাক্ষ্য—প্রমাণ নিয়ে কি করবো? বর্জন করবো? অবজ্ঞা করবো? অগণিত মানুষ যে “অবর্ণনীয় আনন্দ আর গৌরব” লাভ করেছেন, আমরা কি তাকে দৃষ্টির আড়াল করে চাপা দিয়ে রাখবো? শহীদ আর ধর্মপ্রাণ ও ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের যে ঈমান নিঃসঙ্গতার মধ্যে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে, অহরহ কষ্ট স্বীকার করিয়েছে, সকল নির্বাতন সহ্য করিয়েছে, মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করতে দিয়েছে, আমরা কি সে সম্পর্কে নিঃশব্দের মত উদাসীন থাকতে পারি? পারি আপন মনে বলতে— সে সবই ভুল?

আমার কথা হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি, “আল্লাহ্‌ আছেন এবং যারা তাঁকে অধ্যবসায় সহকারে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তিনি তাদের জন্যে মহাপুরস্কার দাতা।” (হীত্র ১১ : ৬)

স্বর্গীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত পবিত্র বাইবেলের সর্বপ্রথম কয়েকটি শব্দ হচ্ছে : “ওরুতে আল্লাহ্‌ রয়েছেন।” আমি এ কথা ক’টিকেই ভূমিকার কথা, মূল ভাবধারা—আমার নিজস্ব জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র করতে চাই।

‘প্রাকৃতিক আইনাবলীর’ পশ্চাতে একবার অবলোকন

[এডুইন ফাষ্ট ।। পদার্থবিজ্ঞানবিদ : বিজ্ঞানে এ,বি,ফ্রেডস বিশ্ববিদ্যালয়; এম, এস-সি,পি-এইচ,ডি, ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়। ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক নিয়মিত অধ্যাপক; ১৯৪৫ থেকে ফিলিপস পেটোলিয়াম কোম্পানীর সংগে জড়িত। বর্তমানে আণবিক শক্তির কাজে নিয়োজিত-এম,টি, আর, সংস্থিতিতে আর এম, এম, এফ- নিম্ন শক্তি টেষ্ট রিয়েকটরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বর্ণালী বীক্ষণ, তেজস্ক্রিয় টেসারের কাজ, সাধারণ আণবিক শক্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।

এই বইয়ে সকল দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটির প্রস্তাবনা করা হয়েছে, এ লেখকের মতে তার একটি জবাবের জন্যে সুদীর্ঘ আলোচনার কোন প্রয়োজন হয় না। প্রশ্নের জবাব সর্বাঙ্গ হতে পারে এবং সে সংগে এ প্রবন্ধকারের মতে তা যথোপযুক্তও হতে পারে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের সংগে যে ব্যাখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে মিলে যায়, তাকেই একটি প্রপঞ্চের সাধারণভাবে সহজতম ব্যাখ্যা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, কারণ এ ব্যাখ্যা প্রপঞ্চের খুব বেশী নির্ভুল ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। কতকগুলি অনুমিতি, যেহেতু তারা একটি খিওরী গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করে এবং যেহেতু সেগুলি সুস্পষ্ট অথবা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, কাজেই মেনে নেওয়া যেতে পারে। এ অনুমিতিগুলিকে ভিত্তি করে মূল কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

গাণিতিক পদ্ধতিতে ‘সম্ভাবনার’ খিওরী খুব ভালভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং পদার্থ বিজ্ঞানে তার উল্লেখযোগ্য প্রয়োগও খুঁজে পেয়েছে। যদি বাইরের কোন প্রভাব পরীক্ষা বা গবেষণায় বিস্তার না করে, তাহলে একটি মুদ্রা যত বার টোকা মেরে ফেলা হবে, দেখা যাবে তার মধ্যে যত বার সোজাভাবে পড়ছে ঠিক তেমনি উল্টা ভাবেও পড়ছে; কোন একটি দিকে নির্দিষ্টভাবে পড়ার ভাঙে আদৌ নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। যেমনি পাশার ঘুঁটি যতবারই চালা হোক না কেন, দেখা যাবে এক এক বার তার ছাঁটি দিকের এক একটি দিক উপরে থাকছে। মুদ্রাকে আমরা যদি একটি নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে বুড়ো আগুনের নির্ভুল ওজন মাপিক টোকা মারি এবং অভ্যস্ত অভ্যস্ততার সংগে শূন্যে নিক্ষেপ করি, তাহলে আমরা অধিক সংখ্যকবার সোজা পিঠ পেতে পারি। ঠিক তেমনি যদি দক্ষতার সংগে পাশার ঘুঁটি চালি অথবা একটা নির্দিষ্ট ওজন দিয়ে যদি পাশার ঘুঁটি ঢেলে দেই, তাহলেও আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা বেশীবার তুলতে পারি। এ দু’টি ক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন আকস্মিক ঘটনা আর

দ্বিতীয়টিতে বিশেষ কাজের জন্যে পরিচালনাকারী বুদ্ধিমত্তা পশ্চাতে বিদ্যমান এবং পরিণামে, ভবিষ্যতে কি হবে তাতে এ প্রভাব সৃষ্টি করছে।

এ অকপট, অত্যন্ত সরল দৃষ্টান্তগুলিকে, ক্রমবর্ধমান জটিলতার ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যেতে পারে। একটি বিশেষরকমের নমুনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মনে করুন, দশ, একশ, অথবা দশলক্ষ ইউনিট একই সংগে কাজ করে যাচ্ছে। হরহামেশাই যে ফল পাওয়া যাচ্ছিল যদি তা থেকে কোন প্রকার বিচ্ছৃতি ঘটে, তাহলে মানুষ এ ব্যতিক্রমের কারণ বা কোন শক্তির প্রভাব তা সৃষ্টি করছে, বের করার উদ্যোগী হয়। এ ধরনের প্রভাব সৃষ্টিকারী আচরণকেই প্রধানতঃ 'প্রাকৃতিক আইনাবলী' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে, যদি কেউ বৈদ্যুতিক এবং চুম্বকীয় ক্ষেত্রে নিউটন, ইলেকট্রন অথবা প্রোটনের ধর্ম পর্যালোচনা করতে যায়, তাহলে প্রত্যেকটি এমন ধর্ম প্রকাশ করবে, যে সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্লেষণ দেওয়া যেতে পারে এবং এ জন্যে 'প্রাকৃতিক আইনাবলীর' ভিত্তিতে এ ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করা যেতে পারে। তাদের ধর্মগুলি (বৈশিষ্ট্য) এমনি যে, তারা ভবিষ্যদ্বাণীর উপযোগী টং-এ আচরণ করে। অথবা যদি একটি সোডিয়াম বৈদ্যুতিক অর্ধবৃত্তের মধ্য থেকে একটি স্বল্প পরিসর এবং ত্রি-কোণাকৃতি কাঁচ বা শ্রিঙ্কম-এর মধ্য দিয়ে আলো প্রবাহিত হয়, তাহলে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত বিধার কমলাপীত রেখা দু'টি প্রকাশ পায়। পরমাণুতে উচ্চশক্তি অবস্থা থেকে নিম্নশক্তি অবস্থায় একটি ইলেকট্রনের পরিবর্তন থেকে আলোর শব্দগুণ সংজ্ঞায় একে বর্ণনা করা যেতে পারে।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনার রয়েছে; তা হচ্ছে প্রশ্নের আদি কথা অর্থাৎ, যা কিছু পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে 'প্রাকৃতিক আইনাবলী'। কেবল মাত্র তারই বর্ণনা : বুদ্ধিদীপ্ত, নিয়মবদ্ধ কোন আইন নয়। এ বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবে একটি প্রপঞ্চের মৌলিক যুক্তি বা ব্যাখ্যা নয়।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি বের করার চেষ্টা করতে যেয়ে বিজ্ঞান, আণবিক পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে, মৌলিক কণিকাগুলির মিশ্রক্রিয়ার ফলে যে সকল জাত মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে, একথা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রোটনেরও এর ধর্মগুলি থেকে আরম্ভ করে কণিকাগুলিকে একত্রিকরণের কোন এক প্রকার শক্তিসহ আমাদের বর্তমান মহাবিশ্বের সবগুলি জাত মৌলিক পদার্থ যথার্থই উৎপাদন করা সম্ভব। তবে প্রোটনের উৎপত্তি এবং কেন এর নির্দিষ্ট কতকগুলি ধর্ম রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনেক দূর এগিয়ে প্রত্যাগমন করে আমাদেরকে অবশেষে এ সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে যে, মহাবিশ্বে সকল ক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্যতা প্রদর্শনকারী এ "প্রাকৃতিক আইনাবলী" এক মনীষার সাক্ষ্য বহন করছে; যিনি, আমরা যেমন পর্যবেক্ষণ করছি ঠিক তেমনভাবেই যাতে মহাবিশ্ব কাজ করে যায়, তারই ব্যবস্থা কায়দেম করাই সাবস্ত করেছিলেন এবং

তদনুযায়ীই ব্যবস্থা করেছেন। নির্দিষ্ট ধর্মসহ একবার ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন সৃষ্টি করার পর তাদের আচরণের ধরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের সীমাবদ্ধ মন, সময়ের যেই যবে তন্মু হয়েছিল সেখানে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে যেয়ে দাবী করে যে, নিচয় সূচনা বলে একটা কিছু ছিল, যখন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টিকারী চরম কণিকাগুলি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়। যে সৃষ্টিকর্তা কণিকাগুলি সৃষ্টি করেছেন, যুক্তিসংগতভাবেই বলতে হয় যে, তিনি এসব কণিকার কি ধর্ম হবে, তাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে সর্বালেক্ষা বুদ্ধিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক মনগুলি বিরাট জটিলতার মধ্যে পর্যবেক্ষণ দ্বারা বিভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব আর আচরণ সম্পর্কে শিক্ষার জন্য গবেষণা করে থাকেন। তাহলে বলতে হয় যে, যিনি এসবের সৃষ্টি করেছেন তার মনীষা, আজ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত সকল একত্বীভূত মূল্যকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে গেছে। আজকের দিনে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অনুভূতিসম্পন্ন মনগুলি সহজেই স্বীকার করে নেবে যে, মানুষ ভয়ে ভয়ে প্রাকৃতিক প্রশ্ন সম্পর্কে তাদের যা কিছু জ্ঞানার প্রয়োজন আছে, তা জানতে আরম্ভ করেছে।

আমরা যখন জৈবিক জগতের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, আচরণের জটিলতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে কেবলমাত্র আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনাকে তার ভিত্তি হিসাবে অনুধাবন করা নিরতিশয় দুঃখ মনে হয়। জৈবিক জগত বা পদার্থসমূহ গড়ে তুলতে মূলতঃ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন আর সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থের দরকার হয়। এ সবের লক্ষ লক্ষ পরমাণুকে জীবনের অতি সাধারণ রূপ সৃষ্টির জন্যও দরকার হয়। মানুষ যখন এর চেয়ে বড় আর জটিল সব প্রজাতির কথা বিবেচনা করে, তখন কেবলমাত্র আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনার ভিত্তিতে এ সকল পরমাণুর একত্বীভূত হওয়া কল্পনাভীত দুঃখ বলে মনে হয়।

এবারে জীবনের আরও উন্নততর পর্যায়ে আসা যাক। এ পর্যায়ে দেখা যায়, “প্রাকৃতিক আইনাবলী” পরিপন্থী কোন একটি বিশেষ কাজের বা আচরণের জন্য পরিকল্পনা করতে ও তাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করা হচ্ছে। কতকগুলি মৌলিক পদার্থ দৈবক্রমে একত্রিত হওয়ার ফলে এমনি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, যারা সৃষ্টির পর, যিনি তাদের সৃষ্টি করলেন তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের মধ্যে যে যুক্তি আর বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান, তাকে প্রকাশ করতে পারে, এরূপ কল্পনা করাই সম্পূর্ণ অবাস্তব। এ হচ্ছে একটি সহজ-সরল যথোপযুক্ত অনুমিতিকে বাদ দিয়ে সকল বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব একটি অনুমিতিকে স্বীকার করে নেয়া। জেনেসিসের লেখক তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন :

“একেবারে আদিতে আল্লাহ্”

কথাগুলি খুবই সহজ আর সরল, তাই নয় ?

কিন্তু এ সরলতার মধ্যে মর্যাদা বিদ্যমান – যে মর্যাদা, এ লেখকের মতে, আসমানী বা পবিত্র সত্যের মর্যাদা।

রাসায়নিক আইনাবলী ও আল্লাহ

[জন অ্যাডলফ বুয়েহলার ।। কনসাল্টিং কেমিষ্ট : এ, বি, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ; এম, এ, পি. এইচ, ডি, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়; রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, অ্যাভারসন কলেজ; সিটি অব অম্ভারসন এবং বেসরকারী শিল্প কর্পোরেশনগুলির কনসাল্টিং কেমিষ্ট । ইন্ডিয়ানা একাডেমী অব সায়েন্সে মাঝে মাঝে জটিল টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দানকারী । অ্যামিনো এসিডের সংশ্লেষ' বিশেষ ধাতুর পরিমাণ নির্ধারণে জৈবিক অগ্নির প্রয়োগ, সাকসিনিমাইড আইনোপ্রোপিয়ামাইন দ্বারা কোবাল্ট-২ নিরূপণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।]

রাসায়নিক আইনাবলী কি করে আল্লাহর সংগে সম্পর্কিত, তা বুঝতে হলে, মানুষের মনে পুরাপুরিভাবে সীমাবদ্ধ প্রকৃতির উৎকর্ষতা উপলব্ধি করতে হলে, আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তির জন্য যে নম্রতা প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তা আমাদের উপলব্ধি করানোর জন্য আমাকে রাসায়নিক বিজ্ঞানের অভিশয় সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক নিরীক্ষাকার্যের প্রতি আমার পাঠক-পাঠিকাকে আমার সংগে একটু অগ্রসর হওয়ার আমন্ত্রণ জানানতে হচ্ছে- যা নাকি আমার বিশেষ কর্মক্ষেত্র । আমি খুব বেশী টেকনিক্যাল কথাবার্তা না বলে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করবো ।

সভ্যতার সে প্রথম সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে মানুষ তার চারদিকের জড়জগতকে ও তার জ্ঞান পরিবর্তনগুলিতে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে । প্রথমে জড়বস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞান যেমন অস্পষ্ট, তেমনি অসম্পূর্ণ ছিল । প্রায় খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে ডেমোক্রিটাস সর্বপ্রথম এরূপ বিচক্ষণতাপূর্ণ অনুমান করেন যে, সবকিছু কণিকা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে; আবার এসব কণিকার নিজস্ব অধিকারের ক্ষেত্রে পৃথক সত্তা বিদ্যমান । জড়পদার্থের প্রকৃতি আবহমানকাল থেকে একই বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম । তার মতবাদ দর্শনেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বিধায় সে যুগে প্রচলিত অতীন্দ্রিয়বাদের চাপে অকালে সমাধিপ্ৰাপ্ত হয় ।

দু'হাজার বছর ধরে আলকিমিয়া তার অতীন্দ্রিয়বাদ আর ম্যাজিকসহ জড়পদার্থের অর্থ কি, তা বোঝার চেষ্টা করেছে । সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি অবশ্য রবার্ট ডেমোক্রিটাসের অভিমতকে গ্রহণ করেন এবং রাসায়নাগারের প্রক্রিয়া দ্বারা যে সকল সাধারণ দ্রব্যকে ভেঙে নিয়ে আরও সহজ দ্রব্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না, সেগুলির ক্ষেত্রে তিনি “মৌলিক পদার্থ” বা এলিমেন্ট কথাটির ব্যবহার করেন । অ্যারিস্টটল মৌলিক পদার্থ বলতে মাটি, আগুন, বাতাস ও পানিকে বুঝিয়েছেন; সেদিক থেকে

বয়সির মৌলিক পদার্থগুলি ব্যাভিক্রম। ১৭৭৪ সালে জন প্রিন্সলী অক্সিজেন আবিষ্কার করেন এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেনরী ক্যাভেনডিশ হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন। এরই কিছুকাল পরে অ্যান্টোয়ন ল্যাভয়সিয়ার আবিষ্কার করেন যে, পানি কিছুতেই মৌলিক পদার্থ হতে পারে না। কারণ, বাতাসের হাইড্রোজেনকে পুড়িয়ে পানি সৃষ্টি করা যেতে পারে।

রসায়নবিজ্ঞান বর্ধাধই উন্নতি করেছে। ১৭৯৯ সালে জনৈক ফরাসী রাসায়নিক যোসেফ প্রাউস্ট যুক্তি প্রদান করেন যে, শুদ্ধ রাসায়নিক বস্তু যেমন মায়ুলী 'টেবল সল্ট' যেখানে থেকেই সংগৃহীত হোক না কেন, সব সময় একই থাকবে। বার্থোলেট বলেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লবণ বিভিন্ন হবে। আট বৎসর গবেষণা চালানোর পর প্রাউস্ট তার তর্কে জয়লাভ করেন। এমনি করে, মিশ্রিত পদার্থের সৃষ্টির জন্য যে সকল পদার্থ মিশ্রিত হয়ে থাকে, তার অপরিবর্তনীয় সংমিশ্রণ প্রমাণ হয়ে যায়।

জনৈক কোয়েকার স্কুল মাস্টার, জন ডালটন ১৮০৮ সালে রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কিত সংগৃহীত সকল জ্ঞান একত্র করার চেষ্টা করেন। তাঁর সময় পর্যন্ত সকল জ্ঞান একত্র করে, মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের অপরিবর্তনীয়তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি জড় পদার্থের আণবিক থিওরীকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তিনি মৌলিক পদার্থগুলিকে অতিশয় সূক্ষ্ম কণিকা বলে উল্লেখ করে তার নাম দেন পরমাণু। তিনি যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই থাকে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পৃথক পৃথক মৌলিক পদার্থের পৃথক পৃথক পরমাণু রয়েছে। তাঁর মতে পরমাণু কখনও ধ্বংস হতে পারে না। তিনি বলেন, পরমাণুতে ওজন উপাদানের তারতম্যের ফলেই মৌলিক পদার্থে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক আচরণ ঘটে থাকে। যে কোন একটি মিশ্র পদার্থের জন্য মৌলিক পদার্থগুলির সঠিক পরিমাণে একত্র হয়ে থাকে, এ যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি যৌগিক পদার্থের অপরিবর্তনীয় উপাদানের কথা ব্যাখ্যা করেন। কাজেই এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, রাসায়নিক প্রপঞ্চ আইন মেনে চলে। এসব আইনের মধ্যে 'ভয়ের নিত্যতা সম্পর্কিত আইন' (ল অব দি কনজারভেশন অব মাস) 'নিত্য উপাদান আইন' (ল অব কনস্ট্যান্ট কম্পোজিশন) এবং 'শক্তির নিত্যতা সম্পর্কিত আইন' (ল অব দি কনজারভেশন অব এনার্জী) রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকদের দুঃসাহসিক অভিযানে পথপ্রদর্শক হিসাবে এসব হাতিয়ারপাতি নিয়ে রসায়নশাস্ত্রের গুণীয় পর্যায়টি এমন একটি স্থানে পৌছায়, যেখানে সঠিক পরিমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একবার পথ খুলে যাওয়ার পর এবং সঠিক কোন পথে চলতে হবে তা নির্দেশিত হওয়ার পর প্রকৃত অগ্রগতি আরম্ভ হয়। আইন ও শৃংখলা বিদ্যমান রয়েছে, এটি যখন গৃহীত সত্য হিসাবে পরিগণিত হয় তখনই জড়পদার্থের গবেষণা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে রসায়নশাস্ত্র নিউটনের

চিন্তাধারা ধরে অগ্রসর হতে থাকে। ডাল্টনের সময়ে বেখানে মাত্র বিশটি বৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ১৯০০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা বহুবিধের বেশী হয়। রসায়নশাস্ত্রের অগ্রগতি এমনি করে রেকর্ড পর্যায়ে পৌছায়।

ডাল্টন আমাদেরকে প্রমিত একটি ধারণা দিয়েছেন যে, পরমাণু হচ্ছে পদার্থের সঠিকতম কেন্দ্র এবং তা নিউটন বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অপ্রতিত পরীক্ষার ফলে ডাল্টনের কল্পিত পরমাণুর চেয়ে অনেক বেশী জটিল পরমাণুর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। ১৮৫৩ সালে ক্যানসনের পরীক্ষন থেকে শুরু করা যাক। তিনি একটি টিউবের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দিলেন, ফলে টিউবটি ফাঁকা হয়ে গেল। তারপর গ্যাসের অধিকতর শক্তিশালী বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করলেন এবং আরও বেশী গ্যাস নিয়ে চেষ্টা চালালেন। তারপর আবার ১৭৭৮ সালে ক্রুকস-এর পরীক্ষা পর্যায়ে এসে। ক্রুকস তাঁর টিউবে অধিকতর নির্ভুল ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করলেন এবং লক্ষ্য করলেন, বিদ্যুৎ প্রবাহ এ টিউবের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কালে এক অদ্ভুত আলোককণ্ঠা দেখা যায়। জে, জে, থমসন প্রমাণ করলেন যে, এ রহস্যময় আলোকরশ্মির আধান (চার্জ) অশূন্য (নিগেটিভ)। এ অবর্ণনীয় গতিতে প্রযণ করে এবং এর কোন ওজন নেই বললেই চলে। এ রশ্মিকে বলা হয় ক্যাথড রশ্মি, আর যে টিউব এ রশ্মি উৎপাদন করে তার নাম ক্যাথড রশ্মি টিউব। পরবর্তী পর্যায়ে এ রশ্মি ইলেকট্রন প্রবাহ নামে পরিচিত হয়।

তারপর বেকোরেল ও কুরীরা ‘তেজ’ আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের ফলে উপ-পারমাণবিক একটি সম্পূর্ণ নতুন জগতে প্রবেশ ঘটে। পরমাণু আর তখন পদার্থের কঠিনতম কেন্দ্র থাকে না। পরমাণুতে ছোটখাটো সৌরজগতের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়। এর প্রধান পিতৃ কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং তাতে সকল গতিটিত প্রোটন গুচ্ছিত হয় এবং চারিদিকে পরিব্যাপ্ত পিতৃ হচ্ছে নিগেটিভ ইলেকট্রন শক্তির ইউনিট, নির্দিষ্ট প্যাটার্নে সরবরাহ হয়ে থাকে। পরমাণুর রাসায়নিক ও শারীরিক ধর্ম, নিউক্লিয়াসের আধানের তারতম্যের এবং চারদিককার ইলেকট্রনগুলির ব্যবহার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। প্রথমে উপ-পারমাণবিক কণিকার নিউটনের চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা চলে, কিন্তু শিগ্গীরই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ‘মাকবো’ কেলের চলমান কণিকাগুলির আচরণ পরিচালনাকারী আইনাবলী যখন সব অ্যাটমিক কেল প্রয়োগ করা হয়, তখন তা কাজে লাগে না। কাজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অন্যান্য উপ-পরমাণু কণিকাগুলির আচরণ গাণিতিক সংজ্ঞায় ব্যক্ত করার জন্য নতুন গণিতশাস্ত্র, কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা ক্যালকুলাস অব প্রোবেবলিটিজ-এর সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯২৭ সালে হেইসেনবার্গ উপ-পারমাণবিক প্রপঞ্চের ক্ষেত্রে কেন যে নিউটনীয় আইনাবলী প্রযোজ্য হয় না, তা ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর “অনিশ্চয়তার নীতি” বিবৃত করেন। এ অনিশ্চয়তার নীতি প্রকাশ করে, “যে কোন একটি দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে একটি

কণিকার অবস্থিতি ও গতিবেগ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব।" যতবারই আমরা একটি ইলেকট্রন পর্যবেক্ষণ করি, ততবারই আমরা এর অবস্থার পরিবর্তন করি। হয় আমরা এর স্থান পরিবর্তন করি, না হয় করি গতি, অথবা উভয়ই। কাজেই আমরা একটি ঘটনা সংঘটনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে পারি; কিন্তু কোন একটি ঘটনা সঠিক করে দেখিয়ে দিতে পারি না। তাই আমরা বলি যে, প্রকৃতি দৈবের স্থিতিশীল আইনাবলী অনুসরণ করে চলে। যেহেতু এসব আইনাবলী বর্ধার্থী স্থিতিশীল, কাজেই রসায়নশাস্ত্রে আমাদের এমনি সুনির্দিষ্ট এবং ভবিষ্যৎবাণীর উপযোগী আইনাবলী বিদ্যমান। সাধারণ ভাবেই আমরা গবেষণাগারে বহুসংখ্যক আয়তন বা অণু-এক কথায় লক্ষ লক্ষ অণু নিয়ে গবেষণা করে থাকি। আমাদের দ্রবণ ও মিশ্রণের কালে প্রতিটি আয়তন স্বতন্ত্রভাবে ভবিষ্যৎবাণীর অনুগত বিংশংখল রকমের আচরণ করে। এতদসত্ত্বেও অনেকখানি নিশ্চয়তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ফল কি দাঁড়াবে, সে সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি। ঝড়ে শত সহস্র আয়তনও হয়তো প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকতে পারে। তাহলেও যেহেতু আমাদের বিশ্লেষণধর্মী নিক্তিতে এত সামান্য পরিমাণ বা সংখ্যক আয়তন ওজন করা সম্ভব নয়, কাজেই আমরা প্রতিক্রিয়াকে শতকরা ১০০ ভাগ পুরাপুরি বলে দাবী করি।

দ্যানাওয়ে বলেন যে, সববিধুই আমাদের পর্যবেক্ষণের নিক্তির উপর নির্ভর করে— যা আমাদের কাছে শতকরা ১০০ ভাগই প্রতিক্রিয়া করলো বলে মনে হবে। হতে পারে পর্যবেক্ষণের আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে তা আদৌ সম্পূর্ণ নয় এমনি প্রতীয়মান হবে। কাজেই এক গ্রাম কার্বন ব্ল্যাক যখন এক গ্রাম ময়দার সঙ্গে মিশানো হয় তখন আমাদের কাছে তা ধূসর বর্ণের মনে হলেও ক্ষুদ্রতর রোগজীবাণু যখন হামাণ্ডি দিয়ে উপরে উঠে আসে, তখন তার কাছে এটি বিরাট কালো-সাদা প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ বলে মনে হয়। তার দেখার দৃষ্টিকোণ আদ্য আমাদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে সব সময়ই একটা তফাত রয়েছে।

আমরা যে সকল আইন আবিষ্কার করেছি, রসায়নশাস্ত্র তা পালন করে চলে মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীল বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। আমাদের পদার্থ-রসায়ন-আইনাবলীর ভিত্তিমূলে সুস্পষ্ট বিংশংখলা বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু আমরা অসংখ্য স্থিতিশীল আইন নিয়ে কাজ করি, কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ও সঠিক ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং বিংশংখলার মধ্য থেকে একটা সুসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পায়।

পরিসংখ্যানের আইনাবলীর অন্তর্নিহিতে কোন পরিচালনাকারী শক্তি বিদ্যমান? যখন কেউ প্রকৃতিতে একটি ঘটনা সংঘটনের সম্ভাবনার জন্য আকস্মিকতার আইন প্রয়োগ করে, যেমন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ থেকে আকস্মিক ভাবে একটি মাত্র প্রোটন অণু সৃষ্টির প্রয়াসী হয়। তাহলে যদিও আমরা পৃথিবীর বয়স তিন মহাপঞ্চ বছর বা আরও বেশী

হতে দেই, তাহলে এমনি একটি আকস্মিক সৃষ্টির জন্য তা পর্যাপ্ত হবে না। এসব বিশৃংখলার ভিতর থেকে যে সুসামঞ্জস্যতা আর শৃংখলা দেখা দিয়েছে, তা একমাত্র কোন ভবিষ্যতদর্শী পরিচালনাকারী বিরাট শক্তির নির্দেশ থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেহেতু আমরা আমাদের বর্তমান বৃদ্ধিমস্তার বলে স্থান অথবা গতিবেগে কোন প্রকার রদবদল না করে একটি ইলেক্ট্রনকে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হইনি, কাজেই হতে পারে আজও হেইসেনবার্গের অনির্দিষ্টকরণ সম্পর্কিত নীতি তাই টিকে আছে। শক্তি সম্পর্কে আজ আমরা যা জেনেছি, একদিন আসবে যখন আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী জানতে পারবো এবং সেদিন হয়তো আমরা আজ যেমন স্থিতিশীলতা নিয়ে মংগল গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি, ঠিক তেমনি স্থিতিশীলতা নিয়ে একটি ইলেক্ট্রনকে দেখতে পাবো। বর্তমানে হেইসেনবার্গের নীতিগুলি উপ-আণবিক কণিকাগুলি সম্পর্কে আমাদের গবেষণাকার্যে যেমন প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি ডালটনের আণবিক থিওরী ঊনবিংশ শতকের রাসায়নিকদের কাছে এক অবর্ণনীয় মূল্যবান সম্পদ ছিল। আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পদার্থ ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের যা কিছু জানা একান্ত প্রয়োজন ছিল, আমরা তার সব কিছু জানি না। প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র উপরিভাগে আঁচড় কাটতে সক্ষম হয়েছি। এমনি হতে পারে যে, উপ-পরমাণু পর্যায়ে যাকে আমরা বিশৃংখলা বলে উল্লেখ করেছি আসলে তা ঠিক নয়। আমাদের চিন্তাধারা ভুল হতে পারে, এ প্রপঞ্চ সম্পর্কে ভসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে আমাদের এ ভুল ধারণা জন্মাচ্ছে।

প্রকৃতির মাঝে সর্বত্র আমাদের চোখে পড়ে সুশৃংখলা আর পরিকল্পনা। মনে হয়, মহাবিশ্ব এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছে। পরমাণুর মধ্যে যে ক্রম বিদ্যমান, তা থেকে এ যুক্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ একটি নির্দিষ্ট ধরণ, যা নাকি হাইড্রোজেন থেকে ইউরেনিয়াম এবং তারপরও অনুসৃত হচ্ছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির জন্য প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের বন্টন পরিচালনাকারী বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যতই জ্ঞানলাভ করি, সে সংগে আমরা জড়পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান শৃংখলা এবং ক্রম সম্পর্কে ততই সচেতন হই। আমরা একদিন জানতে পরবো, কিভাবে এসব বিরাটকায় জড়পদার্থ সৃষ্টির জন্য শক্তির সমাবেশ হয়েছিল। আইনস্টাইনই সর্বপ্রথম জড়পদার্থ ও শক্তির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখিয়ে দেন। মানুষ কেবলমাত্র আণবিক শক্তির গোপন রহস্যের দ্বার উদঘাটন করতে আরম্ভ করছে। বর্তমানে আমরা জড়পদার্থ থেকে শক্তি লাভ করছি। একদিন আসবে, যখন আমরা শক্তি থেকে জড় পদার্থ সৃষ্টি করবো।

মনে হয় রাসায়নিক দিক থেকে মহাবিশ্ব একটি। অন্যান্য হচ্ছে, আমাদের পৃথিবীতে যে সকল মৌলিক পদার্থ রয়েছে তেমনি পদার্থ খুঁজে বার করার উপযোগী উপায় ও পদ্ধতি রয়েছে এবং দেখা গেছে সবই এক। এমনকি দূরবর্তী নক্ষত্রে পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীর

কাছে সুপরিচিত মৌলিক পদার্থ আমরা চিনতে পারি। আজকের দিনের বিজ্ঞানের বিশ্বাস যে, যে প্রাকৃতিক আইন আমাদের গ্রহকে পরিচালনা করে, মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহগুলিও সেই একই আইনানুসারে পরিচালিত হয়। যে দিকে আমরা তাকাই, সর্বত্র আমাদের নজরে পড়ে সুকল্পিত পরিকল্পনা, ক্রম এবং সমন্বয়। তাই আমার মনে এ বিশেষ সন্দেহের 'আর কোন অবকাশ নেই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ এক মনীষা এসব কিছু পরিকল্পনা করেছেন; সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এ মহাবিশ্বকে এর নির্দিষ্ট গন্তব্য পথে পরিচালনা করেছেন।

পরিকল্পনা ও ক্রমের অত্যন্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে যদি উল্লেখ করার সময় ও স্থান সংকুলান হতো, তাহলে আমি পাঠকবর্গকে একবার পানি আবর্ত, কার্বনডাই অক্সাইড আবর্ত, অ্যামোনিয়া আবর্ত এবং অক্সিজেন আবর্ত-এর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে অনুরোধ করতাম। এর সবই একটি পরিকল্পিত মনের এবং গঠনমূলক শক্তির পরিচায়ক।

যদিও এখনও প্রকৃতিতে অনেক বিষয়ই আছে যা নাকি বর্তমানে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয় এবং আজও সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত, তাহলেও আমরা পুরাকালের লোকদের মত ভুল করতে যাব না। যেমন, তারা কোন অবর্ণনীয় বিষয় বুঝতে গিয়ে দেবতার শরণাপন্ন হতো এবং একে একটি কাজ একেক দেবতার উপর ন্যস্ত করতো। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান যতই উন্নতিলাভ করলো এবং প্রকৃতির রহস্যময় প্রপঞ্চ যতই মানুষের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠলো, তখন প্রকৃতির এসব প্রপঞ্চের মূল কারণ মানুষের জানা হলো, তখন আর তার জন্যে দেবতার উপস্থিতির কোন প্রয়োজন রইলো না। অনেকের কাছে এমনিভাবে আল্লাহ অবাস্তিত হয়ে পড়লেন।

আল্লাহকে অথবা আল্লাহর কল্পনাকে অবাস্তিত মনে না করে, অথবা তথাকথিত অপরিজ্ঞাত বিষয়াবলীর মধ্যে তাঁকে শ্রেণীভুক্ত না করে মহাবিশ্বের আইন ও শৃংখলার মধ্যে তাঁকে দেখা এবং তাঁর কাজের প্রশংসা করা আমাদের উচিত। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম-শৃংখলা আবিষ্কার করে “অপরিজ্ঞাত”-কে হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারবে, কিন্তু মানুষ কখনই প্রকৃতির আইনকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ হচ্ছেন সকল আইনের স্রষ্টা; মানুষ সেই আইন আবিষ্কার করে এবং ক্রমে ক্রমে তারই সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। মানুষ যে আইনই আবিষ্কার করে না কেন, তাই তাকে আল্লাহকে বুঝার জন্য নৈকট্যে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য এ পন্থাই ব্যবহার করেন। এ তাঁর আশ্ব-প্রকাশের একমাত্র পন্থা নয়, বাইবেলে তাঁর পবিত্র ও বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে; কিন্তু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞান আল্লাহর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে

[আলবার্ট ম্যাককম্বের উইনস্টেটার ।। জীববিদ্যাবিদ : এম,এ,পি,এইচ,ডি, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রাঙ্কয়েট টাডিজ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। বেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার সাবেক অধ্যাপক, ১৯৭৬ সাল থেকে বর্তমানে টেক্সন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান। জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, সুপ্রজনন বিদ্যার পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা এবং “বংশধারা ও তোমার জীবন” (হেরিডিটি আন্ড ইওর লাইফ) নামক জনপ্রিয় গ্রন্থ রচয়িতা। ফ্লোরিডা অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট। সুপ্রজনন বিদ্যা ও ড্রোসোফিলার রজনরশির প্রভাব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।]

যে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোনদিন নিজেই জড়ায়নি, তিনি যেমনভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহর প্রতি তার যে গভীর ভক্তি বিদ্যমান, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কি তেমন বিশ্বাস আর আল্লাহতে একই রকম ভক্তি থাকা সম্ভব? বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে এমন কিছু আছে কি, যা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বকে দ্বন্দ্ব করত পারে?

অনেকের মনে এরূপ প্রশ্ন জাগে। তারা মনে করেন, বৈজ্ঞানিকেরা তাদের ব্যাপক গবেষণার মধ্যদিয়ে এমন সত্য উদ্ঘাটন করেন, যা বাইবেলের সে শিক্ষার পরিপন্থী ধারণা জন্মায়, যে শিক্ষার ব্যাখ্যা ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই করে থাকেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এ মনোভাব সুস্পষ্ট করে তুলেছে। কলেজে ছাত্র থাকাকালীন আমি যখন প্রথম স্থির করলাম যে, বিজ্ঞানই আমার পাঠ্য বিষয় হবে, তখন আমার সে দিনটির কথা খুব ভাল করে মনে আছে। সেদিন আমার এক খালাআম্মা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে মতটা পাশ্টাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি বিষয়টি ঠিক এমনভাবে আমাকে বলেছিলেন, “আল্লাহতে তোমার যে বিশ্বাস রয়েছে, বিজ্ঞান পড়লে তা তোমার সে বিশ্বাসটাকে নষ্ট করে দেবে।” তার কাছে এবং আরো অনেকের কাছেই বিজ্ঞান ও ধর্ম হচ্ছে দু’টি বিরুদ্ধ শক্তি; কেউ যদি একটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের মতে তাহলে অন্যকে বর্জন করতে হয়।

আজ আমি অত্যন্ত আনন্দের সংগে এ কথাই বলেছি যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন আর গবেষণার পর আল্লাহতে আমার বিশ্বাস শিথিল না হয়ে আরও জোরদার হয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা এ বিশ্বাস আরও মজবুত বুনিয়েদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান আল্লাহর মর্যাদা আর সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে, তা আরও জোরদার হয়। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে, অনেক সময় প্যাগানদের মত কুসংস্কার ধীরে ধীরে প্রবেশ করে থাকে। বিজ্ঞান এ অন্ধ কুসংস্কারকে অপসারিত করে তার স্থলে এমন নির্ভুল বিষয় পেশ করে--যা হাতে-কলমে প্রমাণ করা যেতে পারে এমনি সাক্ষ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট।

এক সময় ছিল যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসার জন্য রক্ত ঝরানো এবং ধূপধূনা দেওয়া হতো। কিন্তু তারপর যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ পদ্ধতির স্থলে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে, তেমনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কে আমাদের কতিপয় পুরানো ধারণা বদলে গেছে। আমরা আজ জানতে পেরেছি, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের যে অসুখ হয়ে থাকে, তা আমাদের পাপের জন্য আল্লাহর দেওয়া শাস্তি নয়; অধিকন্তু তা হচ্ছে সকল জীবদেহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সব প্রাকৃতিক আইনাবলী মেনে চলা একদল অতিক্রম প্রাণীর আক্রমণের ফল। এ বিষয়টি জানার ফলে আল্লাহ সম্পর্কে আমরা আরো বেশী করে জানতে পেরেছি এবং তিনি যে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

কার্বশিল্লের সৃষ্টিকারী, শিল্পীর প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ভালভাবেও বিস্তৃত না জানতে পারলে আমাদের পক্ষে তাঁর সৃষ্টি-শিল্প নিদর্শনের বিশদ বিশদ গবেষণা সম্ভব নয়। তেমনি বিশ্বের প্রকৃতি এবং এর অধিবাসীদের সম্পর্কে স্বভাবের জটিলতার মধ্যে আমরা যতই অবগাহন করবো, ততই আমরা তাদের সৃষ্টিকারী সর্বশক্তিমান কার্বশিল্লীর (আল্লাহর) প্রকৃতিকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবো। আমার গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশস্ত-জীববিদ্যা নামে অভিহিত। অর্থাৎ, জীব সম্পর্কে এ শাস্ত্রে বিশদভাবে গবেষণা করা হয়ে থাকে। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্য আমাদের এ গ্রহে বসবাসকারী সকল জীবের চেয়ে বিশ্বয়কর আর কিছুই নেই।

রাস্তার ধারে জ্ঞানানো একটা ছোট লবংগ গাছের কথা ধরা যাক। মানুষের তৈরী সব চমৎকার চমৎকার যন্ত্রপাতির মধ্যে কোথায় এ উদ্ভিদের মত আশ্চর্য যন্ত্র আমরা পাবো? এখানে আমাদের সামনে রয়েছে একটি জ্যাস্ত মেশিন যা নাকি অত্যন্ত বিনীতভাবে, কিন্তু একই রীতিতে অবিচলিত থেকে দিনের পর দিন যে পদার্থ থেকে সকল প্রাকৃতিক জীবন সৃষ্টি হয়ে থাকে; সে পদার্থ বা প্রোটোপ্লাজমের নির্দেশে হাজারো রকমের জটিল রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কোথা থেকে এমন জটিল জ্যাস্ত মেশিন এলো? আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে ব্যক্তিগতভাবে তো আর এ উদ্ভিদটি সৃষ্টি করেননি—এর প্রতিটি পাতা আর শিকড় তার নিজের হাতের সহযোগে তৈরী করা বস্তু নয়। না,—নিজস্ব চিরস্থায়িত্বকরণ ক্ষমতা, (নিজ থেকে বংশানুক্রমে বংশ রক্ষার ক্ষমতা) সম্পন্ন প্রাণ তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, বছরের পর বছর ধরে যাতে করে একই প্রজাতি জন্মায় এবং যাতে একই বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আমরা একে লবংগের গাছ বলে চিনতে পারি, তার ব্যবস্থা মাত্র তিনি করে দিয়েছেন। আমার কাছে জীববিদ্যার এটিই হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় এবং আল্লাহর মহাশক্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ। এখানে আমরা অস্বাভাবিক রকম ক্ষুদ্র একটি জগত নিয়ে পর্যালোচনা করছি মাত্র। কারণ, একটি নতুন লবংগের উদ্ভিদ সৃষ্টির যে ধরণ তা একটি মাত্র দেহকোষের সামান্য এক অংশে অবশ্য রয়েছে। আবার সে দেহকোষটিও এত ক্ষুদ্র যে, একমাত্র অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্সের মধ্য দিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাকে দেখা সম্ভব। যে একটি মাত্র ক্ষুদ্রকায় দেহকোষ থেকে একটি উদ্ভিদ জন্মায়, তার

ভিতরে ভেতাদিক ক্ষুদ্রকায় ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশক্রমে উদ্ভিদের প্রতিটি শিরা, প্রতিটি কেশ এবং কাণের উপরিস্থিত প্রত্যেকটি শাখা, শিকড় ও পত্রপুষ্প তৈরী হয়ে থাকে।

তদুপরি ক্ষুদ্রাকৃতি ইঞ্জিনিয়ারদের কখনও কখনও তাদের উপাদানে নমুনা পাণ্টাবার ক্ষমতাও রয়েছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা সম্ভবতঃ কতকটা অধিক কর্মক্ষম সৃষ্টির অধিকারী। এক সময় ছিল যখন অনেকেই ভাবতেন, আল্লাহ দুনিয়ার যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সে আকারে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন তা ঠিক সে আকারে নেই, এরূপ ধারণা মনে স্থান দেওয়া পবিত্র জিনিসের দোষ ধরার সমতুল্য! কিন্তু আজ অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষ একথা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, জ্যাস্ত পদার্থের মধ্যে নিজে থেকে নিজেকে সৃষ্টি ও বংশরক্ষার যে জটিল পদ্ধতি বিদ্যমান, তাতে ঠিক একই রকম জীব সকল যুগ ধরে সৃষ্টি করার চাইতে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম এমনি অবয়বী সৃষ্টির মধ্যে অনেক বেশী সাফল্য বা কৃতিত্ব বিদ্যমান।

বৈজ্ঞানিকেরা বর্তমানে আরেকটি চরম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বলে মনে হয়— তা হচ্ছে টেষ্ট টিউবের মধ্যে যথার্থ প্রাণ সৃষ্টি। যদিও এ আবিষ্কার এখনও অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, কিন্তু এ কথা সত্য যে, তারা ডেস্ অগ্নিরাইবোনুক্রে অ্যাসিড (ডি এন এ) নামক একটি পদার্থ যাতে করে সৃষ্টি হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ক'টি রাসায়নিক দ্রব্যকে পরস্পর একত্রিত করতে কৃতকার্য হয়েছেন^(১)। এ রাসায়নিক পদার্থ এর আগে এমন একটি পদার্থ ছিল, যা নাকি কেবলমাত্র প্রাণবন্ত জীবকোষেই সৃষ্টি হতো। বংশ পরস্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে যে বস্তু ক্রমশঃ চলে আসে, এ হচ্ছে জীবনের সে মূল পদার্থ এবং এ থেকে যন্ত জীবনের সৃষ্টি হয় সবার মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছাপ থাকে।

ডি, এন, এ-কে জীবনের একরূপ থেকে, সাফল্যজনকভাবে জীবনের আরেক রূপের প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—এতে করে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যসমূহের রূপান্তরের মত একটা কিছু অর্জন সে করেছে। মানুষের তৈরী এ ডি-এন-উ কেও এমনি নিবাসবদ্ধ করা যায়? যদি তাই হতো, তাহলে মানুষ প্রারম্ভিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সৃষ্টিতে সক্ষম হতে পারতো।

এ প্রচেষ্টার সর্বশেষ ফল কি দাঁড়াবে, তা এখন অনিশ্চয়তার পাল্লায় দোদুল্যমান। অনেক বৈজ্ঞানিকই মনে সন্দেহ পোষণ করেন, আবার অনেকে মনে করেন এটি সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু যদি বা এ উদ্যম সফলকাম হয় তাহলে কি এ সফলতা, যে মানুষের আল্লাহুর্থে ঈমান আছে, তাকে কোন প্রকারে ঈমানের দিক থেকে দুর্বল করে দেবে, যে মানুষের ঈমান অগভীর-ভাসাভাসা থাকে। কিন্তু যাদের ঈমান সুচিন্তিত মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাদের কাছে এ সাফল্য সে সর্বশক্তিমান সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তার কাজকে উপলব্ধি করতে আরেক ধাপ এগিয়ে দেবে— তাঁর সৃষ্টির যে অসীম রহস্যাবলী মানুষ অতিশয় কষ্টসহকারে উদঘাটন করছে, তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়ক হবে।

সত্যকে যদি মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে আল্লাহতে বিশ্বাস হবে আরও সুগভীর এবং সুদৃঢ়।

১. ইতিমধ্যে টেষ্টটিউব গবেষণায় মাধ্যমে সন্তান জন্মের ব্যাপারটি বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

আস্তিকতার কাছে প্রকৃতিবাদকে অবশ্য মাথা নোয়াতে হবে

[ওশিন ক্যারল কারকাসিট্‌স্ ।। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার : বি, এস-সি, রাইস ইন্সটিটিউট, এম, এস-সি, পি- এইচ, ডি, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় । শেল অয়েল কোম্পানীর সাবেক রিসার্চ কেমিস্ট, অন্তঃপর মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাক-এর একজন । বর্তমানে আমেরিকান সিনামাইড কোম্পানীর প্রোসেস উন্নয়ন বিভাগের গ্রুপ লীডার । আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সের সদস্য । কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অণুঘটনে বিশেষজ্ঞ ।]

মানুষের ইতিহাসের সকল যুগ ধরে মানুষ তিনটি নিগূঢ় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এসেছে : আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি দুনিয়ায় আছি? আমি যাচ্ছি কোথায়?

অধিবিদ্যার বেশ কয়েক শ' বইয়ে এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । অস্তিত্ব সম্পর্কিত কূটপ্রশ্ন হচ্ছে যুগ-প্রাচীন সমস্যা । পরিচ্ছদের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আস্তিকতা বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মনকে সর্বাপেক্ষা সম্ভোষজনক জবাব প্রদান করে থাকে । এ অন্য কোন অভিমত অপেক্ষা পর্যবেক্ষণ করা বাস্তবতা সম্পর্কে ভাল বর্ণনা বা ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে । সে সঙ্গে কোন বিকল্প ধারণার পরিবর্তে উত্তর না দেওয়া প্রশ্নগুলির অধিকতর সহকৃষ্ট অবশিষ্টাংশ রাখে ।

অধিবিদ্যার বিশ্বাস সম্পর্কে বলা যায় যে, আমাদের আধুনিক দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা প্রধানতঃ দু'টি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । একটি শ্রেণী, নিঃসন্দেহে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এরা হচ্ছেন “প্রকৃতিবাদী” । সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীকে “আস্তিক” বলা যেতে পারে । টেকনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবশ্য অনেক বেশী সহজতর করে এ শ্রেণী-বিভাগ দাঁড় করানো হয়েছে ।

আমরা এখানে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে “প্রকৃতিবাদী” এ শব্দটি ব্যবহার করেছি—ব্যবহার করেছি বাস্তবতা সম্পর্কিত সে অধিবিদ্যার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়াকে বুঝানোর জন্য, যে মনোভাব “প্রকৃতির চরম বাস্তব” এ কথাটি পূর্বেই অনুমান করে নিয়ে থাকে । “প্রকৃতি” বলতে সময় ও শূন্যতার মধ্যে সক্রিয় পদার্থ ও শক্তি উদ্ভূত সকল প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ আর ঘটনাবলীকে বুঝায় । প্রকৃতিবাদীগণ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত নীতিগুলি দ্বারা সকল বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে । কাজেই আস্তিকদের মতো বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য স্বতঃসিদ্ধভাবে আত্মাহুকে টেনে আনার কোনই প্রয়োজন হয় না । এ বিভিন্নমুখী এবং পরস্পর বিরোধী মতবাদ নিয়ে আলোচনার আগে আসুন আমরা “বাস্তবতার জগত” কথাটি বলতে কি বুঝায়, তাই গভীরভাবে বিবেচনা করে নেই ।

“বাস্তবতা” বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে দার্শনিকগণ জোরগলায় বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন । প্রপঞ্চবাদী, আদর্শবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, বাস্তববাদী, আস্তিকতাবাদ—সবাই যে

এক্যমত হবেন না, তাতে কোন ভুল নেই। এ প্রবন্ধকার মনে করেন, গড়পড়তা প্রায় প্রত্যেকটি বিজ্ঞানীই সমস্যাটি সম্পর্কে “সাধারণ জ্ঞানের” দিক থেকে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছেন এবং আমরা যাকে ‘বাস্তবতা’ বলে থাকি, তার নিম্নরূপ বর্ণনায় গুরুতর রকমের আপত্তি উত্থাপন করবেন না।

বাস্তবতার জগত বলতে, আমাদের ইন্দ্রিয় যা প্রত্যক্ষ করে, মন যা কিছু কল্পনা ও ধারণা করে, তাকেই বুঝায়। পৃথিবী, আকাশ, পানি, বৃক্ষ, পশু, মানুষ সবাইকে, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিকারী এবং বিচারশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞ মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে তাকে। একজন গরীব প্রজা এ বিষয়ে সন্দেহ করে না যে, তার চিরকাল ধরে দাবীদার ভূ-স্বামী খাঁটি (যদিও সে কামনা করতে পারে তার ভূ-স্বামী যেন খাঁটি না হয়)। এ রকম অনেক বিষয় আছে (এবং যার তালিকা অনির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে) সেবেরই খাঁটি অস্তিত্ব বিদ্যমান।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের বাস্তবতার দুনিয়ার বাইরের বস্তু ছাড়া, মানুষের নিজের মধ্যে “আভ্যন্তরীণ” বাস্তবতার বস্তুও বিদ্যমান। একে সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ রূপ, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অনুভূতির জগত বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ‘সচেতন’। সে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। সে সময়ও শূন্যের বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম এবং সে এখনও ধারণা করতে পারে যে, সে কিছু একটা হবে, এমন কেউ, অথবা অনুমান করতে পারে এমন স্থান আছে যেখানে বা যার মধ্যে সে নেই। তার যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। কারো সংবেদনশীলতা রয়েছে এবং সে সংগে আছে অতীতের অনুভূতি। অধিকন্তু সে—ভবিষ্যতে কিরূপ মানসিক বোধ জাগবে, সে সম্পর্কে পূর্ব থেকে কামনা করে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সীমাবদ্ধ সম্ভাবনার মধ্যে তাকে কোন পথে চলতে হবে তারও ভবিষ্যৎবাণী করে। তার ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং আকাংক্ষা হয়েছে।

মানুষের ভালমন্দ বোধ, চরিত্রের একটি নাম সম্পর্কে বোধশক্তি বিদ্যমান আছে বিবেক, নৈতিকস্বভাব। নিজের ও অপরের প্রতি অন্তরের দায়িত্ববোধ—যা নাকি তার চরিত্র ও মনোভাব কি ধরনের হবে, তা নির্দেশ করে থাকে। সাহস, একনিষ্ঠতা, বীরত্ব, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, প্রেম প্রভৃতি শব্দ মানুষের স্বভাবের “আভ্যন্তরীণ সত্তার”ই ব্যাখ্যা মাত্র।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের আধুনিক দুনিয়ায় যাকে আমরা “বাস্তবতার জগত” বলে অভিহিত করে থাকি, তা ব্যাখ্যা করার জন্য এ দু’টি প্রধান বিরুদ্ধ মতবাদ বিদ্যমান। আসুন আমরা সংক্ষেপে এ দু’টি মতবাদের শক্তি আর দুর্বলতা সম্বন্ধে বলি। সকল বিতর্কের উর্ধ্বে, একটিকে সত্য এবং আরেকটিকে মিথ্যা প্রমাণ করার কোন চেষ্টাই করা হবে না। এমনি প্রচেষ্টা করা হলে তা হবে দাত্তিকতা। আন্তিকতা সত্য নয়, কারণ খৃষ্টান ধর্মের আল্লাহকে একমাত্র অস্তিত্বের যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। খৃষ্টানদের আল্লাহ্ বা আল্লাহ্ সম্পর্কে খৃষ্টান ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কিত আমাদের তথ্যের সূত্র হচ্ছে, বাইবেল। কিন্তু আন্তিকতা বলতে, বাইবেলকে বাদ দিয়েও

যা বুঝায়, তা সকল দিক থেকে আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যে প্রমাণ করতে পারবো বলে আশা করি যে, আন্তরিকতা প্রকৃতিবাদের চাইতে অধিক যুক্তিযুক্ত—আসলে এটি তাই।

আমরা প্রথমে প্রকৃতিবাদীদেরকে, বাস্তবতার বহির্জগত বলতে কি বুঝায় তাই ব্যাখ্যা করতে আহ্বান করি। তার মৌলিক অনুমিতি হচ্ছে, জড়পদার্থের (বা শক্তির, যেহেতু জড়পদার্থ শক্তির প্রকাশ্য) নিত্যতা। দৃশ্যতঃ আমাদের পৃথিবী ও আমাদের সৌরজগতের অনন্ত বয়স আছে বলে মনে হয়, কিন্তু যেসব মৌলিক পদার্থ দ্বারা এরা গঠিত তা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণীজ পদার্থ থেকে প্রাণের এবং অবশেষে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এ সম্পর্কে তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা শরীর রাসায়নিক নীতির ফল। প্রাকৃতিক বিশ্বের যে ক্রম ও সমরূপিতা, তা হচ্ছে পদার্থ ও শক্তির অন্তর্নিহিত ধর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, আকাশে যে রংধনু দেখা যায়, আসলে তা হচ্ছে বাতাসের মধ্যে ভাসমান পানি-কণিকার মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি অতিক্রম করার সময় প্রতিফলিত হয়ে এর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার দরুন সৃষ্ট রং। বাইরের সকল বাস্তবতা, অতি সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, “সময় ও শূন্যের মধ্যে জড়পদার্থ এবং শক্তির প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়।”

আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা সম্পর্কে প্রকৃতিবাদীদেরকে আরও অন্তর্দর্শী ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। স্পর্শবিন্দু থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্য দিয়ে সংঘারিত বৈদ্যুতিক ডাঙনা দ্বারা আমাদের স্পর্শজনিত অনুভূতিকে বুঝানো হয়। মস্তিষ্ক হচ্ছে বিরাটাকারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ এবং মস্তিষ্কই হচ্ছে আমাদের স্নায়ুিক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের যে অনুভূতি রয়েছে তা শুধুমাত্র মানবসুলভ প্রেরণা। অর্থাৎ, “শিক্ষিত আশ্র-স্বার্থ” আমাদের মধ্যে যে কাজ করে তারই বহিঃপ্রকাশ। আমরা সব সময় এ পথে অগ্রসর হয়ে ভাল ফল লাভ করেছি বলে উক্ত মনোভাব আমাদের সে অভিজ্ঞতার উপরই গড়ে উঠেছে। আভ্যন্তরীণ বাস্তবতার এবং সে সংগে বাস্তবতার বহির্জগতের কোন প্রকার প্রপঞ্চকে বোঝানোর জন্য (কম বেশী) যান্ত্রিক অর্থাৎ, প্রাকৃতিক একটা কৈফিয়ৎ দাঁড় করানো যেতে পারে।

এবারে আসুন, আমরা প্রকৃতিবাদের দুর্বলতা কোথায়, তাই একবার দেখে নেই। প্রথম কথা হলো প্রকৃতিবাদে, সৌরজগত বা মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু মহাবিশ্ব যে এক সময় সৃষ্টি বা সূচিত হয়েছিল এমন অসংখ্য প্রমাণ আছে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বজগতের জ্যোতির্বিদ্যাবিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণকে যদি স্বতঃসিদ্ধভাবে একটি সৃষ্টির সূচনাকাল ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সবচেয়ে ভালভাবে বুঝানো যেতে পারে। ধরে নিতে হবে এ সূচনাকালে বিশ্বজগতের সব অংশ উপাদানগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট অবস্থায় (বা একত্রিত অবস্থায়) ছিল। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা যাবে, সব ছায়াপথ ও জ্যোতিষ্ক অস্বাভাবিক রকম গতিবেগে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অনেক পৃথিবীশিষ্ট জ্যোতিষ্ক আড়াইবার পরিভ্রমণের পরই ছড়িয়ে গেছে। তদুপরি, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় আইনটি, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ

মহাবিশ্ব যে সৃষ্টি হয়েছে, তারই অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ। এ আইন (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমাদের সকল পর্যবেক্ষণের ফলের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়ে) এই নির্দেশ করে যে, মহাবিশ্বের পরিধি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে; যার অর্থ হচ্ছে যে, (এ আইন) এমনি সময়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছে যখন সকল জ্যোতিষ আপেক্ষিকভাবে একই তাপমাত্রায় পৌঁছবে। এ কথাটি সত্য হতে পারে, যদি বর্তমানে সব ক'টি জ্যোতিষের তাপমাত্রা এক না হয় এবং যদি অতীতে এ তাপ এক না থেকে থাকে। যেহেতু তাপমাত্রা যতই সমতার দিকে এগুতে থাকে বিতাড়নকারী শক্তি ততই হ্রাস পায়। কাজেই একথা সত্য যে, এসব জ্যোতিষের কখনও একই রকম তাপ হতে পারে না। কিন্তু এ কখনও যুক্তির কার্যকরী পরিণতিকে এড়িয়ে যেতে বা দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। যদি পদার্থ ও শক্তি শাস্ত্রত হয় এবং মহাবিশ্বের যদি কোন সূচনা না হয়ে থাকে, তাহলে এ 'এনট্রপি ব্লক'-এর কোন সম্ভাব্যজনকে কৈফিয়ত থাকতে পারে না।

আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় জগতকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারেও প্রকৃতিবাদের যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। কিভাবে আমাদের দেহ এবং মস্তিষ্ক কাজ করে, তার অনেকখানি বোঝানোর জন্য শরীর-রাসায়নিক নীতিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু 'কেন' এগুলি যে কাজ করে, এ থেকে তার কোন কৈফিয়ত আমরা দিতে পারবো না। অনেক ব্যাপারে পণ্ড থেকে মানুষ পৃথক কেন? কেনই-বা একমাত্র মানুষেরই আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা বিদ্যমান? মানুষ এ পর্যন্ত যত গবেষণা করেছে, তার মধ্যে কোথাও সে এমন প্রমাণ পায়নি যে, পত্তরা উপাসনার জন্য কোথাও বেদী নির্মাণ করেছে। মস্তিষ্কের সংগে মনকে সমান করে দেখার জন্য এ কি পর্যাপ্ত? আমরা কি করে স্মৃতি, ধারণা, যুক্তিবৃত্ততাকে ব্যাখ্যা করবো? প্রকৃতিবাদে এর কোন উপযুক্ত জবাব নেই।

আন্তিক বিশ্বমত অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকে— মহাবিশ্বের এ ক্রম, পরিকল্পনা ও সামঞ্জস্যের পশ্চাতে 'মহামন' বিদ্যমান। এক পরিমেয় সময়ে এ সত্তা জড়পদার্থ ও শক্তি সৃষ্টি করেছে, তিনি জ্যোতিষ্কসমূহ "একত্রিত অবস্থায়" এনে তারপর একটি সম্প্রসারণকারী মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার জন্য প্রারম্ভিক প্রেরণা শক্তি প্রদান করেছেন, যার ফলে জীবনধারণ সম্ভব হয়। তেমনি সকল পরিবেশসহ তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এডিটনের মতে এ নিয়মের সবকিছু আকস্মিকভাবে সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এ সত্তা, তাঁর বুদ্ধিমত্তার মত বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব আর ইচ্ছা তিনিই যুগিয়েছেন।

তিনিই মানুষের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা বোধ জাগিয়ে দিয়েছেন। তিনিই তাঁর নিজের প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে মানুষের মধ্যে নৈতিক স্বভাবটি জুড়ে দিয়েছেন। তাঁরই আদেশে প্রকৃতিতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। সৌন্দর্য, সত্য, সাহস, বিশ্বস্ততা, সততা, প্রেম এবং অন্যান্য সদগুণাবলী সবই আল্লাহর এমনি যে গুণাবলী রয়েছে, তা থেকে নেওয়া। মানুষের মন, আল্লাহর মন থেকেই এসেছে, কাজেই মানুষের মন জড় মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বেশী— কারণ মস্তিষ্ক হচ্ছে মনের হাতের ক্রীড়ানক।

আল্লাহ— আদি ও অন্ত

[এডমন্ড কার্ল কর্পকেন্ড ।। রিসার্চ কমিটিঃ বি, এ, টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এ, পি,-এইচ ডি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬ খৃঃ থেকে ইন্ডিয়ানা পোলিসের এলি লিলি অ্যান্ড কোম্পানীর লিলি রিসার্চ ল্যাবোরেটরীজের সহিত যুক্ত; বর্তমানে অর্গানিক কেমিক্যাল ডিভিশনের প্রধান । রবার রসায়ন কৃত্রিম জৈবিক ঔষধ, জৈবিক রসায়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।]

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যাবিদ, অধ্যাপক এডুইন কর্মকালীন অনেকবার বলেছেন, “দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সম্ভাবনার সংগে ছাপাখানার এক বিস্ফোরণের ফলে সংক্ষিপ্ত একটি অভিধান প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনার তুলনা করা যেতে পারে ।” আমি কোন প্রকার দ্বিধাসংকোচ ছাড়াই তাঁর এ উক্তির সংগে একমত ।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, আল্লাহ একজন আছেন এবং তিনি মহাবিশ্বের পরিকল্পনা করেছেন । সৃষ্টি করেছেন এবং রক্ষা করেছেন । কিন্তু আমি অধিকতর সূনিচিত হতে চাই । এ খুবই সত্য যে, “আল্লাহ” শব্দটি অযুত মানুষের কাছে অসংখ্য রকম জিনিস বুঝায়—অযুত মানুষ একে দুনিয়ার অসংখ্য ভাষায় ব্যবহার করেছে । আমরা যখন “আল্লাহ” সম্পর্কে কথা বলি তখন আমরা কি এ কথাটি বুঝাতেই চাই যে, আল্লাহ (১) বিশ্বজনীন সৃজনশীল মনীষা এবং প্রাকৃতিক সমন্বয় সাধনকারী আদর্শ; (২) হিব্রু ধর্ম বিশ্বাসে আল্লাহ, যিনি তাঁর সৃষ্ট মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং পরিচালক উভয়ই অথবা (৩) আমরা কি তাকে সেই বিশ্বাসে আল্লাহ হিসাবে ব্যাখ্যা করি, যেমনি ইহুদী জাতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যিনি নবী যীশুখ্রীষ্টকে পাঠিয়েছেন (যার সাহায্যে তিনি সকল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ।) কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা হওয়ার জন্য নয়, একটি হারিয়ে যাওয়া জাতির পুনরুদ্ধারকর্তা হিসাবে? যেহেতু দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম তাদের অশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে, কাজেই এ প্রশ্নের বহু প্রকার জবাব হতে পারে—প্রকৃত প্রস্তাবেই জবাব এত বেশী যে, আমরা উপরে বর্ণিত কেবলমাত্র তিনটি ব্যাখ্যা এখানে বিবেচনা করতে পারি ।

অবশ্য; এ খুবই সুবিদিত যে, এমন কতক লোক আছেন, যারা আল্লাহকে কেবলমাত্র সৃজনশীল মনীষা—এই একটি মাত্র সত্তা হিসাবে স্বীকার করে আবার কতক গোঁড়া লোক, রয়েছে যেমন ইহুদীরা—তারা, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করে । আবার খ্রীষ্টানেরা অপর তিনটি ধারণাকেই স্বীকার করে এবং তাদের অভিমত যে, সব আন্তিক একেবারে ধারণাকে পর পর অবজ্ঞা করে বা সরাসরি তাদের মতের পরিপন্থী ।

খ্রীষ্টান হিসাবে আমি বিশেষ করে উপরের তৃতীয় ব্যাখ্যাটিই মানি । আমি সে আল্লাহুতে বিশ্বাস করি যাঁর কথা বাইবেলের ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের গাথায় প্রকাশ ও প্রতিকৃতিগত করা হয়েছে । সব টেস্টামেন্টেই তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ও মহাবিশ্বের পালনকর্তা

হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রন্থ, বাইবেলের অধিকাংশ স্থান, তাঁর ও তিনি যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার যে সম্পর্ক তারই সন্ধান করতে তাঁর যে প্রচেষ্টা তারই বর্ণনায় ভরে আছে। অত্যন্ত সহজ-সরল বর্ণনা করে এ গ্রন্থের আরম্ভ হয়েছে : “সর্বপ্রথমে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র অনুকম্পা লাভকারী শ্লোক রচয়িতা দাউদের-উদ্ধৃতি এ ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, রাজা দাউদ বলেছেন : মূর্খ তার নিজের মনে বলে যে, আল্লাহ নেই। বাইবেলের মত গ্রন্থে সেখানে অত্যন্ত সহজভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেখানে আল্লাহকে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক বা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে মানুষের তৈরী যুক্তিবিদ্যার নিয়মমাত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগের চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সে যা হোক, কি করে জৈবিক রসায়ন বিজ্ঞান আল্লাহতে আমার যে অনঢ় বিশ্বাস রয়েছে তাকে আরও প্রভাবান্বিত এবং জোরদার করেছে আমি সে কথাই বলতে চাই।

আমরা এ কথা স্বীকার করবো যে, প্রকৃতিতে হয় আমাদের সর্বশক্তিমান সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্বাস করতে হবে অথবা এর একমাত্র বিকল্প হিসাবে আমরা এই যে বিশ্বজগত দেখছি, এটি আকস্মিকতারই ফল একথা মানতে হবে। যে ব্যক্তি জৈবিক রসায়ন বিজ্ঞানের চমৎকার জটিলতা এবং তদুপরি পরিব্যাপ্ত ক্রম বা বিন্যাস লক্ষ্য করেছে—বিশেষ করে প্রাণিজগতে—তার কাছে আকস্মিকভাবে এ সবার সৃষ্টির ধারণা বিপরীত।

মানুষ যতই মলিকিউলের কাঠামো সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা করবে, যতই তাদের মিথক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করবে, ততই এর পরিকল্পনাকারী ও নমুনাপ্রস্তুতকারীর প্রয়োজনীয়তা বেশী করে উপলব্ধি করবে।

এ হচ্ছে আমার নিজের অভিজ্ঞতা। গবেষণাগারের শত জটিলতার মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা নিয়ে আমি যখন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎমেশাই আমি আল্লাহ্র অপরিমেয় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছি। পশুর দেহের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যে জৈবিক ও জৈবরাসায়নিক কার্যরত প্রক্রিয়াসমূহ এতই জটিল যে, সেখানে মাঝে মাঝে বিশৃংখলা দেখা দেওয়া বা রোগের অনুপ্রবেশ একেবারেই বিচিত্র নয়। এত জটিল যান্ত্রিকতা যে কখনও সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এ দেখে মানুষ আচর্য হয়ে যায়, সবকিছুই একজন পরিকল্পক ও অসীম বুদ্ধিশীল রক্ষাকর্তার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। আমি যতই গবেষণা চালিয়ে যাই, আল্লাহতে আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ ততই দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং দুনিয়ার যে কোন জায়গায় আমার অবিশ্বাসী সহকর্মীদের মনোভাব ততই ব্যাখ্যাভীত প্রহেলিকা মনে হতে থাকে। মানুষের তৈরী সহজতম যান্ত্রিকতায় একজন পরিকল্পক ও একজন প্রস্তুতকারকের প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে এর চেয়ে দশ হাজার গুণ জটিল মেকানিজমের প্রয়োজন, তা সম্পূর্ণ নিজ থেকে সৃষ্ট হয়েছে এবং নিজ থেকে বর্ণিত হয়েছে—একথা চিন্তা করা সম্পূর্ণ আমার ধারণাভীত।

অনেক বৈজ্ঞানিক সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক কোন সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতির খুব বেশী সম্ভাবনাকে হয়তো মেনে নেবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ মেনে নেওয়া এবং খৃষ্টানদের আল্লাহতে সঠিক বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে যে ফাঁকটুকু রয়েছে, তা আপেক্ষিকভাবে খুব কম ব্যক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে। এ প্রবন্ধকারের দৃঢ়বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত দু'টি বিশ্বাসের মাঝখানের ফাঁকটুকু পূরণ হতে পারে না, পারে না কেবলমাত্র সহজতম বিশ্বাসের কাজে লাগিয়ে। এ ধরনের বিশ্বাস আল্লাহকে শুধুমাত্র “মৌলুদপ্রাপ্তির পরিকল্পনায়” আদি ও অন্ত বলে তাকে প্রকাশ করে তাই নয়, সংগে সংগে সমগ্র মহাবিশ্বের আদি ও অন্ত বলে তাকে প্রকাশ করে থাকে। এ বিশ্বাস তাঁকে রবার্ট গ্রাণ্টের মহিমাময় মোনাজাতের ভাষায় আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং বন্ধু হিসাবে প্রকাশ করবে।

সৃষ্টিকর্তা এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে আল্লাহতে খৃষ্টানদের যে বিশ্বাস, তা অযৌক্তিক অথবা আধা যৌক্তিকতাপূর্ণ নয়; অধিকন্তু ব্যাপক অর্থে এ হচ্ছে মহায়ৌক্তিকতাপূর্ণ। মানুষের তৈরী যুক্তিবিদ্যার আওতার অনেক উর্ধ্বে। এক্ষেত্রে যুক্তির আগে বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। কারণ, যে নাকি আল্লাহর কাছে আসে, তাকে অবশ্য বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যারা মনে-প্রাণে তাঁকে খোঁজ করে, তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করে থাকেন।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে মহাবিশ্ব

[আর্ল চেটার্জ রেক্স ।। গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানীঃ বি.এস সি, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়; এম. এস-সি, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের সাবেক লেকচারার। বর্তমানে জর্জ পিয়ারডাইন কলেজের পদার্থ বিদ্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। টেকনিক্যাল গ্রন্থঃ ভেটর অ্যানালাইসিস এর লেখক। আমেরিকার গাণিতিক সমিতি এবং আমেরিকার পদার্থবিদ্যার শিক্ষকদের সমিতি প্রভৃতির সদস্য। ভেটর অ্যানালাইসিসে বিশেষজ্ঞ ॥]

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, বিজ্ঞান চমৎকার কথাবার্তায় পটুব্যক্ত মানুষের মত, যিনি সকল প্রশ্নেরই জবাব জানেন; আসলে বিজ্ঞান হচ্ছে একজন যুবকের মত যে অগণিত প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। সে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে এবং মনে মনে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করে। সে খুব সাবধানী শ্রেণীবিন্যাস করা নোট রাখার চেষ্টা করে। যদি কেউ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হন তাহলে কখনও কোন কিছু সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছেছেন ভেবে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

আবার, এমনও বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, অবরোহী যুক্তিতর্ক প্রণালীতে বিজ্ঞান একটি সরল পন্থায় অগ্রসর হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান হয়তো উর্ধ্বে আরোহণকারী একটি দ্রাক্ষালতার মত, যে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বে আরোহণের চেষ্টা করে চলেছে। বিজ্ঞানের চলার পথ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা, বড় ঘুরানো পের্চানো। যেমন আজ কার্বন ১৪ এর তারিখ, পরীক্ষা করে দেখা হল, যদি বা সংশোধন করা হলো না। কাজেই বিজ্ঞানের গতিপথ সব সময়ই পরিবর্তিত হতে হবে এবং অধিকাংশ সময় পেছনে ফিরে যেয়ে আবার নতুন পথে অগ্রসর হতে হয়।

যে গণিত সম্পর্কে আমার কিছু করার আছে, তা হচ্ছে সার্চলাইটের মত, যার কাজ হচ্ছে পথকে আলোকিত করার চেষ্টা করা। কিন্তু যাতে বিজ্ঞানের নিজস্ব পথের দিকে এ আলো যেয়ে পড়ে, তার জন্য আলোকরশ্মির সব সময় দিক পরিবর্তন করতে হয়। দুই বা ততোধিক পরস্পর বিরোধী থিওরীর মধ্যে এ সম্পর্কে কোনটি গ্রহণ করতে হয়, তাই নিরূপণ করে আমি সেই নীতি ব্যবহার করে থাকি। এ নীতি অনুসারে, যে থিওরী সব ক'টি প্রাসংগিক বিষয় ব্যাখ্যা করে এবং সহজতম উপায়ে ব্যাখ্যা করে— তাই গৃহীত হয়। টলেমীর থিওরী বা পৃথিবী কেন্দ্রীয় সৌরজগৎ সম্পর্কিত থিওরী এবং সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ সম্পর্কিত কোপারনিক্যাল থিওরীর কোনটি যথার্থ তাই নিরূপণের জন্য বহু বছর আগে এই একই নীতি অনুসৃত হতো। টলেমীর থিওরী এতই জড়ানো এবং কোপারনিক্যাল থিওরী থেকে এতই জটিল যে, পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগৎ সম্পর্কিত থিওরী বা চিন্তাধারাকে বাদ দিতে হয়।

কিন্তু যদিও বিজ্ঞানের আওতা সীমাবদ্ধ তবুও এর খিওরী ও সিদ্ধান্তগুলি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এবং মহাবিশ্বের আল্লাহর ক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চের ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন গবেষণা আমার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনিই মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। “কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ” একটা রয়েছে এবং আল্লাহ হচ্ছেন তার সবকিছু পরিচালনার মালিক।

পরস্পর সম্পর্কহীন বলে মনে হয় এমন কিছু প্রপঞ্চ বিদ্যমান আছে, যার একই ব্যাখ্যা রয়েছে, এমন অনেক প্রমাণও আছে। এ প্রমাণ মেলে, দু’টি চার্জ, বা দু’টি চুম্বকীয় মেরুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের ব্যাপারে কোলম্বের আইনে। এর সঙ্গে নিউটনের মধ্যাকর্ষণ বা শক্তি সম্পর্কিত আইনের তুলনা করতে যেয়ে, তিনটি আইনের সাদৃশ্য দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। প্রত্যেকের দু’টি চার্জের দু’টি মেরু শক্তির অথবা জ্যোতিষ পিতৃগুলির শক্তির গুণফলের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তি বিদ্যমান এবং দূরত্বের বর্গের সংগে তা বিপরীতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এতে তারতম্যও রয়েছে। একটি বিষয় হচ্ছে যখন দু’টি চার্জ বা মেরু প্রতিরোধ করে, তখন দু’টি জড়পিণ্ড পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আবার যখন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরংগ আলোর গতিবেগের সমান গতিবেগে ভ্রমণ করে, তখন মধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত আকর্ষণ শক্তিও অসীম গতিবেগে ভ্রমণ করে। কিন্তু এ পার্থক্য এটাই প্রমাণ করে যে, তারা পৃথক বস্তু এবং সে সংগে সম্পূর্ণ বিষয়টি খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করে।

অন্যান্য পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এটি অনেক সময়ই চমৎকার তাৎপর্যের সৃষ্টি করেছে। অনুরূপভাবে “প্যারিট কনজারভেশন প্রিন্সিপল” মনে হয় উদ্দেশ্যের ঐক্যকে নির্দেশ করতে চায়। এ নীতি অনুসারে-উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত নিউক্লিয়াস সমূহের ব্যবস্থা থেকে যেসব ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়, তা সবই সকল নিউক্লিয়াসের চারদিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নিছক কোণ করে নিঃসৃত হয়ে থাকে। তবে দেখা গেছে, তারা একটি বাঞ্ছিত দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, যার সংগে আণবিক ঘূর্ণনের সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার যখন আমরা নিউক্লিনো পর্যবেক্ষণ করি তখন এ পদ্ধতিতে একটি ছেদ আমাদের নজরে পড়ে। এ কিন্তু প্যারিট প্রিন্সিপল পালন করে না। মনে হবে যে, নিউক্লিনো জানে ডান দিক থেকে বাম দিক এবং যে পচন প্রক্রিয়ায় সে অন্যান্য অণুর সাথে জড়িত তাদের মধ্যে সে এ তথ্য সরবরাহ করে। এ সবও আর অনেক দৃষ্টান্ত এ কথাই নির্দেশ করে যে, প্যাগান মতানুসারে বহু আল্লাহর পরিবর্তে সমগ্র মহাবিশ্ব এক আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং আল্লাহই তা নিয়ন্ত্রণ করছেন।

জীববিদ্যাবিদগণও নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থার কতটা সম্পর্ক, সে বিষয়ে আমাদেরকে অনুরূপ কাহিনীই বলবেন। প্রাকৃতিক সকল জিনিসের গঠনের ভিতরে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষতা লক্ষ্য করেন। মানবদেহের রক্তকণিকাগুলি ঠিক যে কাজের জন্য তারা সৃষ্ট, সেই কাজের উপযোগী যথার্থ আকৃতির ও আয়তনের হয়ে থাকে। অন্যান্য দেহযন্ত্র অংশ এবং দেহ কণিকার ক্ষেত্রে এই একই কথা সত্যি বলে প্রযোজ্য। একই রকম ক্রটিহীন

ব্যবস্থা ও সাদৃশ্য দেখার জন্য কীট-পতংগের জগতের মধ্যে অন্যান্য হাজারো রকমের বস্তু থাকতে আমরা যদি কেবল মৌমাছির মৌচাক পর্ববেক্ষণ করি, তাহলেই যথেষ্ট হবে। সারা দুনিয়ায় যে লক্ষকোটি মৌচাক রয়েছে; তার প্রত্যেকটি একই জ্যামিতির পরিমাপে সর্বাপেক্ষা যথার্থতা সহকারে এবং সবচেয়ে যাতে ভাল দক্ষতার পরিচায়ক হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে সৃষ্টি হয়েছে। যদি এ প্রমাণ ও তৎসহ আরও অনেক প্রমাণ একজন সৃষ্টিকর্তার মনীষার পরিচায়ক না হয়, যদি একজন সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনকে নির্দেশ না করে, তাহলে বৈজ্ঞানিক হয়ে আমার যা কিছু দাবী করার আছে সবই সমর্পণ করছি।

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে আল্লাহ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমার যে সিদ্ধান্ত আমি দেখি, তার সংগে পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলির বাণীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। আমি এ পবিত্রবাণী বিশ্বাস করি, এ-ই যা মাত্র তফাৎ। কিন্তু মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং দিক সম্পর্কে বাইবেলে যা কিছু বলা আছে, আমি সবই বিশ্বাস করি। বাইবেল ও বিজ্ঞান একই বিষয় স্বীকার করে। কথা হচ্ছে যে, বিজ্ঞান দ্বারা বাইবেলকে অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে এবং যথোপযুক্ততা সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেক সমালোচকের মতে বাইবেলের কতিপয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক খুঁটিনাটি বিবরণ যেহেতু নির্ভর করা যায় না, কাজেই সৃষ্টি ও স্বর্গীয় দূরদর্শিক সম্পর্কে বাইবেলে যা বলা আছে, তার উপরও নির্ভর করা চলে না। আমিও কিন্তু এসব সমালোচককে আদৌ গুরুত্ব দিতে নারাজ। অধিকন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ঐ সব ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ যে অনির্ভরযোগ্য সে কথা সমালোচক অন্ত্রলোকদেরকে কে বলে দিল? আমাদেরকে তাদের বাচাল উক্তি মানাতে বেয়ে তারা অধিকাংশ সময়ই নিজেদের ভুল কোথায় তা বুঝতে পারে না। মিসরীয়গণ খড় দিয়ে ইট তৈরী করতো বলে বাইবেলে যে কথার উল্লেখ রয়েছে তা ভুল; কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে কোথাও খড়ের ব্যবহার প্রকাশ পায়নি। এখন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করেছেন যে, প্রথমে খড়কে মজ্জাকারে প্রস্তুত করা হয় এবং তার পর কাদামাটির সংগে সে মণ্ড মেশানো হয়, যার ফলে ইট খুব মজবুত হয়। বাইবেলের সমালোচকদের পায়ের নীচের মাটি সরে যেতে পারে, এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্তের মাত্র একটি উল্লেখ করা হলো।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বর্তমানে যে কোন থিওরী দ্বারা বাইবেলের বর্ণনাকে অবজ্ঞা অথবা অস্বীকার করা হয়, তা সব প্রাসংগিক সত্যকে ব্যাখ্যা করে না; আর না হয় তা হয়ে উঠে একেবারে জটিল এবং দুর্বোধ্য। আমার কথা হচ্ছে যে, আমি এখানে উল্লিখিত পুরানো সর্বসংগত নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া শ্রেয় বলে মনে করি। আমি জেনেসিস-এ বর্ণিত সহজ সরল কথাই ভালবাসি ও তাই আমার কাম্য।

ধর্মের বৈধতা

ম্যানব্ব ভাষকাল উইটার জুনিয়র ।। মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট: বি,এ প্রাণিবিদ্যা ইন্সট্রুমেন্ট: এম,ডি,নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুল: মেমোরি কাউন্সেল, রুচেস্টার, মিনেসোটায় ভিন বংসর; এম,এস-সি, ডেভজবিদ্যা, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়; যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর ক্যাপটেন এলসওয়ার্থ বিমান ঘাটি এস,ডি,এলসওয়ার্থ টেনকিশতম টি এ-সি হাসপাতালের মেডিসিনের চীফ ইন্সট্রুমেন্ট মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ ।।

ধর্মের বৈজ্ঞানিক বৈধতার সমস্যাটি খুব সঠিকভাবে এ প্রশ্নের আকারে বলা যেতে পারে : আল্লাহ আছেন কি এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ব্যাপারে তিনি কি আশ্রয়শীল? আমি এ প্রশ্নটি মৌলিক প্রশ্ন বলে বিবেচনা করি—আমাদের অস্তিত্বের জন্য এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ।

যদিও, কেন এক আল্লাহ থাকবেন এবং তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকবে বা থাকা উচিত নয়, সে সম্পর্কে অনেক ক’টি দার্শনিক যুক্তি বিদ্যমান । তাহলেও প্রকৃত প্রত্যবে কেবলমাত্র দু’টি নীতি বিদ্যমান—যাকে অবলম্বন করে এ প্রশ্নটি মৌলিকতার দিকে এগুতে পারে—একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এবং অপরটি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৃতির ।

প্রথমটি সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে : পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সকল জটিলতাসহ সকল প্রকারের আকারসহ, জীবন এবং সর্বোপরি সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ চিন্তা করার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ নিজে এতই জটিল যে, এসব কিছু হঠাৎ করে হওয়াটা খুবই জটিল ব্যাপার । কাজেই এসব কিছুর পেছনে অবশ্য একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মন, একজন সৃষ্টিকর্তা থাকা প্রয়োজন । এক আল্লাহর সেখানে উপস্থিতি অত্যন্ত বাস্তবীয় । যেহেতু মানুষ চার দিকে যা কিছু বিরাজমান তার সবারই শিরোবিন্দু; অতএব তার আল্লাহ তার প্রতি আশ্রয়শীল হবেন এতে আর আশ্চর্য কি! অতএব এক ব্যক্তিগত আল্লাহর অস্তিত্বকে এখানে মেনে নেওয়া হচ্ছে ।

দ্বিতীয় বক্তব্য সম্পর্কে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের কাছে যা বাইবেল নামে অভিহিত, তারই উল্লেখ করা যেতে পারে । আসলে এ হচ্ছে অনেকগুলি লেখার সংকলন অথবা বইয়ের সংকলনও বলা যায় । ইতিপূর্বে যা ‘দি বুকস’ বা ‘দি ক্রিপচার্স’ নামে—অর্থাৎ, পরিকল্পনাকারী বিশেষণ ছাড়া একটি সমষ্টিবাচক নামে পরিচিত ছিল । যাতে করে সাধারণ সৃষ্টি সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হয়ে পৃথকভাবে সর্বোপরি একটি স্থান লাভ করে, তার জন্যই এ নাম । এতে ছয়টিটি বই একত্র করা হয়েছে এবং প্রায় ১৪০০ বছর ধরে অসংখ্য লেখক এ বইগুলি রচনা করেছেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও সবগুলি মিলিয়ে একটি গ্রন্থই রচিত হয়েছে, যার একটি মাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং তিনি হচ্ছেন যীশু । একথা সত্য যে, দি বুকস লিখনে প্রায় ১৪০০ বছর লেগেছে এবং অনেক ব্যক্তি এর

রচনার মূলে ছিলেন— তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে বাস করেছেন এবং একের সঙ্গে অপরের কোন প্রকার পরিচয়ই ছিল না; তথাপি চিন্তাধারায় আমরা দেখেছি কোথাও তাঁদের কোন বিরোধ নেই; তার পরিবর্তে এক আশ্চর্য রকমের ঐক্য তাঁদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। তদুপরি ‘দি বুকস’-এর পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমর্থদের উপযোগী সকল ‘উপাত্ত’ ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা আশ্চর্য রকমের সমর্থন লাভ করেছে। বৈজ্ঞানিক উপাত্তের পক্ষে যতদূর প্রয়োজন, বাইবেল তার জন্য সকল যুগের দুর্গপ্রাচীর বিশেষ। আবার সে বাইবেলই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ কথাই বলেছে যে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আল্লাহ একজন আছেন।

অপরপক্ষে, মানুষ যা বিশ্বাস করে এবং যা সে করে, তা কেন বিশ্বাস করে অনেকাংশে নিরূপণ করা চলে তার নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং তার অভিজ্ঞতা দ্বারা। তার বিশ্বাসকে দু’টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : এক হচ্ছে তথ্যপূর্ণ, অপরটি হচ্ছে “পুঁথিগত”। তার তথ্যপূর্ণ বিশ্বাস মূলতঃ সঠিক কি না, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয়। যা যথার্থই তার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ তথ্যপূর্ণ বিশ্বাসের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি জটিল। যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজ যেহেতু এগুলিকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং যেসব বই সে পড়ে, তাতেও যখন এসবের স্বীকারোক্তি রয়েছে, তখন উভয় কারণে সেও তথ্যপূর্ণ বিশ্বাসকে সত্য বলে মেনে নেয়। এ ছাড়া তার মনে যেওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে যখন সে এগুলি কাজে লাগায়, দেখে— সবই যথার্থই বৈধ বলে প্রমাণিত হচ্ছে, তখন তার আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পুঁথিগত বিশ্বাস, অনেক সময় নিজেরা খুব প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সাধারণতঃ যেভাবে তাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাতে এসব বিশ্বাস বৈধ বলেও প্রমাণিত হয়। তবে বহুবিধ কারণের জন্য সবাই পুঁথিগত বিশ্বাসকে স্বীকার করতে নারাজ। এসবকে সত্য প্রমাণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও প্রয়োজন হয়, তার অভাব থাকে।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর বিশ্বাস, পুঁথিগত বিশ্বাস। একে প্রমাণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে না এবং অনেকে আছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্বীকার করবেন। যদিও উল্লিখিত উভয় প্রচেষ্টাই এক ব্যক্তিগত আল্লাহকেই নির্দেশ করে, তথাপি কোনটিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ কথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ আছেন। কাজেই (১) বিশ্বাস (২) অজ্ঞানবাদ, অথবা (৩) নাস্তিকতা এর কোনটি চূড়ান্ত পর্যায়ে বেয়ে বেছে নিতে হবে, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে, মানুষ যখন গীড়িত অবস্থায় থাকে, তখন তাকে নিয়ে কাজ করে। সে কি রকম এবং সে যে ভাবটি করে, কেন তার এ ভাব— তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। কাজেই কিছু মেডিক্যাল নীতিসমূহের খুব সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, মানুষের আল্লাহতে বিশ্বাস সম্পর্কিত গবেষণায় অনেক মূল্যবান হতে পারে।

দু'টি কারণের উপর নির্ভর করে সকল রোগের কারণ নিরূপণ করতে হয়। একটি হচ্ছে দেহযন্ত্র সম্বন্ধীয় এবং অপরটি মনের বা মানসিক। একটি রোগের মৌলিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মন অনেকখানি রোগ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া এবং মনোভাব ব্যক্ত করে থাকে। মন পরিবর্তন করা খুবই কঠিন ব্যাপার এবং অনেক মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এমন পরিবর্তন করা অতীব অসাধ্য ব্যাপার। যাদের মানসিক অবস্থায় অত্যন্ত সমন্বয় রয়েছে, তাদের মানসিক কাঠামোতে সে সমন্বয় থেকে যায়। স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ স্নায়ুরোগ গ্রস্তই থাকে। মনোচিকিৎসা ভাসাভাসাভাবে এক ব্যক্তির মনের পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে, কিন্তু সাধারণ ভাবেই এর বেশী কিছুই করতে পারে না, ব্যর্থকাম হয়। আর খুব কঠিন মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসা অতি সামান্য, অনেক সময় একেবারে কোন পরিবর্তনই সাধন করতে সক্ষম হয় না। যদিও দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, একনিষ্ঠ মনোচিকিৎসা দ্বারা অত্যধিক বাধ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কিছুটা উন্নতি করা যেতে পারে, কিন্তু তার বাধ্য করার বহু বেশিষ্টা সবসময় থাকবেই। সূচ্যরোগগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের একটি দিক হয়তো বা বুদ্ধি দিয়ে সারান যেতে পারে, কিন্তু তাতে বড় বেশী লাভ হবে না, রোগের আরেকটি দিক হয়ত তখন প্রকাশ পাবে।

বাইবেলে একটা কথা আছে, শিশুর যে পথে চলা উচিত ঠিক সে পথে চলার উপযোগী করে শিককে গড়ে তোলা এবং শিশুর যখন বয়ঃবৃদ্ধি হবে তখনও সে এ পথ থেকে সরবে না। কথাটি যে খুবই সত্য, তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। মানুষের চিন্তাধারা বদলানো খুবই কঠিন কাজ; তাকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়, অনেক সময় সে তার সেই লালন-পালন ও শিক্ষাদানেরই ফল এবং অনেক ক্ষেত্রে সে তারই শিকার হয়ে উঠে। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই সে সকল বিশ্বাস মেনে চলে। যদি তারা নাস্তিক্য সমাজে লালিত-পালিত হয় তাহলে তারা নাস্তিক থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যদি খৃষ্টান করে তাদেরকে মানুষ করা যায়, তাহলে তারা খৃষ্টানই থাকার সম্ভাবনা বেশী।

যেহেতু কাউকে শেখানো হয়েছে যে, বিশেষ কতকগুলি বিশ্বাস তাকে মেনে নিতে হবে এবং যদিও সে মনে করে যে, তার বিশ্বাসই ঠিক—তথাপি সে বিশ্বাসকে যে সব সময়ই ঠিক হতে হবে, তেমন কোন কথা নেই।

মৌলিক প্রতিজ্ঞা হিসাবে একে অবশ্য মেনে নিতে হবে। একভাবে না একভাবে আমাদের সবারই পূর্বসংস্কার রয়েছে (তাই এ প্রতিজ্ঞাটি মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে)।

যদিও আমাদের সামনে যেসব সমস্যা এসে উপনীত হয়, তার প্রতি নির্লিপ্ত মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখা চলে, কিন্তু যখন “ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কোন আল্লাহ আছেন কি?”-এ প্রশ্ন করা হয়, তখন তার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করা অসম্ভব। এ প্রশ্নটি আমাদের সকলকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করে যে, আমরা আমাদের সেই ছেলেবেলা থেকে বিভিন্ভাবে প্রশ্নটি চিন্তা করে আসছি। আমরা কিছুতেই প্রশ্নটি এড়াতে পারি না। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়াও উচিত নয়।

প্রশ্নটি আমাদের মূল অভিভূতের সংশে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কাজেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া অপরিহার্য।

আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, প্রশ্নের জবাব কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের দিকে এক কদম এগিয়ে গেলেই দেওয়া যেতে পারে। অনুমানজনক যুক্তিধর্ম যখন মানুষকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে যে, একজন ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আল্লাহ থাকা উচিত, তারপরই এক ধাপ এগুনো হবে। একবার এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে আল্লাহ নিজেই উক্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত যে অনড় তার বৈধতা বা সত্যতা সম্পর্কে সে ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত আশ্বাস প্রদান করবেন। একে পূর্বসংকার বলে অভিহিত করতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে আমি একে তার চেয়েও অধিক কিছু বলতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহতে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনুমাননির্ভর যুক্তিধর্ম দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তবে কেবলমাত্র অলৌকিক পন্থার এ কথাটি প্রমাণ করা যেতে পারে। আল্লাহতে ইমান, আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের মূলভিত্তি।

“দি বুকস্”-এ ইমান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইমান বা কিছু আশা করা যায় তার সারমর্ম এবং যেসব জিনিস দেখা যায় না তার অভিভূতের প্রমাণ। বিশিষ্ট কানাডীয় চিকিৎসক স্যার উইলিয়াম অলসার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ডে বহুকাল চিকিৎসাকার্যে অতিবাহিত করেন। তিনি ইমানকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, “বিল্ট চলমান শক্তি থাকে আমরা তুলানোও না পারি ওজন করতে আর না পারি সুখে নিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতে।” এ ইমান ছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহতে বিশ্বাস করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

মৃত্তিকার বিশ্বয়

/ ডেনিস সোয়ার্টজেনস্‌বার ।। মৃত্তিকা পদার্থ বিদ্যাবিদ : এম, এস-সি, পি-এইচ, ডি, আইওয়া স্টেট কলেজ । লস এঞ্জেলস-এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী মৃত্তিকা বিজ্ঞানী । বর্তমানে পার্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর । আমেরিকার মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতি, ভূতাত্ত্বিক ইউনিয়ন ও আগয়োনমিতির সদস্য । জমির গঠন ও মৃত্তিকার পানির গতিবিধি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।।

নগরবাসীরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সড়কে তাদের মোটর চালিয়ে যাওয়ার সময় শস্য-শ্যামল ক্ষেত দেখে কত না খুশী হয় । তারা জানে, এ ফসল জন্মে মাটিতে এবং এটুকু জেনেই তারা সন্তুষ্ট, কিন্তু যে মাটিতে ফসল জন্মে তা দেখবার কোন আশ্রয় নেই । অপরপক্ষে, বারা ভাল চাষী, তারা বিভিন্ন প্রকারের এবং গুণের মৃত্তিকার প্রতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকে । যে মৃত্তিকার সঙ্গে তাদের আর এবং জীবিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে পদার্থ সম্পর্কে তাদের সবাই যে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতে পারেন এমন আশা করা যায় না ।

মৃত্তিকা নিজেই রকমারী বিশ্বয়ের একটি জগত এবং কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এ রহস্য উদঘাটিত হতে পারে । পাঠককে এখন আমি সংক্ষিপ্ত ভাষাভাষা যেসব মন্তব্য করছি, সেগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করছি । ভবিষ্যতে আরও গবেষণা ছাড়া তার পক্ষে হয়ত রাসায়নিক পরিভাষায় অংশ অথবা প্রতিটি শব্দগুচ্ছ বোঝা সম্ভব নয় । কিন্তু আমার সঙ্গে একমত হওয়ার জন্য যতটা দরকার, তিনি অবশ্য ততটা বুঝতে পারবেন এবং স্বীকার করবেন যে, মৃত্তিকা বিশ্বয়ের একটি জগত । আর সে সঙ্গে তিনি এ বিশ্বয়ের জগতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত পরিকল্পনা দেখতে পারেন—যে পরিকল্পনার পরিব্যাপ্তি তাকে অবশ্য এ কথাটি চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, এসবের পেছনে একটি মহাপরিকল্পক রয়েছেন ।

বিচূর্ণীভবন-জাত পদার্থ হিসাবে আসুন আমরা একবার মৃত্তিকা পরীক্ষা করে দেখি । ভূ-তাত্ত্বিক বিচূর্ণীভবন-জাত পদার্থকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; যেমন: (১) অবশিষ্ট আবরণ, (২) অবশিষ্ট গুণশিলা বা গোলাকার প্রস্তরখণ্ড এবং (৩) মৃত্তিকা । বিচূর্ণীভবনের সঙ্গে জড়িত বিষটন ও ভাস্কনের ফলে—এসব কিন্তু ভূ-ভাগের উপর প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে মৃত্তিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেই অপর দুটি শ্রেণীর সঙ্গে মৃত্তিকার সুশৃঙ্খল বৈসাদৃশ্য আমাদের নজরে পড়ে । মৃত্তিকা বলতে এখানে আমরা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণকে বুঝি, যে সংমিশ্রণে উদ্ভিদ জন্মায় এবং যেখান থেকে সকল উদ্ভিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে এবং মাটির উপর যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সে সংমিশ্রণ তাদেরকে প্রাকৃতিক অবলম্বনও প্রদান করে ।

আগ্নেয় শিলা (মারাত্মক তাপ সৃষ্টিজাত) বিচূর্ণী কালে, এর দ্রাবক মিশ্রিত পদার্থ যেমন ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম গুরুত্ব অনুপাতে অপসারিত হয় এবং মৃত্তিকা সৃষ্টির জন্য বা মৃত্তিকাংশ সংগঠনের সিলিকন-অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম ও লোহা থেকে যায়। এ ধরনের শিলায় যে ফসফরাস থাকে, তার পরিমাণও তেমন হ্রাস হয় না। অপর পক্ষে, নাইট্রোজেনের পরিমাণ সাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়।

মূল সিলিকেট খনিজ পদার্থের বিচূর্ণনের ফলে কাদামাটির সৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল অঞ্চলে মৃত্তিকার কাদামাটির অংশ সামান্য পরিমাণ অ-সিলিকেটসহ বেশির ভাগেই কোলাসিত সিলিকেট দ্বারা গঠিত। বিদ্যুতীয় অঞ্চলে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রি অক্সাইড ও হাইড্রো-অক্সাইড প্রধান।

কাদামাটির এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বা ধর্ম হচ্ছে, তার ক্যাশন বিনিময় ক্ষমতা (বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া)। এ ধর্মের বদৌলতে কাদামাটির বিনিময়ে বিক্রিয়া দ্বারা দ্রবণীয় কারকসমূহকে ধরে রাখা সম্ভব হয়। ফলে এসব কারক কম থাকলেও তার পরিমাপ একেবারে শূন্যতে যেয়ে পৌঁছায় না। বিনিময়ের মাধ্যমে ধারে রাখা এসব ক্যাশন উদ্ভিদের প্রয়োজনে মৃত্তিকার থাকে।

কাজেই বিচূর্ণীকরণের ফলে উদ্ভিদ গ্রাণ্য দ্রাবক কারকসমূহ নষ্ট হলেও সে সঙ্গে এমন এক অজৈব মেকানিজমের ব্যবস্থা হয়ে যায়, যা সেগুলিকে ধরে রাখে।

স্থানাভাবে এখানে অন্যান্য উদ্ভিদের পুষ্টিকর মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয়। এর পরিবর্তে আসুন আমরা জিজ্ঞাসা করি, একটি মজার প্রশ্ন—ভূ-তাত্ত্বিক কালে সর্বপ্রথম যে উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল, কিভাবে মহাপরিকল্পক সে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন? ধরে নেওয়া যাক, আজকের দিনে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন, উল্লিখিত উদ্ভিদেরও সে খাদ্যেরই প্রয়োজন ছিল, মনে হবে তখন দ্রাবক কারকসমূহ এবং ফসফরাসের পরিমাণ পর্যাপ্তই ছিল। নাইট্রোজেনের ব্যাপারে অবশ্য পরিস্থিতি ছিল অন্য রকম। তুলনামূলকভাবে উদ্ভিদসমূহ বেশী পরিমাণে পোষক গ্রহণ করে এবং মৃত্তিকার অ-জৈবিক পদার্থ ধরে রাখার ক্ষমতা কম ছিল। তাহলে কি করে প্রথম উদ্ভিদসমূহ তাদের নাইট্রোজেন সংগ্রহ করেছিল?

এমন প্রমাণ আছে যে, অপরিবর্তিত আগ্নেয় শিলাগুলি ৮০ পি, পি, এম, পর্যন্ত অ্যামোনিয়াক্যাল নাইট্রোজেন ধরে রাখতে পারে। পূর্ব অক্সিডেটিভ বিক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে এ নাইট্রোজেন হয়তো বা প্রথম উদ্ভিদগুলি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এ সঙ্গে আরো অন্যসব সূত্রও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিদ্যুৎ রয়েছে, আরেকটি সূত্র। অনেক মানুষই বিদ্যুতকে একমাত্র ধ্বংসের একটি মাধ্যম বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা জানি যে, বিদ্যুতের ক্ষরণ, নাইট্রোজেন অক্সাইড সৃষ্টি করে—বৃষ্টি বা তুষারপাতের সাহায্যে নাইট্রোজেন অক্সাইড মৃত্তিকার সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে সহজে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন মিলিত হয়, তার পরিমাণ হবে বছরে আনুমানিক প্রতি একরে পাঁচ পাউণ্ড। এটা ৩০ পাউণ্ড সোডিয়াম নাইট্রেটের সমান (লিয়ন, বাকম্যান,

অ্যাণ্ড ব্রাডী, দি নেচার অ্যাণ্ড প্রোপারটিজ অব সয়েলঃ ৫ম সংস্করণ)। এ একই লেখকগোষ্ঠী উল্লেখ করেছেন যে, ক্রমাগতই জন্যানো ঘাসের মত ফসলের জন্য যেহেতু এ নাইট্রোজেন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। কাজেই একথা মনে করা যুক্তিসংগতই হবে যে, আদিম মৃত্তিকার পদার্থসমূহের সঙ্গে একই পরিমাণ পদার্থের মিলিত হওয়ার ফলে উদ্ভিদের জন্যানোর কাজ শুরু করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

বিদ্যুৎকে চিরস্থায়ীকরণের আরো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বিদ্যুতীয় অঞ্চলে যে নাইট্রোজেন নির্দিষ্ট হয় তা আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিমাণ আধা শুষ্ক অঞ্চলের পরিমাণের চেয়ে বেশী। কাজেই ভৌগোলিক অঞ্চলগুলিকে মহাপরিকল্পক দ্বারা তাদের প্রয়োজন মোতাবেক সবকিছু দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়ে থাকে।

মহাপরিকল্পকের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এইমাত্র মৃত্তিকা-উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনা হলো তাকে কি প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে মেনে নেওয়া যায়? সাধারণভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর যতটা সম্পর্ক তা বাদ দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব দান সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি মাত্র সংজ্ঞা দিতে বিজ্ঞানীরা যে সাধারণভাবেই একমত হবেন, এ খুবই সন্দেহের ব্যাপার। তবে তারা অধিকাংশই টার্নারের সংগে এ বিষয়ে একমত হবেন (‘সয়েল’ এর সম্পাদকীয়, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) যে, ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে, প্রকৃতির সাধারণ শ্রেণীভুক্ত (অভ্যুপরি আইন বলে অভিহিত) সমূহের আবিষ্কার করা। যুক্তিবিদ্যার দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্যে একজন বৈজ্ঞানিক যিনি এরূপ আইনাবলী সন্ধান করেন, তার পক্ষে এগুলি বিদ্যমান আছে এসব বিশ্বাস করা একান্ত প্রয়োজন এবং বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা ধারা ইতিমধ্যেই যে সকল আইন প্রয়োগ করা হয়ে গেছে তাদের উপস্থিতিতে এসব আইনের অস্তিত্বকে স্বীকার করা অসম্ভব। স্বাধীনভাবে জ্ঞানার আগ্রহ নিয়ে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কেন এসব আইন বিদ্যমান এবং কেন মৃত্তিকা-উদ্ভিদ এবং অসংখ্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যেসব আইন রয়েছে তা সবই এমনি কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যমান; তাহলে তা যুক্তিবিদ্যার দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এ পর্যায়ে এসে এ কথা মনে নেওয়া হচ্ছে যে, আমরা বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রান্তদেশের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। কিভাবে আমরা এ নমুনা বা ক্রমের একটা ব্যাখ্যা হাজির করতে পারি? মৌলিক দিক থেকে পর্যালোচনা করলে মনে হবে, এর মাত্র দু’টি বিকল্প রয়েছে। একটি হতে পারে যে, প্রথমে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সৃষ্টি, যে ক্রমোন্নতি হচ্ছে তারই নির্দেশ মোতাবেক এ সমুদয় ক্রম প্রকৃতিতে বিরাজমান—সমুদয় সুশৃঙ্খলার উপস্থিতি এ ধারণাকে মেনে নেওয়া। কিন্তু সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় যে, এমন অনুমিতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বোন্ট্যম্যানের তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় আইন এ অনুমতিকে একেবারে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে আর সে সংগে বৈজ্ঞানিকরাও তাঁর উক্তিকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই এ প্রবন্ধকার

দ্বিতীয় বিকল্পকেই গ্রহণ করেছেন, যা অভ্যন্তর সহজ এবং তা হচ্ছে যে, প্রকৃতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাই, আসলে সে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ স্বীকারোক্তিই হচ্ছে অবশ্য এক বিশ্বজগতের অতীত মনীষার অস্তিত্বকেই মেনে নেওয়া গ্রন্থের থেকে বাহ্যে। কিন্তু তা হলেও বিশ্বশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে আপনা আপনি শৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছে এমন আশ্বাস করে সত্ত্বাতি লাভের চেয়ে আমি এ মনীষার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাই মনে হয়, ইতিপূর্বে উল্লিখিত মৃত্তিকা-উদ্ভিদ পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রকৃতিতে পরিকল্পনার পরিচায়ক।

এ প্রবন্ধকার স্বীকার করেন যে, কোন প্রকার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা—যারা নাকি সৃষ্টিতে বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় বা উদ্দেশ্যের উপস্থিতির ঘোর বিরোধী, তাদের নিকট সমালোচনার কারণ হবে। আজকের অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাদের শিক্ষার বদৌলতে শুধুমাত্র যান্ত্রিকভাষ্যময় ঐতিহ্য অনুসরণে যে অভ্যন্তর তাই নয়, সে সংগে অনেক ক্ষেত্রে তারা বৈজ্ঞানিক বিপরীতগুলিকে বাস্তবতারই প্রতিশব্দ হিসাবে মনে করেন; এ কথাটি যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে এদের সমালোচনার কারণ বুঝতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হবে না। এ শেষের বিষয়টির ব্যাপারে কোনাট (সার্নেল এন্ড কমন্সেল) অকাট্যভাবে লিখেছেন। যদি কেউ বৈজ্ঞানিক বিপরীতগুলি অভ্যন্তর সাময়িক বলে উল্লেখ করে, তাহলে তা কোনোটের মতে খুবই যুক্তিযুক্ত হবে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, যান্ত্রিকভাষ্যময় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উদ্দেশ্যবাদ বিরুদ্ধ অনুশাসন-বাক্যগুলিকে অবজ্ঞা করা খুব যারায়ক রকমের কিছু একটা সিবিদ্ধ কাজ বলে মনে হয় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, “সমগ্র বিশ্ব জুড়ে” উদ্দেশ্যবাদ, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা রয়েছে। কেউ এ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আসমান আর জমিন সর্বত্র এ পরিকল্পনা বিরাজমান।

নব্বনাভিন্নাম শস্যে ঢাকা ক্ষেত্রে দেখে তার প্রশংসা করা এবং সে সঙ্গে রক্তার পাশে খামার বাড়ীতে কৃষকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যেমন অবৌদ্ধিক, তেমনি সব দেখে বিন্মিত হয়ে এক মহাপরিকল্পককে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অবৌদ্ধিক।

মৃত্তিকা উদ্ভিদ আর একটি ৪০০০ বছরের পুরানো ব্যাখ্যা

[লেটোর জন বিমারম্যান ।। মৃত্তিকা বিজ্ঞানবিদ ও উদ্ভিদ শরীরবৃত্তবিদ : এম, এস-সি, পি- এইচ, ডি, পার্দু বিশ্ববিদ্যালয়; যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্তিকা সংরক্ষণ সার্ভিসে বিশেষজ্ঞ; গোল্ডেন কলেজের কৃষি ও গণিতের অধ্যাপক । মার্কিন বনবিদ্যা সমিতি, আমেরিকার মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতি এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আমেরিকান সমিতির সদস্য । রাসায়নিক মৃত্তিকা সম্পর্কিত গবেষণা এবং মৃত্তিকার উর্বরতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ।]

আমরা সবাই কখনো কখনো দার্শনিক হয়ে যাই ।

আমরা কসলের ক্ষেতের ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে চলি, আমাদের সজী বাগান ও ছোট ছোট ভূ-খণ্ডে জন্মানো রকমারী সজীর সজর মুখনেড়ে প্রত্যক্ষ করি, ফলে বাগান আর দ্রাক্ষাকূঞ্জে পাকা কল দেখি, শরৎকালের বনের শোভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করি, তাদের উজ্জ্বল আশ্রিতালা বর্ণের সমারোহ দেখি আর সে সংগে নিজের মনের জিজ্ঞাসা করি: কি করে এসব কিছু জন্মান্ত করলো?

যীও তার অনুচরগণকে এক উপলক্ষে বলেছিলেন, “গমের একটি কণা মাটিতে পড়ে মরে না যাওয়া পর্যন্ত তা কল ধরতে পারে না ।”

যীও ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কৃষিজীবী । তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রকৃতির উদ্ভূত বিষয়সমূহের একটির উল্লেখ করেন এবং তা হচ্ছে, জীবন সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ লাভের আগে গমের একটি কণার মৃত্যু ঘটেছে ।

জন্ম এবং মৃত্যু এ উভয়ই সংগটনের জন্য পানির উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদের পোষকের অবশ্য একটা উৎস থাকতে হবে । রাসায়নিক মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থগুলিই হচ্ছে এ নতুন প্রাণের পোষকের জন্য কাঁচামাল, আর উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনে এ কাঁচামালকে কাজে লাগানো হয় । উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য শক্তি সরবরাহ করতে সে সংগে আলো ও শক্তি সরবরাহ হওয়া উচিত ।

সকল প্রাণই তার বেঁচে থাকার জন্য পানির উপর নির্ভরশীল । পারসন তার “কমজারভিং আমেরিকার রিসোর্সেস” এ বলেছেন, “পানি হচ্ছে মাটির জীবন ধারণের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় রক্ত রূপ ।” প্রতিক্রিয়াকারী অথবা উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে পানির সংগে জীবন ও তার বৃদ্ধির সংগে সম্পর্কিত অধিকাংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান । যাতে করে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে, তার জন্য পানি দ্রাবক হিসাবে কাজ করে । অধিকাংশ স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি রয়েছে এবং আবর্তের সাহায্যে পানি জমির উপরকার উদ্ভিদের জন্যে ও উদ্ভিদের সবুজ বর্ণ অক্লুপ রাখার জন্য জমিতে সরবরাহ হয়ে থাকে । সে আবর্তের শেষ নেই, অনাদিকাল পর্যন্ত তা কাজ করে যাবে ।

সকল জড় পদার্থ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। সাধারণত উদ্ভিদ জন্মাবার জন্য প্রয়োজনীয়তা মৌলিক পদার্থের উৎস বাতাস আর মৃত্তিকার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কোথা থেকে এ মৃত্তিকা এলো? কি করে মৃত্তিকা উদ্ভিদের পোষক সরবরাহের কাজ অব্যাহত রেখেছে?

উর্বর মৃত্তিকায় খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে; কিন্তু এছাড়াও মৃত্তিকার সংগে থাকে জৈবিক পদার্থ—যা প্রথমে অন্যান্য উদ্ভিদের জীবন এবং অন্যান্য পতুর জীবন থেকেই এসেছে। বিয়োজনের প্রক্রিয়ায় এ জৈবিক পদার্থ থাকলেও তথাপি এ বিয়োজনের প্রক্রিয়ার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে উদ্ভিদ ও পতুর প্রাণ বিদ্যমান থাকে। এসব মৌলিক পদার্থ আর তার সংগে পানি ও বাতাস মিলিত হয়ে জীবন দানকারী প্রক্রিয়াবলীর যথার্থভাবে কাজ করাকে সম্ভবপর করে। কেবলমাত্র শিলার বিচূর্ণীভবনের ফলে সৃষ্ট শিলার ক্ষুদ্রকণাসমূহ দিয়ে যদি মৃত্তিকা গড়ে উঠে, তবে তা হবে বন্ধ্যা। উৎপাদনকারী মৃত্তিকা প্রাণবন্ত মৃত্তিকা বিশেষ। উদ্ভিদ প্রাণীর অগণিত অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি অবয়বী দ্বারা মৃত্তিকার জৈবিক অংশের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত গঠিত হতে পারে এবং এ অবয়বীয় সংখ্যা এক গ্রাম মৃত্তিকায় বেশ কয়েক মহাপয় সংখ্যক হতে পারে। কাজেই মৃত্তিকা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে জলবায়ুর বিভিন্ন করণের প্রক্রিয়ায় এবং কালের আবর্তে প্রাণিজাত বাস্তব একত্রিত হওয়ার ফলে গড়ে উঠে।

কি কি ভাবে এবং কখনও এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল? আবার শুধু যে আলো, রাসায়নিক পদার্থ, বাতাস আর পানি পেলেই উদ্ভিদ জন্মাতো পারে, তা নয়। বীজের মধ্যে উদ্ভিদ জন্মানোর একটি ক্ষমতা রয়েছে, যে ক্ষমতা উপযুক্ত পরিবেশে সক্রিয় হয়ে উঠে। অনেক জটিল কিন্তু সুসামঞ্জস্য বিক্রিয়ার কাজ শুরু করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব এমনি ক্ষুদ্র দু'টি কোষের মিলন হিসাবে বীজ তার জীবন শুরু করে। আবার এর প্রত্যেকটি কোষ মৌলিক পদার্থ ও প্রক্রিয়াবলীর জটিলতা ভিন্ন কিছুই নয়। তারপর পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে বীজ নতুন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ বীজ যখন শস্যকণা হয় তখন তা থেকে শস্যের উদ্ভিদ গজায়। এ বীজ যখন অ্যাকর্ষণ হয় তখন তা থেকে বিরাটকায় এক বৃক্ষ জন্ম লাভ করে। এ বীজ যখন মরে যায়, তা সে বড় বা ছোট হোক না কেন, তা থেকে সেই এক রকম উদ্ভিদ জন্মায়। যদিও সে উদ্ভিদের বীজ থেকে পরবর্তী উদ্ভিদ জন্ম নিল—সে-দু'য়ের মধ্যে তেমন হুবহু মিল নেই তথাপি একটি সাদৃশ্য আছে, যা অতি সহজেই নজরে পড়ে। বিভিন্ন জন্ম প্রক্রিয়া যখন মানুষ অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে, তখন তার নজরে পড়ে, সেখানে আছে ক্রম, আছে সেখানে সৌন্দর্য, একটা সুসমন্বয়, আছে নির্ভরশীলতা।

সেখানে পরিবর্তনেরও একটা সম্ভাবনা আছে। দোআঁশল বীজের শস্যের সবই আছে, কিন্তু সে উন্মুক্ত পর্যাগিত বীজের শস্যকে সক্রিয় দিয়েছে। বীজ ঠিকমত পছন্দ করে নিলে একই ক্ষেতে পাশাপাশি ছোট আর বড় একই শস্যের গাছ জন্মানো যেতে পারে। বপনকাল থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়ের যে ব্যবধান, তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে যেতে

পারে। ফসল জন্মানোর সময়ের হিসাব ধরে তারই উপর ভিত্তি করে বীজ নির্বাচন করলেই হলো। উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধকারী নয়। পদের উদ্ভিদ জন্মানোর চেষ্টা করল হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সে চেষ্টা সফলও হয়েছে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ কাটলার-এর 'অ্যাক্সনিমি' হ্যাডবুক দেখুন)। মৌলিক উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। প্রতি একরে তিনশ বুশেল শস্য ফলানোর রেকর্ডই এ কথার জাজ্জল্যমান প্রমাণ।

সব উঁচু উদ্ভিদের যদিও একটি অপরটি থেকে পৃথক, তবুও অনেক বিষয়ে মিল আছে। চিত্রসংশ্লেষ রয়েছে, যা দিয়ে দেখা যায় কার্বন অক্সাইড ও পানি বিদ্যমান থেকে আলোর উপস্থিতিতে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। বৃক্ষের শিকড়, কাণ্ড, পাতা এবং ফুলে একটি সাদৃশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এবং সবই একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। আবার বাইরের দিক থেকে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়েও সাদৃশ্য বিদ্যমান, যেমন : আলোর দিকে ঝুঁকে পড়া, আলো বা অক্সিজেনের অভাবে উদ্ভিদের মৃত্যু ইত্যাদি যা সব উদ্ভিদেই দেখা যায়।

প্রজননবিদ্যার আইনাবলী ও উদ্ভিদের জন্মের প্রক্রিয়াবলী নির্দিষ্ট করে, কে তা চালু করে দিয়েছিল? এ প্রশ্নের সংগে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আরেকটি প্রশ্ন এসে পড়ে, তা হচ্ছে : প্রথম উদ্ভিদসমূহ কোথা থেকে এল? অথবা অন্যভাবে বলা যায়, যেহেতু দৈবক্রমে সৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই অযৌক্তিক, কাজেই বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তার কথা আপনা থেকেই আসে এবং তাই প্রশ্ন হয় : প্রথম উদ্ভিদসমূহ কে সৃষ্টি করলো?

এ প্রশ্নের জবাবে কমপক্ষে তিন হাজার বছর আগে লেখা একটি বই থেকে আমি উদ্ধৃতি দিতে চাই, আবার সে উদ্ধৃতি হচ্ছে চার হাজার বছরের পুরানো ঘটনাবলী সম্পর্কে বলতে যেয়ে বর্ণিত। আমি অতি পুরানো জোব লিখিত বাইবেলের ৩৮ পরিচ্ছেদের কথা বলছি। এক শক্তিশালী মহাকাব্যের বীরত্বব্যঞ্জক সুরে মহাপ্রভু আল্লাহ যেন জোবকে একথা বলেছেন :

“আমি যখন এ পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করি, তখন তুমি কোথায় ছিলে?.. যখন সকালের নক্ষত্রগুলি [ফেরেশতাগণ] মিলিত হয়ে গান গেয়েছিল এবং আল্লাহর সকল দূত। [ফেরেশতাগণ] আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল? অথবা সমুদ্র যখন মহানির্ঘোষে এগিয়ে আসছিলো, তখন কে সেই অগ্রগতির পথের দরজার আগল বন্ধ করে দিয়েছিলো—আমি তার উপর পোশাক হিসাবে মেঘের সৃষ্টি করলাম, প্রতিবন্ধক স্থাপন করলাম এবং দরজাগুলি নির্দিষ্ট করে দিলাম, আর বললাম, এ পর্যন্ত তুমি আসতে পারবে, কিন্তু তার আগে নয় এবং এখানে এসে তোমার গর্বোন্মত্ত তরংগ থেমে পড়বে। কোন পথে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আসে? পৃথিবীর উপর পুবালা হাওয়া কিসে ছড়িয়ে দেয়? কে বজ্রলোকের পথকে ভাগ করে দিয়েছে, একে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টির কারণ হওয়ার জন্য, অনুর্বর পতিত জমিকে সস্তুষ্ট করার জন্য এবং ক্ষুদ্রতম গুলোর ছোট ফুলের কুঁড়ি ফোটার জন্য? তুমি কি গ্লিয়াডস (টারাস নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রসমূহ)-কে বাঁধতে পার, অথবা অরিয়ন (বিশুবরেখার উপরিভাগের একটি বৃহৎনক্ষত্রপুঞ্জ)-কে বিচ্ছিন্ন

করতে পার? মাজারোথ (দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ)- কে কি তুমি তাদের ঋতুতে নিজের আকাশে আনতে পার, অথবা তুমি কি আরকটরাসকে তার পুত্রদেরসহ (“দি বিয়ার” সাতটি অভি উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ) পরিচালনা করতে পার? তুমি কি আকাশের অভিন্নালগুলি জান? পার কি তুমি পৃথিবীর উপর এমনি একটি রাজ্য স্থাপন করতে? দাঁড়কাকের বাচ্চাগুলি যখন আগ্নাহর কাছে করিয়াদ করে, তখন কে দাঁড়কাককে খাবার দিয়ে থাকে?”

মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষা সম্পর্কে (এবং এর মধ্যে স্বভাবতঃই উদ্ভিদ জগতও রয়েছে) যে জবাব দেওয়া হয়েছে, তাই হচ্ছে আমারও জবাব। প্রকৃতির সবকিছুই আগ্নাহ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাকে সর্বক্ষণ সংরক্ষণ করছেন।

আমি যখন প্রকৃতির মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ আমার গবেষণাকে ও পর্যবেক্ষণকে জোরদার করি, আগ্নাহতে আমার বিশ্বাসও সংগে সংগে ততই বৃদ্ধি পায় এবং বিষয়ে আর প্রশংসা গদগদচিন্তে তাই প্রতিদিন আমি তাঁর কাছে মাথা নত করি।

মানুষ নিজেই সাক্ষ্য

রিবার্ট হার্টস ক্যানেরন ।। পাপিতিক : এম, এ, পি-এইচ, ডি, কর্বেল বিশ্ববিদ্যালয় ।
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিতে রিসার্চম্যান;
অতঃপর ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনলজীর কর্মচারী । গত বিশ বছর ধরে
মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণিতের অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব নিউমারিক্যাল
অ্যানালাইসিস্ ও ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ডস-এর পরিদর্শনকারী পাপিতিক ।
আমেরিকার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক তাঁকে সভেনেট প্রাইজ দেওয়া হয় ।
পাপিতিক বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে পর্যাবৃত্ত অপেক্ষক, অপেক্ষক শূন্য
সমাকলন, মাপ ষিওরীর বিশেষজ্ঞ ।।

এ সিমপোজিয়ামের সম্পাদক যে প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেছেন, আমার কাছে সে
প্রশ্নটিই হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ।

“আল্লাহ আছেন কি?” এ প্রশ্নটির সংগে চিন্তার, চিন্তা করার ক্ষমতার প্রশ্নও এসে
যায়—সামর্থ্যদানকারী ‘শক্তি’ ছাড়া আমি অনুরূপ ক্ষমতার কথা চিন্তাই করতে পারি না ।

আমি যন্ত্রের মত স্বয়ং চালিত নই । আমার চিন্তাধারা একটি আধুনিক যান্ত্রিক
মস্তিষ্কের ক্ষমতার বাইরে অনেক দূরে যেকোন কিছু পেরিয়ে যেতে পারে । যুক্তিবিদ্যাকে
একটা পদ্ধতির মধ্যে যতটা সংক্ষিপ্ত করে জানা যায়, তাত্ত্বে সংক্ষিপ্ত যুক্তিবিদ্যাকে
স্বয়ংচল রূপ দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু চিন্তা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস । কারণ চিন্তার সঙ্গে
নিয়মাবলী অনুসরণের অথবা তা অগ্রাহ্য করে ফেলে দেওয়ার সম্পর্ক রয়েছে । চিন্তার
সংগে রয়েছে যৌক্তিকতার সম্পর্ক বিচার করার ক্ষমতা, সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার
একটি সিমকনীর আনন্দ-স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা আর সে সংগে রসজ্ঞানের একটা সম্পর্ক ।

পাপিতিক একটি যুক্তিকে প্রমাণ বলে মেনে নেওয়া চলে কি না, যুক্তিবিদ্যা সেটার
নিষ্পত্তি করতে পারে, কিন্তু চিন্তা প্রথমেই যুক্তির অবতারণা করতে পারে । চিন্তাই পারে
নতুন নতুন পাপিতিক ধারণা আবিষ্কার করতে, পারে নব নব সম্পদ আবিষ্কার করতে ।
চিন্তা আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-সমালোচনায় নিযুক্ত হতে পারে, কিন্তু একটি মেশিন দাবা
খেলায় জন্ম তৈরী করা হলেও তার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভুলে মুচকি হাসি হাসতে অথবা
নিজের ভুলে দুঃখ প্রকাশ করতে পারা সম্ভব নয় । মেকানিজম বা যান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের
বাইরে তা রয়েছে, চিন্তা তারই সংগে জড়িত । আমার কাছে চিন্তা এই-ই নির্দেশ করে
যে, যান্ত্রিকতাময় দর্শন মানুষ বা মানব জাতিকে বোঝানোর পক্ষে আদৌ যথোপযুক্ত
নয় । আমি চিন্তা করতে পারি ।

আমিও আল্লাহতে বিশ্বাস করি । কারণ আল্লাহ আমার মধ্যে অনুভূতি দিয়ে
দিয়েছেন । এ কথা বলে আমি কি আমার বক্তব্য সবটাই নষ্ট করে দিলাম । আমি কি

স্বীকার করছি যে, আমার বিশ্বাসের মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই, যেহেতু আমি বিশ্বাস না করতে ভয় পাই, তাই বিশ্বাস করি, অথবা বিশ্বাস থেকে আমি আবেগময় একটা প্রেরণা পাই, তাই বিশ্বাস করি; না, তা নয়; আমাদের এই যে আবেগময় স্বভাব এটাই সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের স্বাক্ষর। আবেগ অনুভূতি না থাকলে আমাদের জীবন কি রকম হত? যৌনকামনা ও তার সংগে যে আবেগ জড়িত যদি তা অবর্তমান থাকত, তাহলে কতদিন জাতি বেঁচে থাকতে পারত? শিশুদের এত ভালবাসা সম্বন্ধে কেন তাদের নশ্বরতা সবচেয়ে কম।

আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি। কারণ আল্লাহ আমাকে নৈতিক বিচার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। জাতির অন্তরে ভালমন্দ সম্পর্কে একটা অনুভূতি আছে। সি, এস, লিউয়িস অত্যন্ত স্পষ্ট করে তার 'দি কেস ফর খ্রিস্টিয়ানিটি'তে এ অনুভূতিকে ব্যাঙ করেছেন। যদিও আমাদের চিন্তাধারার তফাৎ থাকতে পারে, তবু আমরা আমাদের কাছে যা 'সঠিক' বলে বিবেচিত হয় তার জন্য তর্ক করি এবং মনে করি যে, সত্যতা ও ন্যায়বিচার আমাদের বিপক্ষে অর্থহীন শব্দ নয়।

আল্লাহতে আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিদীপ্ত ইচ্ছাশক্তি—মানবীয় ইচ্ছাশক্তির উপর ভিত্তি করেও প্রতিষ্ঠিত। এ ইচ্ছাশক্তি “একটি সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার ব্যাপারে জড়িত সামগ্রিক সচেতন প্রক্রিয়াকে” বোঝায়। মনোবিজ্ঞানীগণ সাধারণভাবে মনের ক্ষমতাকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন, ইচ্ছাশক্তি তারই একটি (অপর দু'টি হচ্ছে, বোধশক্তি ও সহানুভূতি)। আমি ইচ্ছা করি, কিছু পাবার বাসনা করি, আমার বুদ্ধি এ সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রদান করে এবং আমার ইচ্ছাশক্তি তাকে কার্যকরী করে।

এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ সুস্পষ্টভাবে দুনিয়ার অন্য সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মমতে মানুষকে আল্লাহর ছায়া বলে যে উল্লেখ রয়েছে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তারই নামান্তর; “তাই আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিজস্ব ছায়া অনুযায়ী সৃষ্টি করলেন” এবং জোর করে বলার জন্য একই কথা পুনরাবৃত্তি করে হলো : আল্লাহর ছায়ায় সৃষ্টি করলেন আল্লাহ মানুষকে (জেনেসিস ১ঃ ৭২)। সাধু পল মার্স্ পবর্তের উপর থেকে এথেন্সবাসীগণকে যখন বীভূত বাণী শুনাচ্ছিলেন তখন নিঃসন্দেহে তার মনে একই চিন্তা বিদ্যমান ছিল এবং গ্রীক কবিরা যে মানুষকে “আল্লাহর সন্তান” বলে উল্লেখ করেছেন তিনিও সে উক্তিকে মেনে নিয়েছিলেন সত্য বলে। অথবা সঠিকভাবে আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, পল খোদায়ী সম্পর্ক মেনে নিয়েছিলেন। (অ্যাক্টস ১৭ঃ ২৮০২৯)

এ প্রসংগে আমি বাইবেলের উল্লেখ না করে পারছি না। বাইবেল মূলতঃ নির্ভরশীলতার সংগে যা কিছু বর্ণনা করেছে বলে আমি মনে করি, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি কেবলমাত্র তার সংগে সম্মত হতে পারে। শিশু তার বিশ্বাস এবং কি করে তার জন্ম হলো, সে বিষয়ে কিছু জানে না। প্রাণ বয়সে উপনীত হয়ে প্রত্যাশে ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সে তথ্যাদি লাভ করে—তাকে যা কিছু বলা হয় এবং জীবন ও তার কার্যাবলী সম্পর্কে সে যা কিছু দেখতে পায় আর পর্যবেক্ষণ করে তাই

তাকে সকল তথ্য যোগায়। ঠিক একইভাবে খোদায়ী শক্তির দ্বারা সর্বপ্রথম মানুষের সৃষ্টির কথা আল্লাহ নিজে তাঁর দুনিয়ার মানুষের কাছে তাঁর নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করেন। মানুষের নিজের ক্রিয়াকর্ষ তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষ এখানে মানবীয় গুণ আর বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে, যে বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা আমি ইতিপূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি এবং যা পবিত্র বাইবেলের নির্ভরযোগ্য উক্তি—আল্লাহর মানুষকে সৃষ্টির, আল্লাহর ছায়ায় মানুষকে সৃষ্টির—কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করে অথবা যা বাইবেলের উক্তি ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

পরীক্ষাকালে বৈজ্ঞানিকেরা ‘মহান’ হয়ে উঠেন। গবেষণার ফলে যে সব সাক্ষ্য আমি পেয়েছি তাই আমাকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়েছে; এ অবশ্য এমন একটি বিষয় যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু আমার কাছে এ হচ্ছে গাণিতিক, যে কোন সম্পদের চেয়ে অধিক যুক্তিসংগত, বিশ্বাসযোগ্য এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য। বত্রিশ বছর আগে, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শয্যাবিশিষ্ট শয়নাগারে এ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আনন্দের সংগে যে আল্লাহর অস্তিত্ব আমি লক্ষ্য করেছি, তিনি আমাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নয়া উদ্দেশ্য, নতুন নতুন আনন্দ (এবং নতুন নতুন দুঃখ)-ও দিয়েছেন এবং তিনি আমার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার সাবেক অবস্থায়, অজ্ঞ অবস্থায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে, আমার সকল মর্যাদা, বৈজ্ঞানিক সকল জ্ঞান এক কথায় আমার জাগতিক সবকিছু আমি তাঁর জন্য বিসর্জন দিতে সম্মত।

সে একান্ত ব্যক্তিগত, আন্তরিকতাপূর্ণ, পবিত্র পরীক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা বা নির্বাহক। তিনিই ছিলেন যিনি শাস্ত্রত সত্যকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এক সময় জোর দিয়ে বলেছিলেন, “আমি অগ্রসর হচ্ছি এবং আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি।” (জন ১৪ঃ৪২)

হ্যাঁ, আল্লাহ নিশ্চয় আছেন।

গবেষণাগারের শিক্ষা

[এলমার তব্শিট মরার। রিসার্চ কেমিষ্ট: বি, এস-সি, আইওয়া ষ্টেট কলেজ, এন, এস-সি, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের রিসার্চ কেমিষ্ট, সংশ্লেষিক পরিষ্কারক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। নির্দিষ্ট বা সাধারণ যুক্তিকার জন্য উন্নততর পরিকারকের উদ্দেশ্যে গবেষণার রত ॥]

একজন রাসায়নিক হিসাবে আমি এক ব্যক্তিগত আত্মমুতে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, “আসমানী মনীষা” একজন রয়েছেন, তিনি এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর আমার কাছে এ “আসমানী মনীষা” এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আত্মমু এক।

একেবারে মৈবের কলে মহাবিশ্বের এসব নিয়ম-শৃংখলা ও ক্রম সৃষ্টি হয়েছে— আমার পক্ষে একথা চিন্তা করাও অসম্ভব। এক কথায়, এতে বৈষম্যের সংখ্যা খুবই বেশী। আইন-শৃংখলা এবং বুদ্ধিমত্তা হাত ধরাধরি করে চলে।

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে, আত্মমু তাঁর সৃষ্ট দুনিয়ার উপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণাধিকারী। প্রাকৃতিক সকল নিয়ম যাতে নির্দিষ্ট আর চিরস্থায়ী হয়, তিনি সে বিষয়ে নজর রাখেন। আমি যখন গবেষণাগারে প্রবেশ করি, তখন আমি জানি, আজকে বা নাকি সত্যবলে প্রমাণিত হলে, আগামীকাল সে আইন সত্যই প্রমাণিত হবে এবং তার পরের দিন এবং তারপর যতদিন এ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকবে ততদিনই সত্য বলে প্রমাণিত হবে, অন্যথায় গবেষণাগারে আমার জীবন হতো একের পর আরেকটি সংকটে সংকটময়—অনিশ্চয়তা আর সন্দেহের জীবন, কলে সকল বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সক্রিয়ভাবে নিষ্ফল, বহুতঃপক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমি গবেষণাগারে যেয়ে পরিষ্কার পানি তর্জি একধারে ঠোঁটবিশিষ্ট একটি কাঁচের পাত্রে যতক্ষণ পানি কোটে ততক্ষণ তাকে উত্তপ্ত করতে পারি। আমি জানি, বায়ুবীয় মণ্ডলের চাপ যতক্ষণ পারদের ৭৬০ এম, এম, থাকবে ততক্ষণ ১০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় (সেণ্টিগ্রেডে) পানি বাষ্প হতে আরম্ভ করবে, এর জন্য আমার তাপমান বহুর প্রয়োজন হবে না।

যদি চাপের পরিমাণ ৭৫০ এম, এম-এর কম হয় তাহলে পানি কণিকাভলিকে বিচ্ছিন্ন করে বাষ্পে পরিণত করার জন্য কম উত্তাপের প্রয়োজন হবে। আবার যদি বায়ুর চাপ ৭৬০ এম, এম, অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে স্ফুটনাকে সমানুপাতিক হারে ১০০ ডিগ্রীর চেয়ে বেশী হবে। এ পরীক্ষাটি আমি বারবার করতে পারি এবং যতক্ষণ আমি জানতে পারবো, বায়ুবীয় মণ্ডলের চাপের পরিমাণ কি, ততক্ষণ আমার পক্ষে স্ফুটনাকেও কত ডিগ্রী হবে, তা বলে দেওয়া এতটুকু মুশকিল হবে না।

এ চাপ-তাপ সম্পর্কে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে কাজে লাগিয়ে রসায়নবিদ নিয়মিতভাবে কব্ধি-বিশ্বকর কাজ করে চলেছেন। খুব কম ব্যয়বীর মতলের চাপের মধ্যে পাতনক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি ফলের আরক, পানি শূন্য আলো, শুকনো দুধ ইত্যাদি পেতে পারেন। এ অতি সাধারণ মৌলিক সম্পর্কে কাজে না লাগালে, আমাদের গ্যাসোলিন ও তৈল শিল্পের অস্তিত্ব কোন রকমে টিকতো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এক্ষত প্রভাবে আমাদের গবেষণার অনেকখানি এবং আমাদের অনেক শিল্প প্রক্রিয়া এককভাবে এ চাপ-তাপ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্ক অত্যন্ত চিরস্থায়ী সম্পর্ক এবং দৈবক্রমে এমনি সম্পর্ক গড়ে উঠার সম্ভাবনা খুব কমই আছে।

মৌলিক পদার্থ সমূহের পর্যায়বৃত্ত-সারণীয় ও দৈবক্রমে সংঘটিত হওয়ার মত বিষয় নয়। এ হচ্ছে মহাবিশ্বে আইন ও শৃংখলার চমৎকারভাবে বর্ণিত একটি পরিকল্পনা। নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে, অনবদ্য শৃংখলার পন্থায়, এ সারণীতে সকল মৌলিক পদার্থের একটি সমাবেশ। কিস্তাবে একই রকম ধর্মের (গুণাবলীর বা বৈশিষ্ট্যের) পর্যায়বৃত্ত ঘটে তাই এই সারণীতে লিপিবদ্ধ আছে। পর্যায়বৃত্ত-সারণীতে আণবিক সংখ্যানুক্রমে সকল মৌলিক পদার্থকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। আণবিক সংখ্যা হচ্ছে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা। এভাবে একটি সহজ পদার্থ হাইড্রোজেনে এর সংখ্যা হচ্ছে এক, কার্বন এর নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন রয়েছে, হিলিয়ামে দুই; লিথিয়ামে তিন ইত্যাদি।

ক্রমবর্ধমান আণবিক ওজনের ক্রম অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজানো হয়েছে। মৌলিক পদার্থের ধর্মও একই রকম পরিবর্তনের পর্যায়বৃত্তের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এক সারিতে উপর্যুক্তভাবে সাজানো সব মৌলিক পদার্থই একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের মধ্যগারে তার উপরের ও নীচের মৌলিক পদার্থ থেকে পৃথক থাকে। অর্থাৎ একটি পদার্থে একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন হবে বেশী আর অপরটিতে হবে কম। আবার শর্তভাবে সাজানো সব মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, বাইরের শেল-এ ইলেকট্রনের সংখ্যা এক। লম্বা সারিতে মৌলিক পদার্থের একই ধর্ম বিদ্যমান বলেই ইলেকট্রনিক বহিরাবৃত্তিতে এ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, ক্যালশিয়াম ও স্ট্রোন্টিয়াম প্রত্যেকের বাইরের শেল-এ একটি করে ইলেকট্রন থাকায় সবাইকে একই ধর্ম বিশিষ্ট মৌলিক পদার্থের গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। আবার হিলিয়াম, আরগন, নিয়ন, ক্রিপটন, জেনন এবং র্যাডন সবাই বাইরের শেল স্থিতিশীল বহিরাবৃত্তিতে ভরা, কাজেই অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সংগে এদের মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা প্রকাশ পায় না। এ ছয়টি হচ্ছে জড় গ্যাস।

ঠিক একইভাবে, একই রকম ধর্ম একই রকম ইলেকট্রনিক বহিরাবৃত্তি বিশিষ্ট পদার্থগুলিকে পরিচিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এ সুন্দর ব্যবস্থা আকস্মিকতার ফল হিসাবে গড়ে উঠার সম্ভাবনা খুবই কম। ধরা যাক, একটা বিরাটকার চুপুতে আমার পক্ষে অগণিত সংখ্যক প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন এবং আণবিক গু (বা পরমাণুগুলিকে

এক সংশে ধরে রাখে) সব একত্র করে উত্তত্ত করা সম্ভব হলো। এমনি উত্তত্ত করে আমার পক্ষে, পর্যাবৃত্ত-সারগীতে ঠিক যেমন আছে তার শৃংখলার সংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ একশ' অথবা তার কাছাকাছি সংখ্যক নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ধর্মসম্পন্ন পৃথক পৃথক মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করার পথে অসুবিধাটা কি? আমি সে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারি—ময়লা, পানি, চিনি, আপেল, চেঁচী এবং নীচ সৃষ্টি করতে অসুবিধা কোথায়?

আমি যদি কখনও গহন বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা কাঁকা জারগার, কুল আর মনোরম গুলোদ্যানের ঢাকা আরাবদান্নক একটি কুটীর দেখতে পেতাম তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম যে, শিচরুই কেউ ঐ কুটীর তৈরী করেছে এবং ববজ্জে কুলগাহ আর গুলোদ্যান লাগিয়েছে। ওসব আপনা থেকেই হয়েছে, ওকথা বলা আমার কাছে উপহাসের মত লাগে। এ একই কথাই মৌলিক পদার্থ, পর্যাবৃত্ত-সারগী এবং প্রকৃতির সকল আইন সম্পর্কে প্রযোজ্য। অতি সাধারণ বুদ্ধিবিদ্যা এ কথাই বলবে যে, কেউ এসব কিছু পরিকল্পনা করেছে, সৃষ্টি করেছে এবং তাদের কার্যের করেছে, আমার কাছে এ পরিকল্পক ও সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ।

অধিকন্তু আমি বহুদিন আগে এ আদ্যাককে বাইবেলে উল্লিখিত আদ্যাহর সঙ্গে এক করে কেলেছি। প্রথমে বাইবেলে কতকগুলি বিবয়ের বৈজ্ঞানিক বার্থার্থতা নিয়ে কতিপয় অসুবিধার সম্বন্ধীয় আমাকে হতে হয়। কিন্তু পরে সেন্স অসুবিধা অপসারিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথমে ম্যাথুর (৫ : ১৩-তে) বীত যে উক্তি করেছেন, আমি তার বার্থার্থতা নিয়ে পবেষণা করেছিলাম। বীত বলেছেন, “তোমরা হচ্ছে পৃথিবীর লবণ। কিন্তু লবণ যদি তার হাদ হারিয়ে কেলে তাহলে কি দিয়ে এ লবণাক্ত হবে? কাজেই এ তখন আর কোনই কাজে লাগবে না, অধিকন্তু একে কেলে মিটে হবে বাইরে এবং যাতে মানুষ একে পদনসিত করতে পারে তার জন্য।” লুক-এর একই বকব প্রোক (১৪ : ৩৪, ৩৫)-এর অনুসরণ বিজ্ঞানি সৃষ্টি করে, “লবণ খুব ভাল। কিন্তু যদি লবণ তার হাদ হারিয়ে কেলে তাহলে কোথায় তাকে জমাবো হবে? এ তো তখন স্রমির জন্যেও দরকারী হবে না, না প্রয়োজন হবে সারের পানায়—মানুষ তখন একে দূরে কেলে দেবে।”

রাসায়নবিদ হিসাবে আমি বুদ্ধির অবতারণা করলাম যে, লবণ হচ্ছে খুব স্থিতিশীল রাসায়নিক বস্তু, সোডিয়াম ও ক্লোরাইড এখানে ওখানে থাকলে লবণ কখনও খারাপ হয়ে যায় না। সম্ভাব্য দুটি উপায়ে লবণ তার হাদ হারতে পারে : (১) এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রবেশ করে পরিণত হতে পারে এবং এমনভাবে আর তখন সোডিয়াম ক্লোরাইড নাও থাকতে পারে অথবা (২) অন্যান্য দ্রবের সঙ্গে লবণ এমনভাবে মিশ্রিত হতে পারে যে, তার কলে লবণের হাদ তা একেবারে চাপা পড়ে যেতে পারে। আমি প্রথম উপায়টি এ বুদ্ধিতে বাদ দিলাম যে, বীত অত্যন্ত ভাল শিক্ষক ছিলেন। সাধারণ মানুষ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া কিছুতেই বুঝতে পারবে না, বীত তাদেরকে কখনও সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা শোনাতে পারেন না। তাহলে লবণের জন্য অধিকতর জিনিসের

মিশ্রণই টিকলো। সবসময়ই আমার সুন্দর টেবিল সস্টের কথা মনে পড়ছিল তাই অন্য লবণের কথা একবারও উঁকি দেয়নি। সামান্য গবেষণার ফলে এর জবাব পাওয়া গেছে।

পবিত্র ভূমির অধিবাসীদের কাছ থেকে কর হিসাবে রোমানগণ লবণ গ্রহণ করতেন এবং সংগ্রহ করতেন। অবশ্যই প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের লবণ উত্তোলনের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল, মরুণ সাগর বা লবণ সাগর। রোমানদের করভার এতই বেশী ছিল যে, জনসাধারণ লবণের সংগে বালি অথবা অন্যান্য মাটি জাতীয় বস্তু (প্রথমে যে লবণ পাওয়া যেত, তা কোন সময়ই আমাদের টেবিল সস্টের মত বিশুদ্ধ ছিল না) মেশাতেন। সরকার সেই সংগৃহীত লবণকে পানি ভর্তি বিরাটকায় পাড়ে বা পুকুরে ছড়িয়ে দিতেন, তারপর লবণ মিশ্রিত পানি বা ব্রাইন বের করে নিয়ে তা থেকে লবণ তৈরী করতেন। বাকী যা পড়ে থাকতো, তা সবই হচ্ছে অন্য মাটি জাতীয় উপাদান। যথার্থই লবণ তার স্বাধ হারিয়ে কেলতো, কারণ তা তখন আর লবণ থাকতো না। তখন তা পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়ার উপযোগী হতো।

একমাত্র এই এক উপায়ে লবণ তার স্বাধ হারাতে পারে যে তাই নয়, বাষ্পীয়ভবনের ফলে মরুণ সাগরের উপরিতাগে পানিতে রাসায়নিক লবণ পাওয়া যায়। এ লবণের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩১ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড। ১৩ ভাগ ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড এবং ৪৮ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড। তার উপর অন্যান্য অবিশুদ্ধ বস্তু ছিল। ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে হাইড্রোস কপিক (বাতাস থেকে পানি নিয়ে যাওয়ার শক্তি) এবং তা অবশ্যই সোডিয়াম ক্লোরাইডকে গলিয়ে দেবে। এর ফলে একটা তিক্ত মিশ্রণের সৃষ্টি হবে। যেসব বাড়িতে মাটির মেঝে সেখানে এ লবণ মণ্ডলিত করার রেওয়ারাজ চলে আসছিল। কিছু দিনের মধ্যে মাটির সংস্পর্শে রাখা লবণ নষ্ট হয়ে যেতো। মাটির আর্দ্রতাই এ নষ্ট হওয়ার কারণ। মাটিতে লবণ থাকায় বেহেতু তা জমির উর্বরা শক্তির পক্ষে ক্ষতিকর, কাজেই কোন মানুষই এ মাটিকে বা মাটি মিশ্রিত লবণকে তাদের ক্ষেতে কেলতো না, কেলতো রাস্তায় যেখানে মানুষ তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতো।

এ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত যেভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক এমনভাবে অতিশয় ছোটখাট বিষয়েও বাইবেল যে নির্ভুল বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। তারপর বিষয়টির বৃহত্তর দিকে আসা যাক। দেখা বাবে এ বাইবেল মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের ঠিক ঠিক তথ্য পরিবেশন করেছে। মহাবিশ্ব কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে এবং কিতাবে এর সংরক্ষণ হচ্ছে, বাইবেল তারই নির্ভুল খবর আমায় দিয়েছে। আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্রে এমন কিছুই পাইনি যা বাইবেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি স্থির নিশ্চিত যে, জেনেসিস- এ উল্লিখিত আল্লাহ, জাতির উৎপত্তি এবং বিশ্বের জন্য অব্যর্থ পুণ্যানুপুণ্যভাবে বিশ্বকে পরিচালনের একমাত্র জবাব।

বিজ্ঞান ও ঈমানের মধ্যে ঐক্য

[ওয়েনি ইউ অল্ট ।। ডু-রসায়নবিদ : বি, এ, হইটন কলেজ, এস, এস-সি, পি-এইচ, ডি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক । প্যালিসাদেশ এন, ওয়াই-এর জিও কেমিক্যাল শ্যাবরেটরীর সাবেক রিসার্চ ফেলো, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কে জড়িত, বর্তমানে জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টোরিয়ান ইউ, এস, গভর্নমেন্টের সঙ্গে যুক্ত । মার্কিন ভূ-প্রাকৃতিক ইউনিয়ন ও আমেরিকার ভূ-তাত্ত্বিক সমিতির সদস্য । ভূ-রসায়নবিদ্যা সম্পর্কিত পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ ।।

আত্মাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা না করে, মানুষ আত্মাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারে না । ব্যক্তিগত আত্মাহতে বিশ্বাস স্থাপনের কলে মানুষের সমগোত্রীয় লোকদের প্রতি আচরণে পরিবর্তন আসবে, জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে এবং সে সঙ্গে জড় বিশ্বজগতের পিছনে যে উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে, সে বিষয়ে তার মনোভাব বা ধারণা পাটে যাবে ।

আত্মাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা বলতে বোঝায়, আত্মাহতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি প্রকল্পকে সত্য বলে ধরে নিয়ে পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে । এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিধি বেড়ে বাড়ে, জ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে । তবুও এক ব্যক্তিগত আত্মাহতে ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসকে বলা চলে না যে, এ বিশ্বাস বিজ্ঞানভিত্তিক । তার কারণ, আমরা জানি আত্মাহ পদার্থশক্তি নন । তাছাড়া তিনি সীমাবদ্ধ নন যে, সীমাবদ্ধ মন ও অভিজ্ঞতা তাঁকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে । অপরপক্ষে, একজনের আত্মাহতে যে বিশ্বাস তা প্রধানতঃ ‘ঈমানের ব্যাপার’ যদিও তার এ ঈমান “প্রথম কারণ”-এর পরোক্ষ সাক্ষ্য থেকে বৈজ্ঞানিক সমর্থন লাভ করে এবং সম্ভবতঃ “অবিচ্ছিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণ” থেকেও সমর্থন লাভ করে থাকে ।

মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যারা বিচরণ করেন তাদের কারও কাছেই ঈমান কোন একটা অপরিচিত বিষয় নয়, তবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদেরকে অবশ্য বিশেষভাবে এ ঈমানকে কাজে লাগাতে হবে । মানুষের জীবন যেমন খুব দীর্ঘকালের নয়, তেমনি একই মানুষের পক্ষে নিজেরই প্রত্যেকটি বিষয় পরীক্ষা করা সম্ভব নয় । পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীগণ যে সকল তথ্য প্রকাশ করে গেছেন, যেসব আবিষ্কার করে গেছেন, তাই বোঝার জন্য মানুষ যতখানি গবেষণা করার দরকার আছে; ঠিক ততটা অত্যন্ত সাধারণ ধরনের গবেষণা চালায় মাত্র । কাজেই বলা যায়, আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই অতীত অভিজ্ঞতায় লিখিত ইতিহাস থেকে নেওয়া । এই যেমন, খুব কম বিজ্ঞানীই আছেন যারা আলোর গতিবেগ মেপে দেখেছেন, কিন্তু তা হলেও বিশ্বজ্ঞানীভাবে এ কথাটি মেনে নেওয়া হয়েছে যে, আলোর গতিবেগ অপরিবর্তিত থাকে । তেমনি বৈজ্ঞানিকগণ

যে সকল প্রকল্প নিয়ে গবেষণা করেন তার কার্যকারিতার বৈধতা আগে থেকেই মেনে নেন। এর প্রকল্প হচ্ছে, তারা যে সকল বিষয় দেখেননি তারই আদর্শ। কেউ প্রোটিন বা পরমাণু দেখেনি, তবে এদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। পরমাণুর বোর মডেলটি, আণবিক আচার-আচরণ সম্পর্কে আশ্চর্য করার জন্য একান্ত সহজতম পদ্ধতিতে অঙ্কিত একটি চিত্র। আমাদের সুদূর আকাশের ছায়াপথ আর মহা-দূরের নক্ষত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান তা পরোক্ষ-প্রমাণ ও গবেষণার ফল। এ খুবই সত্য যে, সাধারণভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কাছে এরূপ জ্ঞানের অনেকখানি বিশ্বাসের বদৌলতেই মেনে নিতে হয়। এ কিন্তু অস্বাভাবিক নয়— অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে যে বিশ্বাস পরীক্ষিত হতে পারে এবং এভাবে আরও জোরদার হয়, এ তেমনি বিশ্বাস।

অনুরূপভাবে আমরা যদি বিশ্বাসকে প্রয়োগ করি, তাহলে তা আমাদের আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে। আগের যুগের মানুষের কাছে আল্লাহ একটি লিখিত দলিল বা প্রগতিশীল প্রত্যাদেশ উনিয়ছেন। এ দলিলে, আল্লাহকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে মানুষের অবস্থা, তার কি প্রয়োজন এবং কি করে পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে তাই বর্ণিত হয়েছে। সময় আর শূন্যলোক অর্থাৎ, ইতিহাস ও ভূগোলের সীমারেখার মধ্যে এ বাইবেলকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক দিক থেকেই বাইবেল এক অতুলনীয় বই এবং অনেক ক্ষেত্রে একে পরীক্ষা করারও সুযোগ রয়েছে। এতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছে, এটা কম উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। এতে অনেক অংশ আছে, যা নাকি আমাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে বোধগম্য হয় না, তথাপি ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক যে সমস্ত তথ্য এতে পরিবেশিত হয়েছে, তার কোন একটি খুঁটিনাটি তথ্যের ক্ষেত্রে বাইবেল ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি। অনেক ধর্মসামাজিক সমালোচনা বাইবেলের করা হয়েছে, কিন্তু যে মহত্ব বাইবেল দাবী করে তার তুলনায় উক্ত সমালোচনা কিছুই নয়। যদি কেউ সময় নিয়ে এসব সমালোচনা বিশ্লেষণ করে তাহলে সহজেই ধরা পড়বে যে, ইতিহাসও আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রমবর্ধিত তথ্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সেসব সমালোচনাকে অসার বলে প্রমাণ করেছে এবং আরও প্রমাণ করেছে যে, ওসব সমালোচনা অজ্ঞতা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝবার ক্ষমতার অভাব থেকেই উদ্ভূত। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যে অংশ পরীক্ষা সাপেক্ষ, এসব এলাকা (ভবিষ্যদ্বাণী, ইতিহাস, ভূগোল) তারই অন্তর্ভুক্ত এবং পরীক্ষা সাপেক্ষ। একজনের অস্তিত্বের ব্যাপারে ঈমান যেমন প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক অঙ্গ তেমনি মানুষের পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও দর্শনের জন্য আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা অপরিহার্য। মানুষের অভিজ্ঞতার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যদিও সংজ্ঞা দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, তবুও সেগুলি গুরুত্বের দিক থেকে কোন কারণেই উপেক্ষণীয় নয়। বহু সহস্র যুক্তিবাদী, প্রসিদ্ধ এবং লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সচেতন ব্যক্তির সম্পর্ক আছে বলে স্বীকার করেছেন। ব্যক্তিগত আরাধনার একটা ক্ষমতা (আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের) রয়েছে। এই

মানুষেরাই তাঁদের নিজেদের তথা মানবজাতির উর্ধ্বে অবস্থিত ইমান দ্বারা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, আবেগানুভূতির ও আধ্যাত্মিক কুখা নিবৃত্ত করেছেন।

পদার্থিক প্রকৃতির পিছনে একটি উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে, এ কথাটি যুক্তিসঙ্গতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহকে সবকিছুর পরিকল্পক ও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়ার ফলে, উৎপত্তি, পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে এবং সে সঙ্গে যেকোন প্রক্রিয়া যা নাকি ঘটেছে বলে পরিজ্ঞাত, তাকে মেনে নেওয়া হয়।

যান্ত্রিকতা সম্পর্কিত মতবাদ, সর্বপ্রথম উৎপত্তি সম্পর্কে বিবেচনা করে না, আর পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য দৈবের হাতকে স্বীকার করে না। দৈবক্রমকে দর্পনের পূর্ণতা হিসাবে আল্লাহর বিকল্পরূপে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু অ-খৃষ্টান অথবা অ-খরীয় মতবাদ, আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণাকে, দৈবক্রম অপেক্ষা অধিকতর সত্যোত্তর মনে করে এবং মহাবিশ্বের যাবতীয় শৃংখলা, অত্যন্ত সুশৃংখল আল্লাহর কথায় নির্দেশ করে। এসব উদ্দেশ্যহীন অনিয়ন্ত্রিত দৈবঘটনাবলী কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

অতিপ্রাকৃত সম্পর্কিত ধারণা অনেক বিজ্ঞানীর মনকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। কিন্তু সে সঙ্গে তাদেরই অনেকে “স্বাভাবিক” বলে কতকগুলি প্রপঞ্চকে অভিহিত করে থাকেন, যদিও এ সকল প্রপঞ্চ সম্পর্কে তাদের সুশৃষ্ট কোন ধারণাই নেই। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, এদেরকে ‘স্বাভাবিক’ বলে উল্লেখ করার অর্থই হচ্ছে এগুলির পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে—কিন্তু তাই বলে এতে প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করা হয় না। কাজেই কোন একটি সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রপঞ্চকে মেনে নেওয়া; তা সে স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক হোক না কেন— তা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইমানের ব্যাপার।

বৈজ্ঞানিক অবিজ্ঞতার কথায় কিরে যেয়ে আমরা এ প্রশ্ন করতে পারি, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গতিসম্পন্ন যে রাডার রয়েছে, তা আবিষ্কার ও নির্মাণের মূলে কোন পরিকল্পনা ছিল, না সেটি আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অত্যন্ত জটিল ক্ষুদ্রাকৃতি কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট বাদুর, হ্যাঁ বাদুর সৃষ্টির পিছনে কি কোন পরিকল্পনা আছে? না, অনাগত সকল যুগে একই রকম বাদুর জন্মাবার অধিকারী। এ বাদুর নামীয় জীবটি আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? বৈজ্ঞানিক মন সব কিছুতেই একটা কারণের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। কাজেই তার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এ সবার পিছনে অনুমিতি হিসাবে এক মহান মনের—যা সর্বশক্তিমান, সর্বদ্র বিরাজমান এবং সর্বদর্শী তাঁকে মেনে নেবে, স্বীকার করে নেবে—সকল সৃষ্টিও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাকৃতি অংশের জন্য তিনি আগ্রহশীল।

আরও অনেক প্রপঞ্চ রয়েছে, যার উল্লেখ করা হয়নি এবং একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই এসব প্রপঞ্চের একটা অর্থ হতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে অসীম মহাশূন্য, অগণিত নক্ষত্র আর ছায়াপথ, সর্বশেষ মৌলিক কণিকায় পদার্থকে বিভক্ত করণের ক্ষমতা, আমাদের জানা সকল জীবিত পদার্থের মধ্যে সমরূপিতা এবং প্রতিটি আবুলের ছাপে

হাতদ্বয় প্রতিটি বেগলের পাতা এবং প্রত্যেকটি তুষার-কণার সাদৃশ্যতা। এ ছাড়া সৃষ্ট অন্যান্য সকল জীবের চেয়ে মানুষ মনে ও দক্ষতায় যে শ্রেষ্ঠ— সে শ্রেষ্ঠত্বের বিশাল জগত রয়েছে।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহতে বিশ্বাস অনেকাংশে ঈমানের উপর নির্ভর করে। এই ঈমান যে কোন মানুষের কাছেই অপরিচিত নয়। সকল শ্রেণীর বিশ্বাসই অন্ধ বিশ্বাস নয়, অধিকন্তু তা হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্বাস। আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে, অনেকের কাছেই যে সাক্ষ্য বিদ্যমান, তা হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। জড় বিজ্ঞানের কতিপয় প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ তারা এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

জ্ঞানের আকাংক্ষা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কেন ও কি করে— এ প্রশ্ন করাই হচ্ছে মনের বৈশিষ্ট্যের অংশ, মনের বিশেষ গুণ। একবার যদি কোন বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে এ বিশ্বাস যে কোন দিকে গবেষণার ফল হিসাবে পড়ে উঠতে পারে।

চিকিৎসা পদ্ধতিতে আল্লাহ

[পল আর্নেস্ট অ্যাডলড ।। চিকিৎসক ও সার্জন : এম, এস-সি, এম, ডি, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়; চায়না ইন্সটিটিউট মিশনের সাবেক মেডিক্যাল মিশনারী এবং সাংহাই, চীনের সেন্ট জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমীর অ্যাসোসিয়েট, রিটায়ার্ড লেঃ কর্ণেল, মেডিক্যাল কোর, ইউ, এস আর্মি, চিকাগো মিশনারী মেডিক্যাল অফিসের ডিরেকটর, আমেরিকান কলেজ অব সার্জেনের ফেলো এবং মেডিক্যাল মিশন সম্পর্কিত অনেক কয়টি বইয়ের প্রণেতা । জেনারেল সার্জারী, মিশনারী মেডিসিন, বিশেষ করে মিশনারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ।।]

এ আলোচনার মূল প্রশ্নের জবাব দান প্রসঙ্গে আমি একথাই বলতে চাই যে, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর অস্তিত্ব ও যথার্থতা স্বীকার করি। আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস শুধু যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাই নয়, অধিকন্তু এ বিশ্বাস দ্বারা আমি যা সত্য বলে স্বীকার করেছি, চিকিৎসা পদ্ধতি তাকে আরও ভালভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমি যখন মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তখন আমি আঘাতের ফলে দেহ-কলাসমূহের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন ঘটে তৎসম্পর্কিত একটি মৌলিক জড়বাদী ধারণা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেহ-কলার বিভিন্ন অংশ নিয়ে গবেষণার দ্বারা আমার এ ধারণা জন্মায় যে, যে সকল অনুকূল প্রভাবের ফলে টীসু বা দেহ-কলা বর্ধিত হয়, তাই এ দেহ-কলার সন্তোষজনক মেরামতের কাজ সম্পাদন করছে। তারপর যখন আমি হাসপাতালে শিক্ষানবীশ চিকিৎসক হিসাবে আমার নতুন জীবন শুরু করলাম, তখন আমি একটি বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, এই যে ক্ষতি-পূরণে নিজস্ব প্রক্রিয়া, তাতে যদি ঠিক ঠিক মত ঔষধ দেওয়া হয়, তাহলে সে সেই অনুযায়ী নিশ্চয় ক্ষতি-পূরণ করে যাবে, কোন ক্ষত থাকলে তাকে অবশ্য সারিয়ে তুলবে। কিন্তু সে সঙ্গে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে আমার মেডিক্যাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংগে शामिल করতে একবারেই ভুলে গেছি এবং সে হচ্ছে, সকল মৌলিক পদার্থের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ, আল্লাহ।

শিক্ষানবীশ থাকা কালে আমার এক রোগী আসেন, কোমরের নীচের হাড় ভেঙে। তিনি ছিলেন সত্তর বছর বয়সের এক দাদীমা। আমি অনেক ক’টি এক্স-রে গ্রেট পরীক্ষা করে দেখলাম, তাঁর দেহ-কলাগুলি খুব ভালভাবে তাঁকে নিরোগ করার জন্য সাড়া দিচ্ছে। যথার্থই এত তাড়াতাড়ি তাঁকে আরোগ্যলাভ করতে দেখে আমি ধন্যবাদ জানালাম। তিনি তখন চাকা ওয়ালা চেয়ার থেকে ক্রাচ ব্যবহারের পর্যায়ে এসে গেছেন। তার রোগের তদারককারী ভারপ্রাপ্ত সার্জন আমাকে বললেন যে, তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, বুড়ী গুরুমহিলা নিশ্চিতভাবে দ্রুত আরোগ্যলাভ করছেন, কাজেই চকিৎস ঘটনার মধ্যে তাকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করতে হবে।

সেদিন ছিল রবিবার। নিয়মিত সাপ্তাহিক পরিদর্শনে তাঁর মেয়ে এলে আমি জানালাম, তিনি যেন আগামীকাল এসে তাঁর মাকে নিয়ে যান। কারণস্বরূপ আরও বললাম যে, এখন আর কোন আশংকা নেই, উনি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন। মেয়েটি তার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাকে কোন কথাই বলল না। মায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য চলে গেল। সে ফিরে এসে বলল যে, সে তার স্বামীর সংগে আলাপ করেছে এবং তারা স্বামী-স্ত্রী স্থির করেছে যে, তাদের বাড়ীতে বুড়ী ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। কোন বুড়ো মানুষের বাড়ীতে নিঃসন্দেহে তাঁকে সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর, আমাকে বুড়ী ভদ্রমহিলার শয্যার পাশে ডাকা হল। আমি যেয়ে দেখলাম তার সাধারণ শারীরিক অবনতি ঘটছে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি মারা গেলেন। কোমরের হাড় ভাংগার জন্য নয়, মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হলো। অবশ্য জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, তাঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা নিষ্ফল হলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই কসুর করিনি।

তাঁর কোমরের ভাঙ্গা হাড় কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই জোড়া লেগেছিল। কিন্তু তার ভাংগা হৃদয় কোনক্রমেই জোড়া লাগেনি। তাঁর অবস্থার পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে আমরা যে ভিটামিন, খনিজ পদার্থ প্রয়োগ করেছিলাম, তার ভাঙ্গা অংশটি স্থিতিশীল করে রেখেছিলাম, তার সব কিছুতেই অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করলেও তিনি আরোগ্য লাভ করলেন না। আরও নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তাঁর ভাংগা হাড়ের দু'টি প্রান্ত জোড়া লেগেছিল, তাঁর কোমরের হাড় শক্ত হয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি আরোগ্য লাভ করেন নি কেন? তাঁর আরোগ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন ছিল তা ভিটামিন নয়, তার ভাংগা জোড়ানও নয়। তাঁর প্রয়োজন ছিল আশার, সে আশা যখন চলে গেল, তখন আরোগ্য লাভের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

আমি একজন অকপট খৃষ্টান হিসাবে যেমন আল্লাহকে সকল আশার মূল উৎস বলে জানি; যদি উক্ত বুড়ী ভদ্রমহিলা ঠিক তেমনটি জানতে পারতেন তাহলে এমন অবস্থা তাঁর হত না, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল বলেই ঘটনাটি আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। বিষয়টি আমার মনের গভীরে নাড়া দিয়েছিল। মেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসাবে সবকিছুর স্ট্রিক্টরূপে আমার আল্লাহতে গভীর বিশ্বাস ছিল, যে করেই হোক না কেন, যদিও মেডিক্যাল তথ্যাবলীর সংগে আমার আল্লাহতে যে বিশ্বাস রয়েছে তার কোন সম্পর্ক নেই তবুও আমি মেডিক্যাল তথ্যাবলীকে তার নিজস্ব গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম।

তা সত্ত্বেও, এ পারম্পরিক পৃথকীকরণকে কি যুক্তিসঙ্গত বলা চলে? এ ক্ষেত্রে আমার যে রোগীকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তাঁর সাধারণ শরীরে সারা দুনিয়ার শক্তি সঞ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মন বা আত্মাকে হারিয়ে এবং বিশেষভাবে বলতে

গেলে আত্মাহ যে আশা থাকে তাই হারিয়ে (কারণ নিশ্চিত করে বলা চলে যে, মানুষের সঙ্গে যতটা তার সম্পর্ক, সে তার মেয়ের সঙ্গে ততটাই একান্তভাবে জড়িত ছিল) জীবনের পরিবর্তে মরণ লাভ করেছিল। এ কথাই বীভ বলেছেন, “মানুষ যদি নিজের আত্মাকে হারিয়ে কেলে আর সারা পৃথিবী তার বিনিময়ে লাভ করে তাহলে কি লাভ হবে?”

আমার সংগে সংগে এ প্রতীতি জন্মাল যে, চিকিৎসাপদ্ধতি ও অস্ত্রোপচারে আমার যে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তারই সংগে আত্মাহতে আমার যে বিশ্বাস, তার প্রয়োগ করে আমাকে একাধারে দেহ ও মন দুইয়ের রোগ নিরাময় করতে হবে। আমার বিশ্বাস, এ উপায়েই আমি আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করতাম, আমার রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য যে চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রয়োজন—এ ব্যবস্থাই হচ্ছে সেই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। তদুপরি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি, প্রচলিত চিকিৎসা দর্শনের সকল প্রয়োজন মিটে থাকে।

সম্প্রতি চিকিৎসা-পদ্ধতি মেডিসিন বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক মৌলিকতা সংযুক্ত করার যে গুরুত্ব দেখা দিয়েছে প্রকৃত প্রস্তাবে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার সংগে মিলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ আজ একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের আমেরিকার বড় বড় নগরীতে যে সকল রোগ হয়, তার শতকরা ৮০ ভাগ মনস্তাত্ত্বিক কারণে ঘটে থাকে; আবার তার শতকরা ৫০ ভাগ রোগের ফলে মানব দেহযন্ত্রে কোন প্রকারেই বিঘ্ন দেখা দেয় না। এ প্রসঙ্গে একথা অবশ্য উল্লেখ করতে হয় যে, মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিজড়িত এসব রোগ বা তার কোন উপসর্গই কাল্পনিক নয়। এসব রোগের কারণও যে কাল্পনিক তা নয়, অধিকন্তু চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত ডাক্তারগণ সাধারণতঃ অসুদৃষ্টিকে একটু যুক্তিসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করলেই সহজে রোগের কারণ নিরূপণ করতে পারেন।

তথাকথিত এই যে স্নায়ুরোগ, আসলে তার মৌলিক কারণ কি? মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে রয়েছে— অপরাধ, প্রতিহিংসা, (ক্ষমা না করার প্রকৃতি) ভয়, উৎকর্ষা, হতাশা, সিদ্ধান্তের অভাব, সন্দেহ, ঈর্ষা, বার্ষপনতা ও বিরক্তি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে, মনোচিকিৎসাবিজ্ঞানী আবেগের বিশৃংখলতা সম্পর্কিত রোগ নিরূপণে যদিও ঠিক অগ্রসর হন, কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে তারা বেশ উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম হন। তার কারণ হচ্ছে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাওয়ার সময় তারা আত্মাহতে বিশ্বাসের ব্যাপারটি একেবারে বাদ দিয়ে থাকেন।

অধিকন্তু হৃদয়াবেগে এসব বিশৃংখলা, রোগ সৃষ্টির জন্য এসব কারণ কি? বাইবেলে আত্মাহ আমাদেরকে যেসব বিষয় থেকে উদ্ধার করার জন্য এসেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এগুলি কি সে রোগ?

আল্লাহ্‌ বহুদিন আগে থেকেই আমাদের মনের জন্য কিসের প্রয়োজন তা জানতেন এবং এজন্য তিনি তার সঠিক আরোগ্যের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানীশপ যে কারণে আমাদের স্বাস্থ্যটি কিছুতেই সার্বতে পারেন না সে কারণরূপী তালার সমুদয় জটিলতা তিনি আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর আলমের মধ্যে আমাদের জন্য সে তালার চাবিটি দিয়েছেন। নির্ভুলভাবে এ চাবি সে তালার লাগে এবং তাতে করে স্বাস্থ্যের দরজা আমাদের সামনে খুলে যায়। তালার ভিতরকার প্রতিটি চেহারার সংগে চাবির, ঠিক উপযোগী যেমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে আল্লাহ্‌র আলমে ঠিক ডেমনি উপযোগী কতগুলি পদার্থ বিদ্যমান বলেই মনের দুয়ার খোলা সম্ভবপর হয়।

কেবল আল্লাহ্‌ এ চাবি সরবরাহ করতে পারেন। আমাদের জটিল যান্ত্রিকতাময় মনের যে তালার অঙ্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা কখনও তার চাবি সৃষ্টি হতে পারে না; মানুষের আত্মার দরজা খুলতে পারে, অন্ধভাবে এমন চাবি তৈরী করা সম্ভব নয়। আর একমাত্র আল্লাহ্‌ই এ চাবির সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সক্ষম। কবি কাউপার তাই যথার্থই বলেছেন :

অন্ধ অবিশ্বাস ভুল করবেই
ব্যর্থভাবে তাঁর কাজের বিশ্লেষণ করবে;
আল্লাহ্‌ নিজেই তাঁর নিজের ভাষ্যকার,
আর তিনিই একে সহজ করতে পারেন।

“আল্লাহ্‌ নিজেই তাঁর ভাষ্যকার” হিসাবে কি করেন, আমাদের এ চাবির কথা বলে দেন? খুব সংক্ষেপে তিনি এই করবেন : যেহেতু আমরা দোষী-পাপী, যীশুর মাধ্যমে আমাদের আল্লাহ্‌র ক্ষমার প্রয়োজন, যাতে আমরা তাঁর অনুচরের মর্যাদা পেতে পারি এবং অপরদের প্রতি ক্ষমাশীল হই, তাই বলবেন। এমনভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপীকুল, তাদের ভয় ও উৎকণ্ঠাকে বাদ দেবার জন্য নিজেদের মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র দান লাভ করবে এবং তাদের চারিদিকে তাই এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যে, সেখানে হতাশা প্রবেশ করতে পারবে না। তাঁর প্রেম যখন আমাদের হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে তখন ঈর্ষা, স্বার্থপরতা এবং সকল দোষ-ক্রটি দূর হয়ে যাবে। আনন্দে বিরক্তি বিদায় গ্রহণ করবে। আশা তখন সবচেয়ে সক্রিয় বিষয়-প্রাণবন্ত ও জীবন সঞ্জীবনী রূপ নেবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে আমি দেখেছি, আধ্যাত্মিক এ শক্তির্ম ও সে সংগে চিকিৎসা-পদ্ধতির যে জ্ঞান আমার আছে, উভয় নিয়ে আমি যখন দৈনন্দিন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করি তখন যথার্থ সাফল্য পেতে পারি। আল্লাহ্‌কে যদি এ থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে আধা চিকিৎসা অসমাপ্তই থেকে যায়।

তাই, অধিকাংশ পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষ কতটা খায় তার উপর রোগীর রোগ নির্ভর করে না, যে জিনিস

তাকে খেয়ে যাচ্ছে তার উপর রোগের আসল গুরুত্ব। এ ব্যাপারে রোগের যে বিতৃষ্ণা অবশ্য তা চিকিৎসা করতে হবে। এ অসন্তোষ সারাতে ধৈর্য দেখি; যীশু যেমনভাবে তাঁর শত্রুদেরকে ক্ষমা করেছিলেন, আমরা সেই মৌলিক ক্ষমতার আদর্শের সম্মুখীন হয়েছি। আমরা যদি যথার্থই যীশুর অনুসারী হই তাহলে অন্যের প্রতি আমাদের যে তিক্ততা আর অসন্তোষ, তাকে অবশ্য আমাদের কাছ থেকে সরে যেতে হবে। আমরা যদি সরলতা নিয়ে কাজ করি তাহলে নিঃসন্দেহে সেগুলি আমাদেরকে বর্জন করবে। এরূপ অবস্থার জন্য যে পথ্য দেওয়া হয়ে থাকে, তার সঙ্গে নির্দিষ্ট অ্যান্টিপ্যাসমোটিক ও অ্যান্টিসিড ঔষধ-পত্র যা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা দিয়ে, তদুপরি যদি এই আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, তাহলে পেপটিক আলসার-নিরাময় হওয়ার পথ পেতে পারে।

অনুরূপ অনেক মায়ুভিক অবস্থা রয়েছে, যাতে ভয় আর উৎকণ্ঠা রোগের কারণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মামলিভাবে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা যে ক্ষেত্রে ভয় ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে থাকে, সেখানে অনুরূপ নাটকীয়ভাবে স্বাস্থ্যোচ্চার হয়ে থাকে।

একমাত্র আল্লাহতে বিশ্বাস করলে যে অনেক রোগ সারে, তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না। আমি আমার 'হেলথ শ্যাল স্প্রিং ফোর্স' নামক বইয়ে এমনি কতিপয় রোগের উদাহরণ দিয়েছি— চিকিৎসা পদ্ধতির আত্মা হিসাবে আল্লাহতে বিশ্বাস জন্মিয়ে যেসব ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় করা হয়েছে।

মানুষের দেহের সঙ্গে যখন তার সৃষ্টিকর্তার মধুর সম্পর্ক থাকে তখন মানুষের দেহ খুব ভালভাবে কাজ করে। আল্লাহকে বাদ দিলে আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আর রোগ দেখা দেয়।

তাই বলছিলাম, নিশ্চয় আল্লাহ আছেন। আমি অগণিত অভিজ্ঞতা থেকে এ জ্ঞান লাভ করেছি। জেনেছি ভাংগা হাড় আর ভাংগা মন, একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই জোড়া লেগেছে।

ফুল আর ওরিওল পাখী সম্পর্কে

সিসিল বয়েস হ্যাম্যান, জীববিদ : বি.এস.-সি, টেলর বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এস.-সি, পি.-এইচ, ডি, পার্দ্ বিশ্ববিদ্যালয়। পার্দ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট; কেন্টাকী বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রীনডীল কলেজ ও সেন্ট লুইজ ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের ফ্যাকালটির সদস্য। ১৯৪৬ থেকে অ্যাশবারী কলেজের বিজ্ঞান ও গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান এবং জীবতত্ত্বের অধ্যাপক। ওকরীজ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার স্টাডিজের রিসার্চে যোগদানকারী। জীব-পরজীবীয় ট্যাক্সনমী, টিচিনোসিস অবটক্সিকোলজীর বিশেষজ্ঞ ॥

বিজ্ঞান জগতের যে দিকেই আমি দৃষ্টি ফিরাই না কেন, সর্বত্র পরিকল্পনা, আইন ও শৃংখলার—সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সাক্ষ্য দেখতে পাই। সূর্যকরোজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যান এবং সেই সংগে ফুলের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলি একবার লক্ষ্য করুন, মন দিয়ে রবিন পাখীর মিষ্ট গান শুনুন এবং বালটিমোর ওরিওলের জটিল বুনটওয়ালা বাসা পর্যবেক্ষণ করুন। পতংগকে আকর্ষণকারী ফুলের যে মধু তা কি আকস্মিকভাবে ফুলের মধ্যে পৌঁছেছে? পতংগ যে আগামী বছরে আরও ফুল জন্মানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে গুলো, তা কি আকস্মিকভাবে হলো? অতি ক্ষুদ্র পুষ্পের ফুলের গর্ভকোষের মধ্যে ক্রমশঃ অংকুরিত হয়ে এই যে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, এটাকে কি মামলি দৈব ব্যাপার বলে উল্লেখ করা চলে? আমরা যেসব আইন সম্পর্কে সবেমাত্র জ্ঞান লাভ করছি, আল্লাহ সেইসব আইন দ্বারা অদৃশ্যভাবে এ সকল ব্যবস্থা সম্পাদন করেছেন, একথা ভাবা কি এর চাইতে বেশী যুক্তিবৃত্ত নয়? শুধু সাধী আছে বলে রবিন পাখী গান করে আনন্দ পায়, আল্লাহ তা জানেন বলেই রবিন গান গায়? মানুষের জন্য আল্লাহর সকল দান যেমন সব সময় মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তৈরী থাকে; কিন্তু মানুষ তার খবর রাখে না। ভেমনি অগণিত পাখী প্রতিদিন আল্লাহর তারিক করে কত গান গাইছে, মরণশীল মানুষের কাছে সে গান পৌঁছায় না।

বালটিমোর ওরিওলের বাসা কি করে তৈরী হয়েছে? কে এ পাখীকে এমন সুন্দর শিল্পকলা শিক্ষা দিয়েছে? কেন সকল ক্ষেত্রেই একই ধরনের বাসা তৈরী হয়? প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার সহজ জবাব হচ্ছে, “সহজাত প্রবৃত্তি” এমনি সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলেছে, কিন্তু তাই বলে এটি কিন্তু সম্পূর্ণ জবাব হলো না। “সহজাত প্রবৃত্তি” কি? অনেকে বলেন, যে সকল আচরণ শেখা হয়নি, তাই। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, এ হচ্ছে কতকগুলি আদর্শ মোতাবেক আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি ফাজ, তাহলে কি সেটা অধিকতর যৌক্তিকতাপূর্ণ হবে না?

নিশ্চয়ই আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি। আমি এমন আল্লাহতে বিশ্বাস করি, যিনি একমাত্র উপাস্য, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রব এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে

পালন করছেন তাই নয়, অধিকন্তু সে আত্মাহুতে বিশ্বাস করি, যিনি সারাক্ষণ তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষের জন্য অত্যন্ত উৎকর্ষিত।

এই দৃঢ় বিশ্বাস শুধু যে খৃষ্টান আমেরিকার সংস্কৃতি থেকে আমি অর্জন করেছি তাই নয়, প্রথমতঃ প্রকৃতির সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্যবেক্ষণ দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ আমার মধ্যে পরীক্ষা দ্বারা আত্মাহুত উপস্থিতি উপলব্ধির পর এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।

মানুষ তার চারিদিকে উত্তর না দেওয়া সব প্রশ্ন দেখতে পায়। সে যখন তার জবাব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তখন প্রকল্প তাকে গড়ে নিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের কোন জবাবের বা অংশ বিশেষ গড়ে তোলার জন্যে খুঁজে পাওয়ার আগে তাকে সেইসব প্রকল্প পরিত্যাগ করতে অথবা সারাস্বকভাবে পাটাতনে হয়। সে বাই হোক, জবাব পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রতিটি বছর পার হওয়ার সংগে সংগে এই জবাব আরো পাওয়া যেতে থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান-বৃদ্ধি পেলেও তাতে করে অধিক মাত্রার আত্মাহুতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। অপর পক্ষে এমনি মনে হয় যে, মানুষ কোনকিছু ব্যাখ্যা করতে পেরে সে আত্মাহুত প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তাই অনেকখানি হ্রাস করেছে। কিন্তু যদি একবার সব মানুষ উপলব্ধি করতো যে, এসব আবিষ্কার মহাবিশ্বের সবকিছুর পেছনে যে সর্বশক্তিমান মনীষা বিদ্যমান তাঁরই সাক্ষ্য বহন করছে।

আমরা যখন পদযোজনা করে নিয়ে অপূর্বীকণ যন্ত্রের নীচে বহু ডোবার এক কোঁটা পানি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি এবং সে সংগে যখন এ পানির ইতস্ততঃ ড্রাম্যমান বাসিন্দাদের লক্ষ্য করি, তখন আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতির এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার ভেসে উঠে। এখানে একটি সদাপরিবর্তনশীল জীবাণুর অত্যন্ত ধীরে ধীরে একটি অতিক্রমকার অবয়বীকে ঘিরে কেলে দেয় এবং আমরা দেখতে দেখতে তাকে হজম করে উন্মিষ্ট করে দেয়। আমাদের পর্যবেক্ষণের সময়ের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই, উক্ত জীবাণুটি নিজের থেকে দু'টি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আবার প্রতিটি অর্ধাংশ একটি পূর্ণ জীবে পরিণত হয়। এখানে আমরা একটি দেহ কোষের মধ্যে জীবনের সকল বিকাশ দেখতে পাই, প্রাণিদেহে যে বিকাশের জন্যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ দেহকোষের প্রয়োজন হয়। নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য বলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ আশ্চর্য রকমের জীব তা সে বত সুদ্রই হোক না কেন তার সৃষ্টির পেছনে দৈব ঘটনারও কিছু নিশ্চয়ই বিদ্যমান।

বিজ্ঞানের বহুবিধ ক্ষেত্রের কোথাও প্রাকৃতিক আইনাবলীকে এতটা প্রত্যক্ষভাবে জীবনের প্রপঞ্চের উপর প্রয়োগ করা হয় না, যতটা জীব রাসায়নের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মানব দেহের মধ্যে যেখানে হজম প্রক্রিয়া ও পরিপাক-প্রণালীর রহস্যাবলী ঐশী হস্তক্ষেপ বলে মনে করা হতো, এখন তার প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে সকল রহস্যের ব্যাখ্যা মেলে। আরো মেলে যে, একটি উৎসেচক এ সকল পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু এতে করে আত্মাহুতকে কি তাঁর মহাবিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া

যেতে পারে? এরূপ বিক্রিয়া যে হওয়া উচিত এবং এরা ঠিক যে এমন নির্দিষ্টভাবে উৎসেচক কর্তক পরিচালিত হবে, তা কে নির্ধারণ করেছিল? এক নজর যদি আমরা এ ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্পর্কিত বর্তমানকালের চাটটি দেখি এবং কিভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা লক্ষ্য করি, তাহলে অতি সহজেই সবকিছুর মূলে দৈবের হাত, এমন মনে করার সকল সম্ভাবনা আমাদের তিরোহিত হবে। সম্ভবতঃ অন্য কোথাও অপেক্ষা এখানে মানুষ ভালো করে এ বিষয়টি শেখে যে, আল্লাহ কতগুলি নীতি মেনে চলেন এবং প্রাণ সৃষ্টির সংগে সংগে তিনি এ নীতিগুলি কায়ম করেছেন।

একবার নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালে সেখানকার সুশৃঙ্খল দৃশ্য দেখে আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, রাতের পর রাত, ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহিঃশূন্যের সকল জগত আকাশ পথে নিজ নিজ কক্ষে এগিয়ে চলেছে। তারা নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট স্থানে এমন নির্ভুলভাবে ফিরে আসে যে, বহু শতাব্দীর আগেও সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারতো। এর পরেও কি এমন কোন ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি এগুলিকে দৈবক্রমে একত্রীভূত জ্যোতিষ জাতীয় পদার্থ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই এগুলি আকাশ মার্গে বিচরণ করছে? যদি তাদেরকে পরিচালনের কোন আইন না থেকে থাকে, তাহলে মানুষ কি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নির্দেশ মোতাবেক সেগুলিকে আকাশের অ-চিহ্নিত পথে পরিচালিত করতে পারবে? যদিও বা মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতাকে স্বীকার করতে পারে না, কিছু তাম্রা এ কথা মানতে রাজী আছে যে, জ্যোতিষমণ্ডলী যেকোন ভাবেই হোক পরিচালিত হচ্ছে এবং এই পরিচালন নির্ভরযোগ্য; দৈবক্রমে এদেরকে নির্দেশ দিলেও এই নির্দিষ্ট পথ থেকে টলানো যাবে না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি নিকটে পানির যে বিন্দুটি পর্যবেক্ষণ করি আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর আকাশে যে নক্ষত্রই আমি প্রত্যক্ষ করি না কেন, সর্বত্র একটা সঠিক নিয়ম-শৃঙ্খলা আমাকে মুগ্ধ করে। এইসব এতই নির্ভুল যে, এর স্থিতিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য আইন প্রণীত করা হয়েছে; আর তা হচ্ছে, সব আইন প্রণয়ন করা একটি মাত্র কারণেই সম্ভব হয়েছে, আর তা হচ্ছে এই যে, মানুষ সারা জীবন ধরে এই সব তথ্যাদি সমগ্র করার জন্যে বহুপরিকর রয়েছে এবং তারা সেই সংগে এও বিশ্বাস করেন যে, এমনি সব আইন প্রণয়ন সম্ভব। কারণ এমনি বিশ্বাস আর দৃঢ়চিন্তা না থাকলে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদি প্রত্যেকবারই পরীক্ষার ফলে পৃথক ফল দেখা যায়, আর কোন প্রাকৃতিক আইন প্রয়োগ না করে যদি দৈবকে নিয়ন্ত্রণকারী কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে কি অগ্রগতি হতে পারে? নিশ্চয়ই এ আইন ও শৃঙ্খলার পেছনে কোন সর্বময় ক্ষমতা বিদ্যমান। কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মন ছাড়া কিছুতেই এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে না। যখনই প্রতিটি নয়া আইন আবিষ্কৃত হয়, তখন কি আইনটি ঘোষণা করে না, আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা; মানুষ শুধু মাত্র আমার আবিষ্কৃত?

বিজ্ঞানের তথ্যপূর্ণ প্রমাণগুলি যেমন প্রকৃত সত্য, তেমনি সত্য আমার মধ্যে প্রকৃত আল্লাহর উপস্থিতি। যেমন করে আমরা নক্ষত্রগুলির চিত্রগ্রহণ করতে পারি, তাদের শূন্য আকাশের গতিগত নির্দিষ্টভাবে একে দিতে পারি, যেমন করে স্লাইডের উপস্থিতি অস্তিত্ব ক্ষুদ্র, সর্বদা আকার পরিবর্তনশীল জীবাণুর চিত্রগ্রহণ করতে পারি, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আমাদের কাছে অবশ্য এমন কোন স্পর্শনীয় সাক্ষ্য নেই। মানুষ যদি নিজেকে এমন অবস্থায় স্থাপন করে, যাতে করে আল্লাহ সব সময় তার সংগে থাকতে পারেন, তাহলেই ব্যক্তিগতভাবে তার পক্ষে আল্লাহর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হবে। যদি কেউ অপূর্বীকণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে অস্বীকার করে, অথবা একটি পরিবর্তনশীল জীবনের যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখতে অস্বীকার করে, তাহলে সে যত ইচ্ছা এই বলে তর্ক করতে পারতো যে, পরিবর্তনশীল জীবাণুর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু একবার যদি এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি বা তার ছবি তার নজরে পড়ে, তারপর তার তর্কের কোন ভিত্তিই থাকবে না। তেমনি মানুষ যতক্ষণ আল্লাহর দিকে তাকাতে অথবা তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিতে অস্বীকার করে, ততক্ষণ সে তর্কের খাতিরে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে—চিৎকার করে বলতে পারে যে, “আল্লাহ নেই”। কিন্তু একবার অবিস্বাসী মানুষ আল্লাহকে এক নজর দেখতে পারলে, তাঁর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বলার তার কিছুই থাকবে না। এ হলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। যদি কেউ এ ব্যাপারে নজর দিতে অস্বীকার করে, তাহলে করার কিছুই নেই। “যারা তাঁকে সম্মান করেন, তিনি তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।” (হিব্রুজ : ৯ : ২৮)

হ্যাঁ, আমি আল্লাহুতে বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করি মহাবিশ্বের আল্লাহকে আমার বন্ধু হিসাবে। আমার মধ্যে আর আমার চারিদিকে যে আল্লাহ আছেন, আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

আল্লাহর অস্তিত্বের নিশ্চয়তার পূর্ণতা

আনজু কনওয়ে আই, ডি। সি-এইচ, ডি, এম, ডি, সি, এল-এল, ডি, এক-এ-সি, সি, শরীরবৃত্তবিদ। ডঃ আই ডি হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। এ প্রবন্ধ লেখার অব্যবহিত পূর্বে তিনি ইউরোপ ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে হাওরাই বক্তৃতা বকর শেষ করে ফেলেন। বিভিন্ন আমেরিকান ও বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে অনেক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তিনি বর্কওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলে শরীরবৃত্ত ও ঔষধ প্রকৃতবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন; ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ইন্সট্রিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি শিকাগোর ইনস্টিটিউট অব ইন্সট্রিস কলেজ অব মেডিসিনের শরীরবৃত্তের সম্মানিত অধ্যাপক ও ক্লিনিক্যাল স্নায়ুশল্যের বিভাগীয় প্রধান। এর আগে যেসব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা হচ্ছে : ন্যাভাল মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সায়েন্টফিক ডিরেক্টর, এভিয়েশন মেডিক্যাল ন্যাভাল রিজার্ভ কোর্স-এর কমান্ডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ সচিবের পরামর্শদাতা এবং আমেরিকান শরীরবৃত্ত সম্পর্কিত সমিতির প্রেসিডেন্ট। ডঃ আই, ডি এক হাজারের বেশী (১,৩১০) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি বিহীন অন্যতম কামকর রোগ বিশেষজ্ঞ এবং প্যাস্টোরাল ইন্সটিটিউট-এর ফ্রি ও রোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ॥

আল্লাহ আছেন কি? হ্যাঁ, অসংখ্য বিষয় সম্পর্কে আমি যেমন নিশ্চিত এ ব্যাপারেও আমি ততটা নিশ্চিত। এই আমি যেমন আছি, যেমন রয়েছে আমার অস্তিত্ব, ঠিক তেমনি আল্লাহ যে আছেন, সে সম্পর্কেও আমি স্থির নিশ্চিত। আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাসের কলে, আমাদের নিজস্বের অস্তিত্বের সম্পর্কে সম্পূর্ণ চরম ও যুক্তিসংগত একটা স্মরণ হয়। মানুষ যে জড়পিণ্ড ও শক্তির সমষ্টি নয়, সে একটি ব্যক্তি এবং তার চাইতেও বেশী, এ নিশ্চয়তার সম্পূর্ণতার জন্যে আল্লাহতে বিশ্বাসই হচ্ছে, একমাত্র সর্বশেষ চরম যুক্তি। আল্লাহর সৃষ্টিকে জেনে নিয়ে প্রতিটি মানুষ ভাই ভাই বলে মানুষের মনে যে উৎসাহ-ব্যঞ্জক মৌলিক ধারণা বিদ্যমান, তার ভিত্তিও এই আল্লাহতে বিশ্বাস।

সর্বময় ও যথার্থ প্রেম, ন্যায়বিচার ও কামার আধার আল্লাহর কাছে সবাই সমান বলে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার আর কর্তব্যের চরম ও সন্দেহাতীত উৎস হচ্ছে, আল্লাহতে বিশ্বাস। আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করলে এমন একটি ক্ষমতা জন্মায়, যা নাকি এমনি গ্যারান্টি প্রদান করে যে, আল্লাহতে ঋরা যথার্থই বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ক্ষমতের পারে না। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের স্থানিত্বের জন্য আল্লাহতে বিশ্বাসই হচ্ছে একমাত্র ইমানের দৃঢ় ভিত্তি। কারণ, এমনি স্থানিত্ব কেবলমাত্র বাইরে ও একী, ব্যক্তিত্বেই চিরস্থায়ী হতে পারে।

আল্লাহর অস্তিত্ব যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসারে হাতে-কলমে প্রমাণ করা যেতে পারে : মনের যন্ত্রপাতি দিয়ে সৈন্যদলিকার ইঞ্জিনিগত অস্তিত্বের মিশ্রক্রিয়ার ফলে চিন্তাধারার যেসব নীতি গড়ে উঠে, তারই প্রয়োগের ফলে যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুযায়ী আল্লাহর অস্তিত্বকে হাতে-কলমে প্রমাণ করা যেতে পারে। ধর্মাস অ্যাকুইনাইস সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রমাণটি সম্পন্ন করেন। স্বাভাবিক শিশুর মনের উন্মত্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সকল বিষয় শিশু-মাতা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাই প্রমাণের মৌলিক নীতিগুলি ব্যাখ্যা করে থাকে। এমনভাবে যুক্তিসংগত উপায়ে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে—প্রমাণিত হয়েছে, সেই মহান বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ সত্ত্বাতি মোতাক্কেক, যাদের বিজ্ঞান মানবতার কল্যাণে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে।

আল্লাহ নেই—একথা যুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না : “আল্লাহ যে আছেন”, এ প্রকল্পকে অস্বীকার করা যায় না। “আল্লাহ নেই” এ প্রকল্পকেও প্রমাণ করা চলে না। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যেতে পারে, যেমন অস্বীকার করেছেন নাস্তিক কার্লমার্কস আর লেনিন; কিন্তু নাস্তিকেরা কোনদিন তাদের অস্বীকারের পক্ষে যুক্তিস্বরূপ কোন কিছুই পেশ করতে পারে নাই। কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও মনে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু সেখানেও সন্দেহের একটা ভিত্তি থাকা উচিত। “আল্লাহ নেই” একে প্রমাণ করে এমন কোন যুক্তিসংগত অবতারণার কথা আমি পড়িনি, আমার শোনায়ও সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আল্লাহ আছেন, এ প্রকল্প সত্য বলে প্রমাণ করে এমন অনেক লেখা আমি পড়েছি, তা নিয়ে গবেষণাও করেছি। আমি আরও প্রত্যক্ষ করেছি, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মানুষের কি কল্যাণ হয়েছে এবং আল্লাহ তা’আলাকে অস্বীকার করার ফলে মানুষের কি ক্ষতি হয়েছে।

“আল্লাহ আছেন” এই প্রকল্প সত্য বলে প্রকাশ করার জন্য নাস্তিকগণ এবং অজ্ঞেয়বাদীদের অনেকেই এমন ধরনের প্রমাণ চায়, যা নাস্তিক আল্লাহকে মানুষের মত কেউ একজন বলে প্রমাণ করতে পারে, অথবা প্রস্তর মূর্তি, দেবমূর্তি অথবা বিগ্রহরূপে প্রমাণ করতে পারে। যদি এমন গুণাবলী সম্পন্ন কোন আল্লাহই থাকতো, তাহলে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে মনোনিয়নের যে স্বাধীনতা বিদ্যমান তা আর থাকতো না। মানুষের জন্য আল্লাহর যে পরিকল্পনা রয়েছে, তাতে বেহেতু আল্লাহ মানুষের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন, কাজেই আল্লাহ আছেন বলে বিশ্বাস করা, অথবা আল্লাহ নেই একথা বিশ্বাস করা আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ। কাজেই আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্বীকার করা অথবা সন্দেহ প্রকাশ করা, না করা মানুষের নিজস্ব মর্জির ব্যাপার। অস্বীকার এবং সন্দেহ প্রকাশ দ্বারা নিজেকে বিভ্রান্ত মনে করে পরিশ্রাম ভোগ করার স্বাধীনতাও মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। অধিকাংশ নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী এবং এমনকি অনেক তথাকথিত খৃষ্টান আল্লাহকে এমন একটি সত্তা বলে মনে করেন, যার সংশ্লিষ্ট দরকষাকষি করা চলে। তারা এমন সব উক্তি করে থাকেন : “আল্লাহ যদি আমার আমাকে স্কা করেন, তাহলে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করবো, যদি তিনি আমার দেরি বৃষ্টি দেন অথবা বন্যারোধ করেন, অথবা আমার ব্যাথা সারিয়ে দেন অথবা দুমিষ্টা থেকে সকল পাপ, সকল অনাচার-অবিচার দূর করেন। কল্যাণ কামনাকারী আল্লাহ যদি সত্য

ধাকডেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার দাঁতের ব্যথা হতো না।” কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে এই দাঁড়ায় যে, আমি আল্লাহুতে বিশ্বাস করতে পারি, যদি আমার পরিকল্পনা মোতাবেক এ মহাবিশ্বকে নির্মাণ অথবা পুনর্নির্মাণ করেন— গড়ে তুলেন আমার স্বার্থক পরিকল্পনা এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি মতো।

আল্লাহর দিকে এগুতে হলে, সোজাসুজি আর যুক্তিসংগতভাবে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে, মানুষ মজেরই তাদের স্বার্থক আত্মকেন্দ্রিকতা বৈরাগ্যধর্মী মতামত, ভিত্ততা আর যেসব মানসিকতা স্বাধীন চিন্তাধারায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা সবই বর্জন করে, যাতে তারা আল্লাহকে বিশ্বাস ও আল্লাহকে ভালবাসতে পারেন এবং সেই সঙ্গে তারা যে পাশ ও অনাচারের কথা জোর গলায় বলে থাকেন, দুনিয়া থেকে তাকে অপসারণের জন্য যাতে সাহায্য করতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে কলুষমুক্ত মন নিয়ে তাদেরকে এগুতে হবে। আল্লাহর অস্তিত্বের যথার্থতা সম্পর্কে এ কথাই বলা যায়, যে সব সাধু-ফকীর আর প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা তাদের কাজ দ্বারা আল্লাহর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের খাদ্য যেমন জীবন ধারণের জন্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালবাসা জীবনকে যে উৎসাহিত করেছে তা অস্বীকার করা অসৌ যুক্তিসংগত হতে পারে না। বিশ্বে পাশ ও অনাচার আছে বলে অভিযোগ না করে আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আমাদের বুদ্ধিমত্তা আর স্বাধীন চিন্তাধারাকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়া থেকে সে অবিচার দূর করার জন্য চেষ্টা করাই আমাদের কাজ হবে, যাতে এ পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; স্বর্গের ন্যায় যাতে পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হয়।

বিশ্বাস আশা আর প্রেম সবকিছু যুক্তিভিত্তিক হওয়া উচিত : আল্লাহুতে আমার বিশ্বাস; যে আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি এ মহাবিশ্বের স্রষ্টার ও বইরে সর্বত্র বিরাজমান এবং যিনি আপনার ও আমার প্রতি আল্লাহশীল, তা প্রথমে যুক্তি ও তারপর বিশ্বাস, আশা আর প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি যুক্তিভিত্তিক না হয়, তাহলে আমি বিশ্বাস-আশা আর প্রেমের অধিকারী হতে পারি না।

যুক্তি থেকে কারো দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকের সঠিকভাবে এবং বলপূর্বক যুক্তি প্রয়োগ করা উচিত। যে বিশ্বাসের পেছনে যুক্তি নেই, সে বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। সব রকম সমালোচনা—মারাত্মক সমালোচনার সন্ধান হতে এবং পরিণেবে তেমন বিশ্বাস ভেঙে যেতে বাধ্য। যুক্তিবহির্ভূত ধর্মীয় বিশ্বাস সকল সময়ই ধারণা চরিত্র আর মন্দ স্বভাবের জন্ম দিতে বাধ্য। যে যুক্তি ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দৈনন্দিনের কাজকর্ম এবং বিশ্বাস গড়ে ওঠে, সে যুক্তি ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে দুনিয়ার বড় বড় বৈজ্ঞানিক তাদের কাজকর্ম এবং বিশ্বাসকে পরিচালনা করেন, তা থেকে আমাদের সরে যাওয়া উচিত হবে না। যে বিশ্বাসের চিন্তাধারার ওপর ভবিষ্যৎ জড়জগতের অগ্রগতি নির্ভর করে, সেই একই চিন্তাধারার ওপর আল্লাহুতে বিশ্বাসও নির্ভর করে। এই দৈনন্দিনকার বিশ্বাস হচ্ছে যেমন, কাল যে সূর্য উঠবে এ কথাটি আপনি, আমি যাতে বিশ্বাস করি তার পেছনে যে কারণ আছে সেটি অথবা আগামীকাল আমার জীবনের অন্যান্য সবকিছুর প্রয়োজন হবে অথবা আমি বেঁচে থাকবো অথবা আমার কাজকে ভালবাসবো ইত্যাদি। যদি জড়জগতের অগ্রগতির ভিত্তি

যুক্তি হয়, তাহলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি যুক্তি হবে না কেন? প্রত্যেকেরই তার ধর্মীয় বিশ্বাসের যে ভিত্তি রয়েছে, তা দৃঢ়তার সংশে প্রকাশ করার সংসাহস থাকা উচিত। আর ভাল কাজ করে তাদের সেই বিশ্বাসের প্রতি যে দৃঢ় নিষ্ঠা রয়েছে, তা প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য। যদি আপনি সত্যোন্মেষকভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আপনাকে আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে অথবা বলতে হবে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব হচ্ছে আত্মশাস্তা; ঠিক যেমনটি ঘোষণা করেছিলেন থমাস জেফারসন স্বাধীনতা ঘোষণা-সনদের মূল বিষয় রচনাকালে। থমাস জেফারসন বলেছিলেন, “সব মানুষ সমান—এই সত্য উক্তিটি আমরা আত্ম-ব্রহ্ম হিসেবে মনে করি। আমরা মনে করি, তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে পরস্পর সম্পর্ক বিশিষ্ট কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং সেইসব অধিকার হচ্ছে, জীবনের স্বাধীনতার এবং শান্তির সন্ধানের অধিকার। এইসব অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন—যে সরকার শাসিত জনসাধারণের সম্মতি নিয়ে তার ন্যায় করার ক্ষমতা লাভ করে থাকেন।” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র তথা সরকারের ধর্মীয় তথা নৈতিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূলে রয়েছে থমাস জেফারসনের এ সারগর্ভ উক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। থমাস জেফারসন এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ যারা যুক্তরাষ্ট্র কায়েম করেন তাঁদের এমনি বিশ্বাস কার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট যুক্তি বিদ্যমান ছিল। এতদসঙ্গেও বন্ধন মানুষ বলে যে, তারা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর অস্তিত্বকে মানে তখন দেখা যাবে যে, তাদের বিশ্বাস কতগুলো পূর্ণাঙ্গতা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা যুক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কোন কিছুতে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে কোন না কোন পূর্ববর্তী জ্ঞান বা যুক্তির একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্ব আত্ম-সাক্ষ্যমূলক—এ বলার অর্থ হচ্ছে, আমি যেহেতু আনুষ্ঠানিক জ্ঞানের অধিকারী নই অথবা যেহেতু কখনও আমার যুক্তিকে সুসংযোজ্য করিনি, অথবা যেহেতু আমি তৈরী নই অথবা বর্তমানে আমার যুক্তিসমূহ গণ্য করা উচিত হবে না বলে মনে করি, কাজেই আমার পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে হাতে-কলমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমি কখনও এমন মানুষের পরিচয় পাইনি, যিনি জিজ্ঞাসিত হয়ে আল্লাহুতে তাঁর বিশ্বাসের কারণ দর্শাতে পারেননি। তারা এই ধরনের যুক্তি প্রদান করে থাকে যে, নিশ্চয়ই কোন একজনকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে হয়েছে এবং একে পরিচালনের জন্য নির্দিষ্ট সব আইন তৈরী করতে হয়েছে। “সৃষ্টিকর্তা হাড়া কোন রকমেই মেশিন তৈরী হতে পারে না।” এই মৌলিক সত্যটি প্রতিটি স্বাভাবিক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকই বুঝতে পারে।

শিশুর মনে কার্য-কারণ বোধের ক্রমবিকাশ : আমি যখন তিন বছরের শিশু, তখন তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের পক্ষে যে সব কথা বলা স্বাভাবিক, তেমনভাবেই বলেছিলাম, জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার বাবাকে, “কে আমাকে বানিয়েছে?” “কে পাখী সৃষ্টি করেছে?” “কে আমাদের গরুকে বানিয়েছে?” “কে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?” জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অথবা আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে, তার কলে আমার কচি, সরল মন বা বুদ্ধিমত্তা এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হয় যে ‘প্রকৃতকারক ছাড়া কখনও মেশিন তৈরী হতে পারে না।’ আমার বুদ্ধিমত্তা-আত্মঘটনাসমূহের পরেও যেসব বিষয় রয়েছে তৎসম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে আমার মস্তিষ্কের উপযুক্ত অংশকে নাড়া দেয়। আমি আছি, পাখী, গরু এ সবই তো আছে। কিন্তু আমার বুদ্ধিমত্তা এরও পরে, আরো সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, যথেষ্ট কারণ, একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আমি জন্মাতে পারি না, পাখী, গরু, সৃষ্টি হতে পারে না।

আমার সরল, অকপট, পূর্ব সংস্কারমুক্ত, অবিভ্রান্ত, আশাবাদী, বোধশক্তি সম্পন্ন, যুক্তিবাদী মন, অস্তিত্বের সর্বাপেক্ষা মৌলিক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহ আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছে। মানুষের মন যে অস্তিত্বের ও চিন্তাধারা-নীতি কল্পনা করেছে, তাই আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছে।

আমার মস্তিষ্কে মন পড়ে তোলার যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে, তার সংগে ইন্দ্রিয়গত অস্তিত্বভার এত বেশী সম্পর্ক যে, তার সাহায্যে অতি সহজেই আত্মসচেতন বোধসম্পন্ন মন গড়ে উঠে। এই সচেতনতাকে অনুভূতিও বলা যায়। যে অনুভূতির সংগে আমি যে একটি সত্তা, এই উপলব্ধি জন্মায়— ‘এই আমি’ এই ভাবটি উপলব্ধি করায়। ‘এই আমি নই,’ সে সংগে এই অনুভূতিও আমাদের জন্মে থাকে। ‘আমি পাখী নই, আমি পৃথিবীও নই,’ এ অনুভূতিও এক সংগে আমার উদ্বেক হয়। অন্য কথায়, আমার মন ‘হওয়া না হওয়া’ এই সত্য বা নীতিকে প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে আমার মন অংশ ও সম্পূর্ণ সম্পর্কেও অভিমত ব্যক্ত করে। অর্থাৎ, প্রকাশ করে যে, অংশের চেয়ে সম্পূর্ণ অনেক বড়।

‘হওয়া না হওয়া’ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠার পরই শিশুর মনে চিন্তার প্রথম নীতি জন্মাণ্ড করে। অর্থাৎ, “আমরা একই সংগে কোন কিছুকে মামতে ও অস্বীকার করতে পারি না।” একটি ছোট ছেলে : “আমি হচ্ছি টম এবং এ হচ্ছে আমার কোন মেরী।” ছেলেটির যুক্তিবাদী মন তাকে এমন করেছে যে, একমাত্র ঠাট্টা করা ছাড়া অন্য কোন অবস্থাতেই সে বলবে না যে, আমি হচ্ছি মেরী এবং এ আমার বোন টম। শিশু আরও শেখে যে, বর্গক্ষেত্রকে গোলা বলা ভুল। সে জানে যে বর্গক্ষেত্র হওয়ার জন্যে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান এবং এই কারণগুলিই তাকে বর্গক্ষেত্র রূপে সৃষ্টি করেছে এবং এভাবে সে বিষয়টিকে বোধগম্য করে তোলে।

শিশুর এই জ্ঞান এবং শিশু যে জিজ্ঞেস করলো “কে আমাকে বানিয়েছে?” এবং “কে পৃথিবীকে তৈরী করেছে?” এ কথা প্রমাণ করে যে, শিশু হেতুবাদের মৌলিক নীতি আবিষ্কার করেছে। এই নীতিকে “কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন” বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। “কারণ ছাড়া কোন প্রকারেই কল থাকতে পারে না, প্রকৃতকারক ছাড়া যন্ত্র সৃষ্টি হতে পারে না, প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য একটি করে কারণ আছে” এই হচ্ছে কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন। এই চিন্তাধারাই “আমর অস্তিত্ব” এবং “পৃথিবীর অস্তিত্ব” সম্পর্কে একটা অভিমত গড়ে তোলার সংগে সংগে তারই সংগে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় এসে পড়ে এবং তা হচ্ছে মূল কারণ হিসাবে আল্লাহর অস্তিত্ব অথবা গতির অস্তিত্বের সংগে প্রধান পরিচালকের অস্তিত্ব। চিন্তাধারার গতিকে আরেকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন, পরিকল্পনা অবশ্যস্বাধী; পরিকল্পনার জন্য একজন পরিকল্পকের প্রয়োজন; এই পরিকল্পককে অবর্ণনীয় ক্ষমতার অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব

হতে হবে; আর এই ব্যক্তিত্বই হচ্ছে আল্লাহ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কারণ ও তার প্রভাব সম্পর্কিত প্রাকৃতিক সব আইন এমনি হয় যে, তিন-চার-পাঁচ বছরের গড়ে ওঠা শিশুর মত একথা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা একজন থাকতেই হবে।

হাতের কাছে আমাদের যে সব প্রমাণ জানা আছে, তার বাইরে কি কারণ রয়েছে, তারই সন্ধানের জন্য বিজ্ঞানী হিসাবে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমার মন, অস্তিত্বের জড় ও আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে মূল্যবান নতুন বিষয় বা সত্য আবিষ্কারের জন্য জীবনে আশু বিষয়গুলির পরে অন্যান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে চায়। আমার এই সন্ধান প্রচেষ্টায় আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অথবা “প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী বা” সম্পর্কে পড়াশোনা এবং গবেষণা করি। সে সংগে চরিত্র, নৈতিক ও ধর্মীয় বিজ্ঞান অথবা “পৃথিবী যেমন হওয়া উচিত” সে সম্পর্কেও গবেষণা করি। এ অধ্যয়নে আমি দেখেছি, অনেক ভাল ভাল লেখক, বড় বড় দার্শনিক এবং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অত্যন্ত উন্নত ধরনের চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক সময় হয় চটুল অথবা নিশ্চিত ভুল করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা বিষয়টি আরও জটিল করে তোলেন এবং আশু বিষয়গুলি পেরিয়ে তার বাইরে নজর দেওয়ার পথে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে কুশাশর বেড়াজাল সৃষ্টি করেন অথবা বলা যায়, আশু ও সর্বজনবিদিত বিষয়গুলিকে তারা অস্বীকার করেন। যে বিজ্ঞানী তার গবেষণাগারে এমনি কাজ করেন, তিনি তার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করেন। জানা বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দান করে, জড় ও আধ্যাত্মিক মূল্য, আইন ও শৃংখলার গবেষণাগারের বাইরে প্রাকৃতিক আইনের যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং বিশ্বাস, আশা ও সন্তোষ প্রতি প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অবশ্যেকন দ্বারা সকল অগ্রগতি সাধন করা হয়েছে।

কারণতত্ত্বের নীতি : বেশ কয়েক বছর আগের কথা। কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, যিনি নাস্তিক বলে আমি শুনেছিলাম, আমরা সবাই নৈশভোজ সভায় মিলিত হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে নানা রকম আলোচনা হচ্ছিল। একজন ব্যবসায়ী বললেন : আমি পড়েছি অধিকাংশ বিজ্ঞানীই নাস্তিক। কথটা কি সত্য?

প্রশ্ন করে ব্যবসায়ী আমার দিকেই তাকালেন। আমি তাকে কতকটা এল্পণ জবাব দিয়েছিলামঃ আমি বিশ্বাস করি না। এই উক্তির কোন সত্যতা নেই। প্রকৃতপক্ষে পড়াশোনা করে এবং আলোচনার মাধ্যমে আমি জেনেছি যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যারা মানব জাতির সবচাইতে মদল করেছেন, তারা নাস্তিক নন। অনেকে ভুল করে অথবা ভুল বোঝানো হয়ে থাকে। আমি আরও বলি, নাস্তিকতা অথবা নাস্তিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিক যেভাবে চিন্তা করেন, কাজ করেন, জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তা নাস্তিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি এ নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করেন যে, নির্মাতা ছাড়া মেশিন তৈরী হতে পারে না। তিনি জানা বিষয়াবলীর ভিত্তিকে যুক্তিতে প্রয়োগ করেন, তিনি যখন গবেষণাগারে ঢোকেন তখন বিশ্বাস আর আশায় বুক বেঁধে ঢোকেন। আর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই জানেন যে আগ্রহ রয়েছে, মানুষ ও আল্লাহর প্রতি তাদের যে ভালবাসা রয়েছে, তারই জন্যে কাজ করে থাকেন। ই্যা, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন; তিনি দেহের কলকজা সম্পর্কে বলেন। কিন্তু তিনি কারণতত্ত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে গবেষণা চালান। মহাবিশ্বে যে আইন

ও শৃংখলা বিদ্যমান তিনি তার উপর নির্ভর করেন। অন্যায় সকলে যেমন করেন তেমনি তিনিও কারণতত্ত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, প্রতিটি চিন্তাশীল কাজ সম্পাদন করেন।

শরীরবৃত্ত সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন কেউ শরীরের ক্রমবর্ধমান উন্নতি, সংরক্ষণ এবং দেখবস্ত্রের অভ্যন্তরের মেদামত প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করেন তখন তিনি দেখতে পান যে, প্রতিটি দেহ-কোষ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কাজটি ভাল করে জানে এবং সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকে দেহের কল্যাণের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত ব্যাবস্থার, সাধারণ প্রতিসরণ কাজটি একটি উদ্দেশ্যমূলকতারই প্রকাশ মাত্র। ইহাই মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি। আরও গবেষণার ফলে যে অবশ্যজ্ঞাবী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, মনের উন্নতির জন্যে উত্তরাধিকার সূত্রে যে যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, তা এমনভাবে গঠিত যে, যখন ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার সংগে বিক্রিয়া করে, তখন কারণতত্ত্বের নীতিই অবশ্যজ্ঞাবী ফল হিসাবে প্রকাশ পায়। অন্য কথায়, সকল অবয়বীর প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতির জন্যে সেসব যন্ত্রপাতি দায়ী, মনের ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিক্রিয়ার ফলে যতক্ষণ না সচেতনতা জাগে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সব যন্ত্রপাতি অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পার্থক্য করার ক্ষমতা সম্পর্কিত সচেতনতা যখন তারপর গড়ে ওঠে তখন কোনটা গুরুত্বপূর্ণ অথবা কার পর্যাণ্ড কারণ রয়েছে, সে সম্পর্কে একটা মনোভাব জন্মায়। অথবা একটি জীবনকোষের উদ্দেশ্যমূলক প্রকৃতি থেকে শুরু করে এবং অধিক থেকে অধিকতর পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতনতা উদ্ভূত বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা প্রদত্ত হলে, কারণতত্ত্বের আইনের উপর ভিত্তি করে একজনের পক্ষে যুক্তিসংগত উপায়ে পৃথককারী সচেতনতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। ফলে মানুষ তার পরিবেশের উপরে অধিক থেকে অধিকতর অধিকার কায়ম করতে পারবে।

শরীরবৃত্ত সম্পর্কিত বিজ্ঞানে মাছের কানকো, পানির প্রাধান্যকে প্রকাশ করে যেমন প্রকাশ করে, পাখীর ডানা আর মানুষের ফুসফুস বাতাসের অস্তিত্ব। মানুষের চোখ আলোর প্রাধান্য ব্যক্ত করে; বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য ঘটনা প্রাধান্য প্রকাশ করে; জীবনের উপস্থিতি, প্রাকৃতিক আইনে জীবন ধারণের উপবৃত্ততাই প্রকাশ করে থাকে। এবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গভীর অন্তর্দৃষ্টি সুস্পষ্ট যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, বিরাট সাহস, মহান কর্তব্য, চরম বিশ্বাস, গভীর প্রেম—এসব কিছু কি কোন কিছুর গুরুত্বই প্রকাশ করে না? সর্বাপেক্ষা সুগভীর চিন্তাধারা, মানুষের ভাবাবেগ ও কার্যাবলী কোন কিছুরই গুরুত্ব সম্পর্কে যুক্তিবাদদর্শন করে না, এ কথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে। তারা একটি সর্বোৎকৃষ্ট মন বা সৃষ্টিকর্তার পূর্ব উপস্থিতিতেই প্রকাশ করে। যারা সর্বোৎকৃষ্ট মন বা সৃষ্টিকর্তার সন্ধানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না— তাদের কাছে এই সৃষ্টিকর্তা অভিজ্ঞতার দুনিয়ার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইনকে কখনও অগ্রাহ্য করা যায় না। এর প্রয়োগ ছাড়া সকল গ্রন্থী মরে যেতো। মানুষের মন কারণতত্ত্বের ভিত্তি ছাড়া অন্য কিছুতেই কাজ করতে পারে না। তাই আমি বলতে চাই যে, কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন একটা বাস্তব বিষয়।

কতিপয় বৈজ্ঞানিককে আমি বলতে শুনেছি যে, অধিবিদ্যা অথবা চিন্তার আদর্শসমূহ প্রয়োগ যে ক্ষেত্রে আরম্ভ হয়, কারণতত্ত্ব সেখানে পৌঁছে শেষ হয়। অর্থাৎ এ কথা স্বীকার করি যে, চিন্তার, কারণতত্ত্বের, গুরুত্বের মৌলিক নীতিসমূহকে কাজে লাগানো অধৌক্তিক হবে যদি ডা উন্ডেশ্য হাসিল করতে উপযোগী বলে বিবেচিত ও গৃহীত হয়ে পরে বর্জিত হয়। আকস্মিক সূত্রের মধ্যে অধিবিদ্যাকে যোগসূত্র যুক্ত করা যুক্তিবিদ্যার পরিপন্থী নয়। আমরা এ কাজ বিজ্ঞান ভাষা দৈনন্দিনকার্য জীবনে বহুবার করে থাকি। অবশ্যি এই যোগসূত্র অসঙ্গত সত্য বলে প্রমাণিত হয় কিনা, সে অন্য কথা। কিন্তু যদি কখনও এই যোগসূত্র দিয়ে কোন কিছুতে প্রয়োগ করে এবং সন্ধানকার্য গুরুত্ব সহকারে পরিচালিত না করা হয়, তাহলে সূত্রের সত্যতা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এই রকম যোগসূত্র স্থাপিত হলে তা সন্ধানকারীর সংগে সত্যের, চরম সত্যের একটা যোগসূত্র হতে পারে।

মনে হয় যেন নাস্তিক অথবা অজ্ঞেয়বাদীদের ফাঁকা সন্দেহ বিদ্যমান এবং তাদের মনে একটা অন্ধ চিহ্ন, অনুভূতি-কমতা বিলোপ করা স্থান বিদ্যমান বা তাদের একথা উপলব্ধি করতে বিরত করে যে, আমাদের সকল জড় ও প্রাণচঞ্চল জগত, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কল্পনাভীত ব্যাপার। আইনস্টাইন যেমন লিখেছেন, “যে মানুষ নিজের এবং সেই সংগে অন্যান্য জীবের জীবনকে অর্থহীন বলে বিবেচনা করে, সে শুধু যে হতভাগ্য তাই নয় অধিকন্তু তার জীবনের কোন মূল্য নেই।” আমি এই সংগে আরও একটু বলতে চাই যে, যদি বিশ্বাস ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে তার আশা থাকে তাহলেই কেবলমাত্র তার জীবন ধারণ ব্যর্থ হবে না, এতে করে সে রক্ষা পেতে পারে বা তার পুনর্জন্ম হতে পারে এবং সে আবার শিষ্টর মতো চিন্তা শুরু করতে পারে।

তারপর আমি সেই বৈজ্ঞানিকের দিকে তাকালাম; যার সমালোচনা করার ক্ষমতাকে আমি ও অন্যান্য সবাই খুব প্রশংসা করতাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘যা আমি বললাম, তা কি ঠিক?’ তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে—কি প্রকার আল্লাহ?

আমি তার সংগে একমত হলাম। কারণ সর্বপ্রথম মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে, “আল্লাহ আছেন কি?” দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগে, “কি প্রকার আল্লাহ?” তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, “বেঁচে থেকে কি লাভ?” এবং চতুর্থ প্রশ্ন জাগে, “ঠিক এবং বেঠিক কি?”

আমি তারপর বললামঃ আল্লাহকে “সৃষ্টিকর্তা ও পরিকল্পনাকারী” হিসাবে কেবলমাত্র কল্পনা করলে তা খৃষ্টান ধর্মমতে আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা থেকে তাকে খাটো করে দেওয়া হয়। আমি আপনাকে তাই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, যা নাস্তিক খৃষ্টান আন্তিকতার মৌলিক ধারণা। সুস্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে এ জবাব দিতে গেলে আমাকে মেশিন ও তার প্রযুক্তিকারকের কথা থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু এটি করার আগে আমাকে আবার বলতে হচ্ছে যে, খৃষ্টানদের বিশ্বাস সকল গভীর পেরিয়ে যাবার যুক্তি যে সত্যকে প্রকাশ করতে পারে, তার সংগে কোথাও বিরোধ ঘটে না। যুক্তিকর্ম একজন প্রযুক্তিকারক যখন একটা যন্ত্র তৈরী করে তখন নিশ্চয়ই যন্ত্রটি নির্মাণের পেছনে তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য থাকে। তারপর মেশিনটা তৈরী করার সময় সে তাতে তার

আধ্যাত্মিক বা মানসিক আত্মাকে সংযোগ করে। তারপর, যন্ত্রটি শেষ হবার পর এর জন্য তার একটা আকর্ষণ থাকে, কিভাবে যন্ত্রটি কাজ করে তিনি তাতে আগ্রহী হন। আমি কোমি যুক্তিক্রম সৃষ্টিকর্তার কথা ভাবতে পারি না, যার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তটি প্রযোজ্য হতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির মধ্যে যেমনভাবে নিজের প্রকাশ করেছেন তাতে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তিধর্মী বলা যায়। আপনার একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, আমি এমন আল্লাহতে বিশ্বাস করি, মানুষ যখন তাদের মনে তাঁকে প্রবেশ করতে দেয়, তখন তাদেরকে সক্রিয়ভাবে গড়ে তোলেন, সাধু উদ্দেশ্য লাভের পথে পরিচালিত করেন এবং আল্লাহ ও মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা প্রদান করেন।

স্নাত দৃষ্টো বেজে গিয়েছিল, কাজেই খাওয়ার সময় তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই আলাপ-আলোচনা সেখানেই শেষ হলো। আমরা প্রশ্নটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো তেমন স্থান সংকুলান এ বইয়ে হবে না এবং তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সে যাই হোক, “আল্লাহ আছেন কি?” এ প্রশ্নের আমার জবাব শেষ হবার আগে আরও কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই।

আল্লাহর গুণাবলী : যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মীয় পণ্ডিত ও ক্লাসিক্যাল দার্শনিকগণ বিবৃতভাবে আল্লাহর গুণাবলী বিবেচনা করেছেন। যুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর কতিপয় গুণ রয়েছে। নীচে এসব গুণের সারসর্ম্ম দেয়া হল :

আল্লাহ্ প্রমত্ত এবং সর্বকালে বিরাজমান কোন পদার্থ নন, কোন দৈব-ঘটনাও নন, ঐশী পরিব্রতায় সম্পূর্ণ, সকল মঙ্গলের তিনি মঙ্গল, সকল পাপ ও পাপীকে জ্ঞানেন, পাপ হতে পারেন না, পাপইচ্ছা থাকতে পারে না, কোন কিছুই ঘৃণা করেন না, আল্লাহর রয়েছে প্রেম ও স্বাধীন পছন্দ, আল্লাহর ক্ষুধার কোন তাড়না নেই, আল্লাহতে নৈতিক গুণাবলী বিদ্যমান যাহা কার্যকারণ ও চিন্তাশীল গুণাবলী বৈ অন্যকিছু নয়। বাইবেলে আল্লাহর যেসব গুণাবলীর উল্লেখ আছে, এসব গুণাবলীর বেশিরভাগই তার সংগে ঐক্য আছে; বিশেষ করে নিউ টেস্টামেন্টে উল্লিখিত গুণাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিছু বাইবেলে যেসব গুণাবলী উল্লেখ আছে, তা যুক্তিসংগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে নির্ভরযোগ্য বা আত্মসাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নৈতিক কারণতত্ত্ব তৎসহ স্বাধীন পছন্দ : আল্লাহতে বিশ্বাস করার অনেক কারণ আছে। আমি যে কারণটিকে “নৈতিক কারণতত্ত্ব তৎসহ স্বাধীন পছন্দ” বলে উল্লেখ করলাম, তাকে কোন কারণেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক হচ্ছে— অমানবিক প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন হাড়া, মানুষের কল্যাণ সম্পাদন এবং মানুষের এইটিই করা উচিত। প্রাকৃতিক জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আমাদের এ বিশ্বকে, যাতে আমরা বসবাস করি তাকে ভালভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, আর বাড়িয়ে দেয় আমাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে, জীবনের আমাদের জন্যে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে জীবনের কষ্টকে লাঘব ও আনন্দের দীর্ঘ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ক্ষমতা। আজকের দিনে আমাদের দুনিয়ার সবচাইতে বড় নৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যা হচ্ছে, কি করে মানুষের ধ্বংস

ডেকে না এনে আমরা আণবিক শক্তিকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে পারি। মানুষের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার সমাজ জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা ছিল নৈতিক সমস্যা অর্থাৎ ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সমস্যা।

আমাদের চারিদিকে আমরা দেখতে পাই, প্রাকৃতিক প্রকৃতি অনমনীয় আইনাবলীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। একই আইন গহন অরণ্যে পশুর স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র — তার রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা অথবা মানব সমাজকে কতক আত্মা বা মানুষের সমাজ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানরূপী মহীকর ভক্ষণ করা না করা তাদের ইচ্ছা। আমরা যদি আত্মাহর নৈতিক আইনাবলী না মানি, তাহলে আমাদের পরিণাম ভোগ করতে হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাকৃতিক প্রকৃতির যদি স্বাধীনভাবে স্বতামত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতো, তাহলে মানুষের পছন্দের স্বাধীনতা থাকতো না; সব বিশৃঙ্খল হয়ে যেতো।

প্রাণিজগতের আচরণ নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে, মানুষের নীচে সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে দুইটি মাত্র সাধারণ প্রাকৃতিক আইন তাদের আচরণকে পরিচালনা করে (১) নিজের বেঁচে থাকা; (২) বংশ রক্ষা করা। এ দুটি আইন যদি চিরস্থায়ী না হতো তাহলে কোন পশুজাতি রক্ষা পেত এমন সামান্য প্রমাণই মেলে। প্রাণিজগতের আচরণ তারা শিক্ষা লাভ করে না, কিন্তু মনে হয় যেন একই রকম আচরণ তাদের সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু প্রাণিরাজ্যে যতই উপরের দিকে উঠা যায়, ততই অধিক থেকে অধিকতর শিক্ত আচরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা যেমন মানুষের আছে, মানুষের নীচে অন্যকোন প্রাণির তা আছে কি না তা, খুবই সন্দেহের ব্যাপার। আর যদি থেকে থাকে তবে তা খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রাণী প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রাণীর নিজ দেহের প্রতি যত্ন নেয়া বা দেহকে ভালবাসার, দেহে আঘাত না লাগানোর জন্যে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, জাতিকে রক্ষা করার জন্যে ছাড়া অন্যকোন ক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পশুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযোগিতার নীতি, “জংগলের আইন” “জোর যার মূলুক তার” নীতি প্রযোজ্য। বানর থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের সকল প্রাণীর মধ্যে যতটা গবেষণা করা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রে একটা ‘পেক্ অর্ডার’ পরিলক্ষিত হয়। যেসব পশু দলবদ্ধ হয়ে বাস করে তাদের মধ্যে একজনে অধিকার বা একাধিকার দেখা যায়। কথা হলো এই যে, নিম্নস্তরের প্রাণির মধ্যে আচরণ সম্পর্কিত অনেক আইন রয়েছে, যা নাকি একেবারে অনমনীয়।

মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাণিজগতের প্রাকৃতিক আইন ও সেই সঙ্গে আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে রয়েছে—প্রথমতঃ রহস্যময় কিছু র জন্যে বিশ্বাসভূতি, দ্বিতীয়তঃ ভাল-মন্দ, বোধশক্তি এবং তৃতীয়তঃ যে ক্ষমতা ভাল-মন্দকে বিচার করে তা ঠিক-বেঠিক বিচার করার বুদ্ধি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রাণিজগতের নিম্নস্তর থেকে আরম্ভ করে উপরের সকল স্তরের পশুর মধ্য থেকে প্রাকৃতিক বিশ্বের কারণিক সূত্র মানুষের মধ্যে সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছে, যা পরিবেশ ও তার নিজের উপর মানসিক অধিকার থেকে মানুষ একটি সচেতনতাও এ সম্পর্কে অর্জন করে।

এই কারণিক সূত্রের উৎস কি হতে পারে? এই সূত্র কি শূন্য থেকে আসতে পারে না, আকস্মিকভাবে এটা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে? এই কারণিক সূত্র কোনকিছু থেকে আসেনি আকস্মিকভাবে এর উৎপত্তি ঘটেছে— এ কথা বিশ্বাস করা, মেঝেতে পানি ছড়িয়ে দিলে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরী হতে পারে— এ কথা কল্পনা করার চাইতে অতিমাত্রায় অবাস্তব।

কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন, প্রত্যেক জগতের আইনাবলী অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবন সম্পর্কিত আইনাবলী পরিচালনের জন্য একেবারে অপরিহার্য। আমাদের মনের ক্রমবিকাশের জন্যে যেসব আইন রয়েছে—যা নাকি আমাদেরকে স্বাভাবিক নৈতিক আইন যেমন প্রেম, ন্যায়, ক্ষমা, অধিকার, দায়িত্ব, সৌন্দর্য এবং সর্বোপরি আল্লাহতে পৌঁছে দেয় সেগুলি পরিচালনের জন্য কারণতত্ত্ব সম্পর্কিত আইন যে অপরিহার্য এটা প্রত্যক্ষ করলেও আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অন্য কথায় যে মূল্যবোধ বা উচ্চ ধারণা নিষ্ঠিতে ওজন করা যায় না, তার জন্যে এ আইন। আমি বলতে চাই যে, মানুষের ভবিষ্যতের আশা প্রধানতঃ জীবনের এ মূল্যবোধের অধিকারের উপর নির্ভর করে। জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় সবকিছু যদি পাওয়া যায়, কামনার যে সকল জিনিস পরিমাপ বা গণনা করা যায় না তা থেকে প্রকৃত আনন্দ আসে এবং যে আনন্দ থেকে অনুশোচনা আসে না, মানুষ তা থেকে প্রকৃত তৃপ্তি পেতে পারে।

ইতিহাস ও গভীর চিন্তা আমাকে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত করেছে যে, মানুষের যে বিশ্বাস তাকে পরিচালনা করে তাতে এক ঐশী ব্যক্তিত্ব, যিনি ঐশী সম্পূর্ণতার প্রতীক, তার অস্তিত্ব থাকে না থাকার উপর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সর্বশ্রেষ্ঠতার নিশ্চয়তা নির্ভর করে। আমাদের বিচার-বুদ্ধি মহাবিশ্বের ঐক্য ও ক্রম প্রকাশ করে এবং কারণতত্ত্বের নীতি প্রকাশ করে। কিন্তু এসব ঘটনা ধর্ম অথবা স্থায়িত্বসম্পন্ন ধর্ম গড়ে তোলে না। যে পর্যন্ত না এইসব ঘটনা আমাদের দৈনন্দিনকার জীবনে কার্যকরী হয় এবং এ থেকে আমরা আল্লাহকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর কাছে সকল মানুষ সমান — ভাই ভাই এ কথা না মানি ততক্ষণ কিছুতেই ধর্ম হয় না। যদি দুনিয়ার সুখী উন্নতর জীবন অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তাহলে অতীতের উর্ধ্বসুখী গতি প্রবণতাসহ ঐশী পরিচালনের প্রয়োজন হবে। সাম্প্রতিক দুঃখময় চরম কল্পণ যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল তা এটাই প্রতিপন্ন করে যে, মরণশীলতা, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা ও স্বাধীনতা যখন আন্তিকতায় বদ্ধমূল থাকে না তখন তার পরিণতি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। নাত্সী পেগ্যান রাষ্ট্রে, নাস্তিক কম্যুনিষ্টদের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে আল্লাহর প্রদত্ত মানুষের সম্পত্তিকে বিনষ্ট করা হয়েছে, কর্তমে প্রোথিত করা হয়েছে।

একমাত্র নৈতিক বিশ্বে, দায়িত্বশীল দুনিয়ার মানুষ স্বাধীন হতে পারে এবং মানুষের যেমন ভাবে বসবাস করা উচিত তেমনভাবে বসবাস করতে পারে। একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবেই মানুষ সত্যিকারের সমান ও স্বাধীন। কারণ, আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে এবং আল্লাহর নজরে ও চরম নৈতিক আইনের শেষে মানুষ যথার্থই সমান। যদি আল্লাহ ও

চরম নৈতিক আইন অস্বীকার করা হয় তাহলে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, “জোর যার মূলুক তার” নীতির বিরুদ্ধে, মানুষকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে বলার ভেতন কোন যুক্তিই থাকে না। যদি মানুষের কোন মূল্য না থাকতো তাহলে অধিকতর বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালীদের হাতে অন্য মানুষ এক কথায় গোলামে পরিণত হতো। কোন স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, কোন চরম কর্তব্য কিছুরই সে অধিকারী হতে পারতো না। আল্লাহ মানুষকে যে অধিকার দিয়েছেন তা কিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু মানুষ বা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে, তা কিরিয়ে নেবার ক্ষমতা সেই মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের। মানুষ যদি চরম সৃষ্টিকর্তা থেকে শক্তি ও অধিকার না পেয়ে থাকে তাহলে মানুষের অধিকারকে, মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই—এ কথা বলার কোন মানে হয় না। আল্লাহর সৃষ্টি ছাড়া, মানুষের বৌলিক কোন মূল্য বা মর্যাদা, কর্তব্য এবং দায়িত্ব থাকতে পারে না।

মানুষের ভ্রাতৃত্ব এটা কি মানুষের গড়া জড়বাদী রাষ্ট্রের একটা বিশেষ সুবিধে, যে সুবিধের সংগে-উপযোগিতা, ব্যক্তিবিশেষের তথা সরকারের আচরণের একমাত্র নীতি নির্দেশক? অথবা এটাকি আল্লাহর বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ উক্তি? কে এর চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে গ্যারান্টি দেবে? আত্মার স্বাধীনতা থেকে প্রকৃত আত্মা আসে, না ব্যক্তি স্বতন্ত্রের মনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা আসে? অথবা একি জড়বাদী সমাজের একটি কনসেশন বা বিশেষ সুবিধে? যখন কোন একটি মানুষ একটি রাষ্ট্রের জীব হয় তখন কি করে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকতে পারে?

মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত ধারণার অভাব ঘটলে, তার ফলে নৈতিক মহাপরাধ এবং নৃশংসতা দেখা দেয় এবং তা “উন্নততর ক্রম” সম্পর্কিত মতবাদ ও রাষ্ট্রই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের একমাত্র উৎস এই উক্তিকে যুক্তিসংগত বলে প্রমাণ করে। আর সেই সংগে আরও সমর্থন করে যে, এই সর্বশেষ উৎসই হচ্ছে যে কোন উপায় বা পন্থা গ্রহণের অধিকারী। এই ছিল নূরেমবার্গের উত্তমসংকটের বিষয়। নাৎসী আইন-শৃংখলা অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে যেসব নাৎসী নেতা ও সিকিৎসক নৃশংস হত্যাযজ্ঞের সৃষ্টি করেছিল, তাদেরকে কিভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে? তাদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহর শাস্ত তথা প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে অভিযুক্ত করে দণ্ড-দান করা যেতে পারে। এই আইন নাস্তিক রুশ প্রতিনিধি-কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে মানবতার আইনরূপে। যদি মানুষের তৈরী আইনই বৌলিক মানবাধিকারের একমাত্র উৎস হয়, তাহলে নাৎসীগণ কর্তৃক কেন ইহুদী, জিপসী, পোলিশ ও রাজনৈতিক শত্রুদের হত্যা করার কাজকে অন্যায় বলে দোষারোপ করা হয়ে থাকে? কেন হাজেরীর দেশপ্রেমিকদের শিরমভাবে হত্যা করার কাজকে শিষ্টা করা হয়? নাৎসী আইনের অধীনে ইহুদীদের কোন অধিকার নেই। কম্যুনিষ্ট লাল কৌজের আইনে হাজেরীর দেশপ্রেমিকদের কোন অধিকার নেই। লৌহ যবনিকার অন্তরালে বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট সরকারের অধীনে মানুষের অবিচ্ছেদ্য কোন অধিকার নেই। যদি অবিচ্ছেদ্য

অধিকার থাকে, তবে কিসে তাকে অবিশ্বেদ্য করেছে? যদি মানুষ পৃথিবী সৃষ্টি করে না থাকে, তাহলে কি করে সে তার নিজের উপর বী্য মূল্য, স্বর্বাদা, অধিকার, কর্তব্য, পছন্দে স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত আজাদী সৃষ্টি করার ভার অর্পণ করতে পারে? সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর অস্তিত্ব পাওয়া যায়; তবে আপনি যদি কোন সিদ্ধান্তে পৌছার আগের জোর করে সব অস্বীকার করে দেন, তাহলে কথা হবে স্বতন্ত্র।

সমসাময়িক আমেরিকান জীবনে আমরা অনেক প্রমাণ পাই, যা নাকি এই নির্দেশ করে যে, গণতন্ত্র সম্পর্কিত আমেরিকান বিশেষ পদ্ধতিটিকে খাটো করে দেখা হচ্ছে। ক্রমশঃ মার্কিন গণতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হচ্ছে এবং একে এর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্য বিশ্বমানবীয় অধিকারের ঐশী সূত্রকে অস্বীকার করে মানবীয় অধিকারের সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হচ্ছেন। খৃষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক মূলধন ও ফল আসল বৃক্ষের মূল কেটে ফেললে অথবা বিনষ্ট করলে কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না।

তাদের কাজের মাধ্যমে আপনি তাদের চিনবেন : যেতেতু আমি, যতটা সমসাময়িক ইতিহাসের সংগে সম্পর্কিত ততখানি উজ্জ্বল লেনিনের সংগে একমত, কাজেই আমি আন্তিক্য-সম্বন্ধীয় মানবতাবাদ, সর্বৈশ্বরবাদ এবং অন্যান্য দর্শনের উল্লেখ করতে চাই না। লেনিন নিজেই এই বলে শেষ করছেন, ভবিষ্যৎ হয়—

(১) জড় পরম বা নাস্তিকতাবাদ সম্বন্ধীয় জড়বাদ অথবা নাস্তিকতা সম্বন্ধীয় কমুনিজম, অথবা

(২) অধিবিদ্যক যুক্তির পরম, যার অর্থ আন্তিকদের আল্লাহ এবং যার সম্পূর্ণ প্রত্যাদেশ যীশু খৃষ্টের মধ্যে বিদ্যমান—এই হবে।

আমরা পছন্দ করি আর না করি, আজকের দিনে দুনিয়ার অধিকাংশ জড়শক্তি দু'টি অগ্রগামী শিবিরের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। আন্তিক শিবির জড়শক্তি ছাড়াও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলে অনুমিত হয়। মার্কস ও লেনিনের নাস্তিক শিবিরের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিবাদ ও আন্তিকতা ধ্বংস করা এবং এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং সকল প্রকার নৃশংসতাকে তাদের নীতি বলে মনে করে। পুঁজিবাদ নিশ্চিত হলে, আল্লাহকে ঘিরে মানুষের যে সকল নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা জন্মেছিল তা মানুষ ভুলে যাবে এবং নতুন নশ্বরতা জাগ্রত হবে। তখন এটি হবে নশ্বরতার একটি শ্রেণী বা রাষ্ট্র; কিন্তু এই নশ্বরতা ব্যক্তিগত মানুষের নশ্বরতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে না। কিন্তু মার্কসীয়—লেনিনপন্থী দর্শনের অসামঞ্জস্যতা হচ্ছে এই যে, যেহেতু তাতে কোন অপরিবর্তনীয় আইন নেই কাজেই প্রয়োজন অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই দেখা যায় “শাসনকারী সম্ভ্রান্ত শ্রেণী” ও “শাসনকারী সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হতে আগ্রহশীল” শ্রেণীর মধ্যে বারবার সংঘর্ষ ঘটবে। যেহেতু নৈতিকতার কোন বালাই নেই, কাজেই এ ক্ষেত্রে নৃশংস আচরণ হতে বাধ্য। এর বিকল্প আরেকটি ব্যবস্থা হচ্ছে ডিস্টেটরশীপ। কিন্তু এটি মানুষের মূল প্রকৃতির পরিপন্থী। মানুষ

কীট-পতঙ্গের চাইতে, জড় পদার্থের চাইতে এবং ডিক্টেটর কর্তৃক পরিচালিত নরাধম জনতার চাইতে অনেক উর্ধ্বে।

যদিও কোথাও কোন প্রকার সাম্যবাদ সম্ভাবজনকভাবে কাজ করে থাকে, তবে তা হচ্ছে কনডেট বা মাঠ। কিন্তু ছলনা ও অত্যাচার দ্বারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এ সকল দলকে গড়ে তোলা হয়নি। মানুষের মনের মধ্যে যে বিপ্লব হয় তাই তাদের গড়ে তুলেছে। আত্মাহুত্ব স্বাভাবিক নৈতিক আইনের উপর ভিত্তি করে তারা গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে একটি পক্ষ অপর পক্ষকে হত্যা করার জন্য ব্রতী হয়েছে। খৃষ্টান যুগের প্রথম তিন শতাব্দীতে ১ কোটি ১০ লক্ষ খৃষ্টানকে জড়বাদী ধর্ম না মেনে খৃষ্টান ধর্ম আঁকড়ে ধাক্কার জন্য হত্যা করা হয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে নাস্তিক নাৎসী রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করায় প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন। মানবীয় অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য আজকের দিনের আমাদেরকেও আমাদের জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

১৯০৩ সাল থেকে আমরা শাসকগোষ্ঠীর আচরণে আন্তিক বা জড়বাদী প্রভাব প্রত্যক্ষ করছি। পাশ্চাত্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তন, কলেজ এমনকি সানডে স্কুল থেকে নৈতিকতা, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থা বাদপড়ে এবং সেখানে মার্কসীয় দর্শন, নাৎসী সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়। যে সকল সাধারণ মানুষ দৈনন্দিনিকার আহার সংস্থানে ব্যস্ত, তাদের মধ্যে বিপ্লব আনার জন্য আলোচনায় রাজা-উজির মারা হয়। এই সকল বিপ্লবী নেতা হয় বুদ্ধিদীপ্ত মহলের নাস্তিক অথবা ইচ্ছাশক্তির নাস্তিক। তাই তাদের দেবতা হয় বর্ণ শ্রেণী বিজ্ঞান এবং অগ্রগতি, আর না হয় শক্তি, যশ ও সম্পদ। কাজেই তাদের স্বভাব সম্পর্কে আর বিশেষ করে বলার কিছু থাকে না।

নাস্তিক বা জড়বাদী যখন চরম সংকটে পতিত হয় তখন তার পরিণতি একবার লক্ষ্য করুন। সকল আশা তার সংগে সংগে শেষ হয়ে যায়, বেঁচে থাকা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই সমাধান হিসেবে তাকে আমরা আত্মহত্যা করতে দেখি। বারো মাদকদ্রব্য বা মদ খেয়ে নেশায় বৃন্দ হয়ে থাকেন, এদের আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ডায়েরিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবনের ব্যর্থতাই একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধ্বংস করার মূলে একমাত্র কারণ। হিটলার ও তার চেলা-চামুড়াগণ যখন আর্নেস্ট ইহুদীদের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করে তখন তাদের অনেকে আত্মহত্যা করে। কিন্তু পৌন্ডা ইহুদীদের ক্ষেত্রে এটি সত্য হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ তাদের কাছে জীবনের আরেকটি বড়ত্ব অর্থ রয়েছে, বেঁচে থাকার পৃথক কারণ রয়েছে।

সর্বোপরি কোন শাসকগোষ্ঠী রাজতন্ত্র, জনতা, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যবহার জীবী বা অর্থনৈতিক মনোপশী, সরকারের বাইরের বা ভেতরে গৌড়পন্থী দলকে যদি শাসনভার দেওয়া হয় অথবা যদি ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে তাহলে তার পক্ষে কোনক্রমেই নগণ্য পরিমাণ দুর্নীতিমুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। শক্তির সাহায্যে কোন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া অথবা লাভ করা হলে তাতে শাসিতদের নিঃস্বপ্নের কোন এখতিয়ার থাকে না,

কাজেই তেমন শাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য। নাস্তিকদের ক্ষেত্রে এ দুর্নীতি নানাভাবে বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের শাস্ত মূল্য : তিনটি কারণে আল্লাহতে যে বিশ্বাস, তা কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করা যায় না।

প্রথমতঃ সকল মানুষের জন্যে, সর্বপ্রকার সংকটে এবং সকল কালের জন্যে একমাত্র যে শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তা আন্তিকতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং সে শিক্ষা, যীশুখ্রীষ্টের ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে মানুষের জন্যে, আন্তিকদের জন্যে আদর্শ হিসেবে রাখা হয়েছে। নিঃস্বর্ণ স্বর্গীয় শিক্ষা, যার লক্ষ্য একমাত্র স্বাস্থ্য আর আনন্দ - সে শিক্ষা চিররূপ, মারাত্মকভাবে পশু ও রোগাক্রান্তদের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা হতে পারে না। প্রয়োগিক শিক্ষা, অবোধ্য আর অপরিবর্তনযোগ্য লোকদের উপযোগী হতে পারে না। মানবতাবাদী শিক্ষা সম্পূর্ণ অজ্ঞ আর সম্পূর্ণ যন্ত্র সদৃশ মনোভাবাপন্ন লোকদের উপযোগী হতে পারে। কিন্তু আন্তিক ধর্মীয় শিক্ষা, যীশু খ্রীষ্টের জীবন-ভিত্তিক শিক্ষা, কলেজে, হাট-বাজারে, সংসারে, হাসপাতালে, বস্তিতে, কারাগারে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে সকল মানুষের জন্যে উপযোগী; আল্লাহতে আন্তিকদের যে বিশ্বাস তা তাদেরকে এক ঐশী শক্তিতে শক্তিশালী করে। তারা বিশ্বাস করে, তাদের কোন প্রকারেই ক্ষতি হতে পারে না। প্রয়োজনের দিক থেকে ধর্মকে দৈহিক সর্বোচ্চ ক্ষমতার উপাসনা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সর্বাধিক মানুষের এই প্রয়োজনকে দেখানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ মহাবিশ্ব ও জীবনের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করতে হলে আল্লাহতে বিশ্বাস অপরিহার্য এবং এই কারণেই চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই অনুরূপ অর্থ উদ্ধারের জন্যে সারাক্ষণ চেষ্টা করে।

তৃতীয়তঃ দীর্ঘকাল পর্বন্ত শিশুদের জন্যে হবে; কিন্তু সংসারভিত্তিক, অযৌক্তিক, বিভ্রান্ত অথবা যুক্তিযুক্ত একনিষ্ঠ মন শিশুকে যেভাবেই প্রভাবান্বিত করুক না কেন, শিশুর মনের মৌলিক দিকটা সব সময়ই বাড়তে থাকবে এবং বতর্কণ তার ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে মানসিক অবস্থা গড়ে উঠার ব্যবস্থা থাকবে, বতর্কণ অতীতের মতই এ মহাবিশ্ব তার কাজ করে যাবে, ততর্কণ শিশুর মনের ক্রমোন্নতি ও চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। যদি চিন্তার মাঝে কোন প্রকার অযৌক্তিক কারণ না ঘটে তাহলে দেখা যাবে প্রাপ্ত বয়স্ক বা পরিণত মন, প্রাকৃতিক আইন ও যুক্তিযুক্ত চিন্তাধারার নীতি অনুসারে সাড়া দিয়ে থাকে। মানুষের সকল কল্যাণকামী মহৎপ্রাণ কোন সময়ই, যে সকল মৌলিক আইন প্রকৃতিকে পরিচালনা করে থাকে তা থেকে কখনও দূরে সরে যায় না। তারা সব সময়ই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে যে সকল কারণ আর প্রকৃত সত্য বিদ্যমান তাই সন্ধান করে—নতুন সত্য আবিষ্কার করেন; আর আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

এইসব কারণেই আমাদের সব চাইতে পরিভূতি। যে সকল জিনিস, সকল মানুষের জন্যে এবং সকল কালের জন্যে কল্যাণকর একমাত্র সেই সকল জিনিসের সঙ্গে বেঁচে থাকার মূল্যবোধ জড়িত। এই একই মাত্র কারণে সভ্যতার উত্থান-পতন সত্ত্বেও ধর্মীয়

বিশ্বাস ও চিন্তাধারার গভীরবাহ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর চিন্তার যা কিছু মৌলিক নীতি সবই শিশুতে নতুন করে জন্ম লাভ করে থাকে। একবার স্বরণ করা যাক যে, একটি ছোট শিশু স্টাভাবে যুক্তি, বিশ্বাস, আশা ও প্রেম প্রকাশ করে। এ কারণেই কি বীতশ্রু শিশুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে :

“ছোট শিশুকে আমার কাছে আসতে দাও। জাদের বাধা দিও না; কারণ তারা আল্লাহর রাজত্বের বাসিন্দা।” (মার্ক ১০ঃ১৪)

“ছোট শিশু যেভাবে আল্লাহর রাজত্বকে গ্রহণ করে, ঠিক সেইভাবে যদি কেউ তা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তার আল্লাহর রাজত্বে প্রবেশের কোন অর্থ নেই।” (লুক ১৮ : ১১)

“যদি তুমি শিশুর মত ছোট সরলপ্রাণ না হতে পার তাহলে তুমি কোন ক্রমেই স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।” (ম্যাথু ১৮ঃ৩)

“যদি কারও নতুন করে জন্ম না হয় তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর রাজত্ব দেখা সম্ভব নয়।” (জান ৩ : ৩)

পরমাণুর অভ্যন্তরের রহস্যময় জগতের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্রাঙ্কে তাই যথার্থই বলেছেন : ধর্ম ও প্রকৃতিবিজ্ঞান এক সঙ্গে অবিদ্যমান যুক্তিহীন মন্তব্যদে বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং একমাত্র ধর্মি হচ্ছে, “ঈশ্বরের কাছে চল” এবং এ ধর্মিই চিরকাল থাকবে।

মানবজাতির পরম কল্যাণকারী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম লুই পাস্তুরের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

“যদি কেউ আমাকে বলে যে, এ সিদ্ধান্তাবলীতে উপনীত হতে গিয়ে আমি প্রকৃত বিষয় থেকে দূরে সরে যেছি, তাহলে আমি তাকে বলবো, যে সকল বিষয় সব সময় যথার্থভাবে সত্য বলে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না, সে সকল বিষয়ের মধ্যে আমি সিন্ধুকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছি অথবা স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করেছি। কিন্তু সকল বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার এ হচ্ছে আমার নিজস্ব পদ্ধতি।”

যদি কোথাও আমি মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে থাকি, তাহলে দয়া করে আমাকে তা দেখিয়ে দেবেন। আমি আজো শিখতে চাই, শেখার জন্যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।



চল্লিশজন সেরা
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে
জন ফ্লোভার মোন...
46047#1456186-1
R